রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৯

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA

Reg No 937B April, 1939—J

ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্.এ., বি.এল.,

ডি. লিট্., ব্যারিস্টার-এট-ল, এম. এল. এ.

মহাশয়ের করকমলে

[illegible]

সূচী

ভূমিকা

আজকাল অনেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্য-সম্বন্ধে নিজেদের মতামত পুস্তক-আকারে প্রকাশ করছেন। এঁরা সকলেই যে একই কথা অল্পবিস্তর বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করছেন তা অবশ্য নয়। কোন বড় কবি-সম্বন্ধে সকলে একমত হ'তে পারেন না, কেন-না মহাকবিদের কথা নানা লোকের মনকে নানারূপে স্পর্শ করে। এ সম্বন্ধে Anatole France আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন। তিনি Goetheর Faustএর সমালোচনা-সূত্রে বলেছেন, "মহাকবি তাঁর কাব্য রচনা করেন এই উদ্দেশ্যে যে আমরা সকলেই সে কাব্যকে নিজের প্রকৃতি-অনুসারে নূতন করে' গড়ে' নিতে পারি। বই পড়ার অর্থ হচ্ছে সে বইকে পুনর্জন্ম দেওয়া। আমি যখন Faust পড়ি তখন সে Faust আমার Faust। আমি নিজের কল্পনাতে তাকে নূতন করে' গড়ে' নিই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হচ্ছে সেই জাতীয় যা পাঠকদের এই ভাবকে নিজের নিজের অন্তরঙ্গ করে' নেবার সুযোগ দেয়, যে সাহিত্য সকলের অর্থাৎ সকল পাঠকের মনেই উচ্চ চিন্তার উদ্রেক করে।" এ কথা শুধু মহাকবির সম্বন্ধেই যে খাটে তা নয়, মহাদার্শনিকের সম্বন্ধেও।

এখন এ কথা অবিসংবাদী যে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন এ যুগের জগৎপূজ্য সার্ব্বভৌম কবি। সুতরাং তাঁর কাব্য যাঁদের হৃদয়-মনে আনন্দের সঞ্চার করেছে তাঁরা সে আনন্দ প্রকাশ করতে গেলেই নানারূপে নানা আকারে তা করবেন; কারণ সকলের মন এক ছাঁচে ঢালাই হয়নি।

(২)

Anatole Franceএর পূর্ব্বোক্ত কথা যদি সত্য হয়, আর আমার বিশ্বাস তা সম্পূর্ণ সত্য, তা হলে এ যুগের সমালোচনাও এক রকম Creative art, কারণ এ যুগে সমালোচককে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং তজ্জাত চিন্তা প্রকাশ করতে হয়।

এ জাতীয় সমালোচনা লেখবার জন্য কোনও বাঁধাধরা অলঙ্কারশাস্ত্রের সাহায্য পাওয়া যায় না, সে শাস্ত্র গ্রীকই হোক আর সংস্কৃতই হোক।

শ্রেষ্ঠ কাব্য যে উক্ত শাস্ত্রের বিধিনিয়ম অতিক্রম করে সে জ্ঞান সংস্কৃত আলঙ্কারিকদেরও ছিল। অন্তত যথার্থ কাব্য যে উক্ত শাস্ত্রের সকল প্রকার বিধিনিয়ম অতিক্রম করে সে সত্যের সন্ধান নব্য-আলঙ্কারিকরা পেয়েছিলেন।

তাই তাঁদের আসল জিজ্ঞাসা ছিল কাব্য-জিজ্ঞাসা। কাব্যবস্তু কি তাই তাঁরা আবিষ্কার করতে ব্রতী হয়েছিলেন।

আজকাল আমরা রসের সন্ধান পেয়েছি নিজের অন্তরে; আর যে কাব্য আমাদের অন্তরে নানারূপ রসের উদ্রেক করতে পারে তাকেই আমরা যথার্থ কাব্য বলি।

আমাদের মনের লৌকিক মনোভাবই প্রকাশ করা কঠিন; আর কাব্যালোচকের মনে যে অলৌকিক লোকের সন্ধান পেয়ে আমরা চমৎকৃত হই, সেই সব নব মনোভাব প্রকাশ করা, যে-সব ভাব কাব্যের স্পর্শে আমাদের অন্তরে উদ্ভূত হয় সে ভাব প্রকাশ করা যে সহজ নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এ যুগের সমালোচনাকে এক হিসাবে Creative art বলা যায়।

তারপরে কোনো কবির কোনো বিশেষ কাব্যের আর কবির সমগ্র কাব্যের আলোচনার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। কেউ বা সমগ্র কাব্যের অন্তরে ঐক্য খোঁজেন, কেউ বা তার বৈচিত্র্য। কথাটা একটু পরিষ্কার করা যাক। ঋতুসংহার, মেঘদূত, কুমারসম্ভব যে একই হাতের লেখা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং কালিদাসের কবিত্বশক্তির বীজ ঋতুসংহারের অন্তর থেকে কিছু কিঞ্চিৎ উদ্ধার করা একেবারে অসম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা যে কালক্রমে ফুটে উঠেছে সম্ভবতঃ 'ভগ্ন হৃদয়ের' অন্তরেও তাদের বীজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বীজ যে কালক্রমে বৃক্ষে পরিণত হয় এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং কাব্য-জগতেও প্রতিভার বিকাশ যে একই নিয়মের অধীন এ কথা অনেকেই সহজেই বিশ্বাস করেন। সুতরাং কাব্যজগতেও তাঁরা মানুষের মনের continuity খোঁজেন।

অপর পক্ষে কেউ আবার প্রতিভার অর্থ নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, এই মত গ্রাহ্য করে' নিয়ে কবির রচিত কাব্য-সাহিত্যে যুগে যুগে নব বৈচিত্র্যের সন্ধান পান। আর আমাদেরও সেই বৈচিত্র্য-সম্বন্ধে সজ্ঞান করে দেন। সত্য কথা এই যে উভয়েই একই কবির অন্তরে একই বস্তু খোঁজেন। কেউ আবিষ্কার করতে চান কাব্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি-প্রতিভার ঐক্য, কারও বেশী করে' চোখে পড়ে তাঁর প্রতিভার বৈচিত্র্য, যে-বৈচিত্র্য হচ্ছে কবি-প্রতিভার স্বগত ভেদ। কবির স্ব-বস্তুটি এক হলেও বিচিত্র। আর এই স্ব-টিকে যিনি আবিষ্কার করতে পারেন তিনিই হচ্ছেন যথার্থ সমালোচক।

শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীর 'কাব্য-প্রবাহ' সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা। সন্ধ্যা সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে' বলাকা পর্য্যন্ত; তার কাব্য-সাহিত্যের বিকাশ ও পরিণতিই তাঁর আলোচ্য বিষয়।

লেখকের যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লেখক বহুকাল শান্তিনিকেতনে বাস করেছেন। প্রথমত ছাত্ররূপে পরে শিক্ষকরূপে। এবং রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে তাঁর মন অনুপ্রাণিত হয়েছে। তিনি স্বয়ং একজন কবি।

রবীন্দ্রনাথ একমাত্র মহাকবি নন, উপরন্তু তিনি একজন মহা-আলঙ্কারিক, এ কালে যাকে আমরা বলি critic। এ দুই গুণের সাক্ষাৎ অনেক স্থলে একই ব্যক্তির অন্তরে পাওয়া যায়। Goethe, Coleridge, Wordsworth, Shelley প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা লোকোত্তর ক্রিটিক বলে'ও গণ্য। রবীন্দ্রনাথও যে একজন অপূর্ব্ব ক্রিটিক যার রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য নামক পুস্তিকার সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই জানেন।

সম্ভবত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী কাব্যরস উপভোগ করবার ও কাব্য প্রকাশ করবার প্রবৃত্তিও রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পেয়েছেন। অর্থাৎ তিনি শুধু কাব্য-রস উপভোগ করে'ই ক্ষান্ত হন নি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের কি গুণে ও কি রূপে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন তা ভাষায় ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এর থেকে কেউ মনে করবেন না যে তাঁর গুরুর কাব্যসৃষ্টি ও তার ব্যাখ্যার ধারা তিনি আত্মসাৎ করেছেন।

আমি বিশী মহাশয়ের কাব্যপ্রবাহের সমালোচনা করতে বসিনি: বসেছি তাঁর পুস্তকের ভূমিকা লিখ্‌তে, অতএব এ পুস্তকের পরিচয় দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমাদের প্রত্যেকের মনের একটি বিশেষ গড়ন আছে অর্থাৎ চিন্তার একটা কাঠামো আছে। তাই আমরা আমাদের মনের কথা সেই কাঠামোর ভিতর পূরে দিই।

বিশী মহাশয়ের চোখে রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্যই বেশি করে' পড়েছে, এবং তিনি মনে করেন এই বৈচিত্র্যও কতকগুলি নিয়মের মধ্যে ধরা পড়ে। ফলে তিনি কালানুসারে বিভাগ করেছেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস যে বিভিন্ন যুগে কবির প্রতিভার বিভিন্ন ও বিশেষ ধর্ম্ম আছে। তাঁর কৃত মোটামুটি ভাগ এই—

(১) সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে মানসী পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ।

(২) সোনার তরী হ'তে ক্ষণিকা দ্বিতীয় ভাগ।

(৩) নৈবেদ্য প্রভৃতি তৃতীয় যুগের কাব্য।

(৪) বলাকা শেষ যুগের।

এ ভাগ যে ঠিক ভাগ এ কথা আমি বলিনে, এবং সম্ভবতঃ তিনিও বলতে চান না; কারণ তাঁর 'কাব্য-প্রবাহ' পড়লেই দেখা যায় যে সমালোচকের মতে 'ছবি ও

গান'ই দ্বিতীয় যুগের প্রথম কাব্য, উপরন্তু ক্ষণিকাকে কোনও বাঁধা-ধরা পর্য্যায়ভুক্ত করা যায় না। তবে বলাকাতে যে তাঁর কবিত্বশক্তি তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে এ কথা অনেকেই মানতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের সকল কাব্যকে একত্র পড়ে' একখানি কাব্য হিসাবে গণ্য করলে সে কাব্য হয়ে' ওঠে একখানি মহাকাব্য। এ মহাকাব্যে অবশ্য নানা পর্ব্ব আছে; কিন্তু এ পর্ব্ব কালের পর্ব্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায় না, অথচ এই কালের পর্ব্বকেই উপেক্ষা করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের ধারা কোন যুগে ক্ষীণ, কোন যুগে প্রবল, কোন যুগে সঙ্কীর্ণ, কোন যুগে উদার ও পূর্ণতর; কোন যুগে তাঁর কারবার নিজের মন নিয়ে, কোন যুগে বাইরের বিশ্ব নিয়ে; কোন যুগে তাঁর কবিতায় অন্তরে ছবি ফুটে উঠেছে আর কোন যুগে গান, তা বিশি মহাশয়ের কাব্যপ্রবাহ পড়লেই দেখতে পাবেন।

অবশ্য প্রতি যুগেই তিনি কবি, কিন্তু প্রতিযুগে তাঁর কবিত্বের বিষয় অথবা অবলম্বন এক নয়। যুগে যুগে আমরা তাঁর কাব্যে স্থধু নূতনত্বের নয় নূতন ঐশ্বর্য্যের সাক্ষাৎ পাই। সমালোচক মহাশয়, কবি কি আন্তরিক প্রেরণার বলে এই নব ঐশ্বর্য্য লাভ করেছেন তারও পরিচয় আমাদের দিতে চেষ্টা করেছেন।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে মহাকবির কাব্যকে আমরা সকলেই এক চোখে দেখিনে, স্থতরাং যা বিশেষ করে' তাঁর চোখে পড়েছে তা যে অপর পাঠকের চোখে পড়বে তা অবশ্য নয়। আর যথার্থ সমালোচনার উদ্দেশ্যও তা নয়। কারও সমালোচনা lyric হ'তে পারে, কারও সমালোচনা বা দার্শনিক। এ বিষয়ে সকলে একমত হ'তে পারে যদি অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সকলে একবাক্যে মেনে নেয়, অর্থাৎ তখনই সকলে একমত হ'তে পারে যখন সে মত কোনও ব্যক্তি-বিশেষের মত নয়।

মহাকাব্যমাত্রেই universal, কারণ বহু ব্যক্তির মনকে সে কাব্য স্পর্শ করে, জাগ্রৎ করে, উৎফুল্ল করে, আর সেই সঙ্গে তাদের মনকে নূতন রূপলোকে তুলে নিয়ে যায়, আমাদের ব্যাবহারিক আত্মাকে যিনি এই রূপলোক ও আনন্দলোকের সন্ধান দেন তিনিই যথার্থ কবি। মহাকাব্য যে universal তার কারণ এই রূপলোক ও আনন্দলোকের জন্ম প্রতি মানবমনের আন্তরিক প্রবৃত্তি আছে।

বিশী মহাশয় রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাখ্যা করতে তাঁর গদ্য-সাহিত্যের কোনও সাহায্য নেন নি, এক তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ব্যতীত। এর কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবন-চরিত লিখ্‌তে বসেন নি, বসেছেন তাঁর কাব্যের জীবন-চরিত্রের পরিচয় দিতে। জীবন-স্মৃতিকে যে তিনি বাদ দিতে পারেন নি তার কারণ উক্ত গ্রন্থ কবি-জীবনের একটি অমূল্য ইতিহাস। তিনি মনের কি অবস্থায় সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তার বর্ণনা তিনি জীবন-স্মৃতিতেই করেছেন। আর আমরা

সকলে তাঁর কথারই পুনরুক্তি করছি; কারণ আমাদের কারও হাতে সে চাবি নেই যার সাহায্যে তাঁর মনের দুয়ার খোলা যায়। বিশী মহাশয় যে কবিতা তাঁর গদ্যসাহিত্যের আলোয় দেখ্‌তে চেষ্টা করেন নি, আমার মতে তা ভালই করেছেন। কেন-না রবীন্দ্রনাথের অন্তরে কবি-ব্যতীত যে অপর একটি personality আছে তার পরিচয় দিতে গিয়ে হয়ত তিনি তাঁর কাব্য-প্রবাহ ঘুলিয়ে ফেলতেন।

আর একটা কথা, বিশী মহাশয় এ আলোচনা থেকে তাঁর গান বাদ দিয়েছেন, কেন-না তাঁর গান তাঁর schemeএর ভিতর পড়ে না। সে যাই হোক্ তিনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-সম্বন্ধে নীরব। তিনি অবশ্য জানেন যে ইউরোপে তিনি যে বিশ্বকবি হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছেন সে ঐ গীতাঞ্জলির প্রসাদে। সুতরাং গীতাঞ্জলির কথা উহ্য রেখে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যায় না।

বিশী মহাশয় মনে করেন যে ভগবদ্ভক্তিই গীতাঞ্জলির বিশেষত্ব, অপর পক্ষে মানব-প্রীতিই হচ্ছে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রাণ। ইউরোপের মনীষীরা কি সকলেই ভগবদ্ভক্তিতে গদ্‌গদ আর humanity কথাটা কি ইউরোপে অজ্ঞাত? গীতাঞ্জলি কাব্য হিসাবে যে একটি অমূল্যরত্ন বলে' ইউরোপে কেন গণ্য হয়েছে তার বিচার থাকলে কাব্য-প্রবাহ পূর্ণাঙ্গ হ'ত।

বিশী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ও সম্পূর্ণ পরিচিত। আমরা সকলে তা নই, কেন-না রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির ধারা হচ্ছে অজস্র ও অপর্য্যাপ্ত। এই প্রাচুর্য্য গুণের সাক্ষাৎ পৃথিবীর সব বড় বড় লেখকদের সাহিত্যেই পাওয়া যায়।

বিশী মহাশয় রবীন্দ্র-কাব্যের এই অজস্র ঐশ্বর্য্যের মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি যুগানুসারে রবীন্দ্র-কাব্যের শ্রেণী-বিভাগ করে' রবীন্দ্র-কাব্যের সমগ্রতার পরিচয় দিতে চেয়েছেন।

তার পরে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একমাত্র কবি হিসাবেই দেখেছেন, তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য-সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নি। এর ফলে রবীন্দ্র-নাথের শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম ও পলিটিক্স সম্বন্ধে কোনও বিচার করেন নি, করলে তাঁর পুস্তিকা একখানি বিরাট্ গ্রন্থ হ'য়ে উঠ্‌ত। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য তাঁর কাব্য-সাহিত্যের উপরে বিশেষ কোনও আলো ফেলে না বরং তাঁর কাব্য-সাহিত্যেই তাঁর গদ্য-সাহিত্যের উপর আলো ফেলে। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম ও পলিটিক্সে অনেকেই মতামত ব্যক্ত করেন, কিন্তু সে সব মতামত কবিপ্রতিভায় আলোকিত

নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সকল প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্তরে আমরা কবির মন ও কবির দৃষ্টির পরিচয় পাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় দিতে হলে তাঁর কবিপ্রতিভারই পরিচয় দিতে হয়, এবং বিশী মহাশয় তাই দিতে চেষ্টা করেছেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

গ্রন্থকারের ভূমিকা

১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে থাকিবার সময়ে এই গ্রন্থের সূত্রপাত—কিন্তু বর্ত্তমান আকারে ইহা অনেক কাল পরে লিখিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্বন্ধে মূল ধারণাটি তখন নীহারিকারূপে মনের মধ্যে ভাসিতেছিল—তাহারি কোন কোন অংশ দুইতিনটি প্রবন্ধরূপে তখনকার সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়।

তারপরে অনেকদিন কাজ বন্ধ থাকে; ১৯৩০ সালে সত্যকার গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ হইয়া ১৯৩৪ সালে সমাপ্ত হয়—তখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা-বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের সহকারিরূপে গবেষণা করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সম্বন্ধে আমার ধারণা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি; তাহা কি, অন্ততঃ কিরূপে তাহা আমার কাছে প্রতিভাত হইয়াছে, রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের সেই মূল সূত্রটি বলিতে চেষ্টা করিব। যাঁহারা বইখানি পড়িবেন ইহাতে তাঁহাদের সাহায্য হইবে আশা করা যায়; আর যাঁহারা পড়িবেন না, তাঁহারাও এই অংশটুকু পড়িলে গ্রন্থে কি আছে জানিতে পারিবেন। আজকাল নাকি ব্যস্ততার যুগ, লোকের বই পড়িবার সময়াভাব, যদিও বই প্রকাশের আদৌ নয়; পাঠে অনিচ্ছুক এই ব্যস্ততার যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক উদ্ভাবন ভূমিকা,—রামায়ণ মহাভারতের ভূমিকার প্রয়োজন হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রধান ধর্ম্ম—ইহার মানবমুখিতা; কালিদাসের পরে এত বিরাট্ মানবমুখী কবিপ্রতিভা আমাদের দেশে জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। ব্যাস-বাল্মীকির কথা আসে না, তাঁহারা কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী; বিশেষ তাঁহারা লোকোত্তর কবি; এক একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; কালিদাস প্রভৃতি লৌকিক কবিরা সেই জগতে বিচরণ করিতেছেন। এই লৌকিক কবিদের মধ্যে প্রতিভার সাধর্ম্ম্যে ও বিরাট্ত্বে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ অতৃতীয়; প্রতিভার সে ধর্ম্মটি মানব-মুখিতা।

ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের দেশের সাহিত্যের প্রভেদ এই যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য প্রধানতঃ মানবমুখী, ভারতীয় সাহিত্য প্রধানতঃ ভগবদ্‌মুখী; সেইজন্য ইউরোপীয় সাহিত্য বিচিত্র ও জটিল, আমাদের সাহিত্য গভীর ও তন্ময়; আমাদের দেশে কবিরা সাধক, তাঁহাদের অপর নাম ঋষি।

এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইউরোপীয় মনের সঙ্গে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের রহস্যজনক ঘনিষ্ঠতা আছে—আবার ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান ধারার সঙ্গে তেমনি রহস্যজনক অনৈক্য। রবীন্দ্রনাথ না হয় ইউরোপীয় মনের সঙ্গে পরিচিত—কিন্তু কালিদাস! আর কোনরূপে ইহা ব্যাখ্যা করা যায় না—ইহার একমাত্র ব্যাখ্যা প্রতিভার রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তার মধ্যে। সেইজন্য ইউরোপ এত সহজে রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিতে পারিয়াছে, আর ভারতীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে ইউরোপ বোধ হয় কালিদাসকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে।

তবু ইউরোপ সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-প্রতিভার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। তিনি প্রধানতঃ ওদেশে গীতাঞ্জলির দ্বারা পরিচিত; গীতাঞ্জলি মূলতঃ ভগবদ্‌ভক্তির কাব্য আর ভগবদ্‌ভক্তি রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি উপশাখা মাত্র— প্রধান অঙ্গ নয়। তাঁহার মানবমুখী বিচিত্র কাব্যের কতটুকু অনূদিত হইয়াছে? কিংবা অনুবাদে মৌলিক মহত্ত্ব কতটুকু সংরক্ষিত হইয়াছে? কাজেই রবীন্দ্রকাব্যের অধিকাংশই শুধু যে ইউরোপের অজ্ঞাত তাহা নয়, তাঁহার প্রতিভার ধর্ম্মই সেখানে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য মানবমুখিতা রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রধান ধর্ম্ম হইলেও তাহাতে কোথায় যেন একটা ত্রুটি বা দুর্ব্বলতা আছে যাহাতে তিনি সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ক্ষুদ্র, খণ্ড, দোষত্রুটি-বহুল মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে, কিন্তু শক্তি নাই; বারে বারে তিনি মানুষের দ্বারে করাঘাত করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দ্বার খোলে নাই। তিনি দ্বারের বাহিরে বসিয়া অনুমানের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা, আভাসে, ইঙ্গিতে যেটুকু পাইয়াছেন তাহার দ্বারা, ভিতরের জীবনযাত্রার চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মানবের সংসারের গান গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কবিপ্রতিভা সারাজীবন এই দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিয়াছে; এখনো করিতেছে; কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি বুঝিতে পারেন যে বোধ হয়—

> হে রাজন্ তুমি আমারে
> বংশী বাজাবার দিয়াছ যে ভার
> তোমার সিংহ-দুয়ারে।

মানবের সিংহদ্বারে বসিয়া বাঁশী বাজাইবার অধিকার মাত্র আছে, তাহার অধিক নাই। ইহাই রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার ট্র্যাজেডি।

আমার তৃতীয় বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিণাম কোথায়? সিংহদ্বারে

বসিয়া বাঁশী বাজানোকেই তিনি পরিণাম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কি না, বা অন্য কোন উপায়ে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন? (রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি মানুষের বিকল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ওয়ার্ডস্বার্থ প্রকৃতির মধ্য দিয়া জগৎ-সত্তাকে জানিয়াছিলেন; (রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্য দিয়া মানবসত্তাকে জানিয়াছেন; প্রকৃতি-প্রীতির মধ্যে তিনি মানব-প্রীতির স্বাদ পাইয়াছেন। বাল্য ও কৈশোরের স্বাভাবিক প্রকৃতি-প্রীতি পরিণত বয়সে গভীর অর্থদ্যোতক হইয়া কবির জীবনে দেখা দিয়াছে; জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ওঠা-পড়া ও মূর্চ্ছনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভা বহুদিন পরে 'সমে' ফিরিয়া আসিয়াছে।)

প্রধানতঃ এই তিনটিই রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের মূলসূত্র।

গ্রন্থের সমালোচনা-রীতি-সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি; কাব্যের মধ্যে তাঁহার মনের শ্রেষ্ঠ অংশের প্রকাশ; আবার তিনি কবি ছাড়াও ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধকার ইত্যাদি; কাজেই মনের অপর অংশ সাহিত্যের ঐ সব শাখায় বিকশিত; কাজেই তাঁহার সম্পূর্ণ মনকে বুঝিতে হইলে কাব্যের সঙ্গে অন্যান্য রচনা মিলাইয়া পড়া দরকার; রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও অন্যান্য রচনা পরস্পর বিরোধী নয়, পরস্পর পরিপূরক। একই সময়ে লিখিত কাব্যে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে মনের লীলার ঐক্য থাকাই সম্ভব; বিভিন্ন রচনায় তাহার প্রকাশ বিচিত্র হইতে পারে—কিন্তু মূলে একই মনের প্রকাশ; সুতরাং একটু তলাইয়া পড়িলে মিল পাওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস। একটি উদাহরণ লওয়া যাক্; প্রায় একই কালে তিনি নৈবেদ্য রচনা, স্বাদেশিক প্রবন্ধগুলি প্রণয়ন ও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন; আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে ঐক্য কোথায়? কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই তিনের মধ্যে একই মনের বিভিন্ন অংশের প্রকাশ—ইহারা মূলতঃ এক। এ বিষয়ে নৈবেদ্য-প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। (কবিমনকে বুঝিবার জন্যই কবির সম্পূর্ণ মনকে জানা প্রয়োজন—এবং এই সম্পূর্ণ মনকে জানিতে হইলে একই কালে লিখিত কাব্যের সঙ্গে পরিপূরকভাবে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও জীবনী মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্যক।) নানা কারণে সৃষ্টিমূলক রচনা, যেমন নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প এই প্রয়োজনে ব্যবহার করি নাই, কিন্তু করিলেও ক্ষতি ছিল না, কেবল প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও জীবনী ব্যবহার করিয়া আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি, সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হইত।

গীতাঞ্জলি-সম্বন্ধে আমি নীরব। তার কারণ আমি রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল ধারার পরিচয় দিতে বসিয়াছি; উপশাখার পরিচয় দিতে বসি নাই; তেমন উপশাখা রবীন্দ্র-প্রতিভায় প্রচুর, তাহা হইলে কোন কালেই আমার গ্রন্থ শেষ হইত না।

রবীন্দ্রনাথের গানের আলোচনা করি নাই; গীতাঞ্জলি গান; শুধু গীতাঞ্জলির গানগুলি আলোচনার সার্থকতা নাই; সমস্ত গানের আলোচনা করিতে হয়; সুরবেত্তা না হইলে গানের সমালোচনা করা নিরর্থক; আমার সে শক্তির অভাব।

বিশেষ, রবীন্দ্রনাথ বিদেশে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশেরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি গীতাঞ্জলির কবি বলিয়া পরিচিত। গীতাঞ্জলি তাঁহার প্রতিভার মূলধারা না হওয়াতে এই পরিচয়ের দ্বারা লোকে রবীন্দ্রনাথকে ভুল বুঝিয়াছে; রবীন্দ্র-প্রতিভার মূলধারার আলোচনায় গীতাঞ্জলি-সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা থাকিলে লোকের এই ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত। বাহুল্য হইলেও একটি তথ্য পাঠকদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—ইংরাজি গীতাঞ্জলি ও বাংলা গীতাঞ্জলি আদৌ এক গ্রন্থ নয়; বাংলা গীতাঞ্জলির গানের সংখ্যা একশ সাতান্ন; ইংরাজি গীতাঞ্জলির রচনার সংখ্যা একশ তিন; ইহার বহু রচনা আবার নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু হইতে গৃহীত; এ সব কাব্য রবীন্দ্র-প্রতিভার মূলধারার অন্তর্গত; ইংরাজি গীতাঞ্জলিকে একপ্রকার চয়নিকা গ্রন্থ বলিলেই হয়।

এক্ষণে গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্ব্বাহ্ণে যাঁহাদের কাছে নানারূপে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের নামোচ্চারণ করিয়া শ্রম শেষ করি।

প্রথমে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নাম মনে পড়িতেছে; বৃদ্ধ বয়সের ক্লান্তির মধ্যে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পড়িয়া ওঠা সহজ নয়; রবীন্দ্র-কাব্যের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ তিনি তাহা করিয়াছেন ও অনুগ্রহ করিয়া একটি মূল্যবান্ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

রামতনুলাহিড়ী-অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ., মহাশয়ের কাছে গবেষণা করিবার সময়ে ইহার অধিকাংশ লিখিত; তিনি আমার ধন্যবাদের প্রার্থী নহেন—কিন্তু আমি তাহা না জানাইয়া পারি না।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম. এ. ও অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন, এম. এ., পি.এচ-ডি., গ্রন্থখানা আদ্যন্ত পড়িয়া তাঁহাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ. ও অধ্যাপক শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, এম. এ. মাঝে মাঝে মূল্যবান্ উপদেশ দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য রেজিস্ট্রার শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম. এ. মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। বইখানা বহুদিন ছাপাখানায় ছিল-- তিনি দৃষ্টি না দিলে আরও বহুকাল আটক থাকিতে পারিত।

সবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. এল., ডি.-লিট্., ব্যারিস্টার-এট্-ল, এম. এল. এ., মহাশয়ের কাছে আমি সব চেয়ে

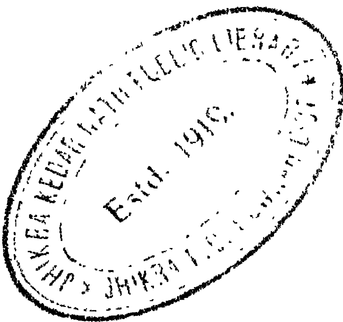
ঋণী। তিনি উদ্যোগী না হইলে এ গ্রন্থ আদৌ প্রকাশিত হইত না। এখন ইহা সমাদৃত হইলে তাঁহার ঋণ কথঞ্চিৎ লাঘব হইল বলিয়া মনে করিব।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রকাব্যে প্রবেশের ইঙ্গিত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার কাছে ঋণ স্বীকারের অর্থ কি! বিশেষ ভ্রমত্রুটিবহুল এই অপরিণত রচনার সঙ্গে কোন রকমে আমি তাঁহার নাম জড়িত করিতে চাহি না।

গ্রন্থপঞ্জীর উপরে আমার আস্থা নাই; বই লিখিয়া যে কোন ভাল লাইব্রেরীতে গিয়া কতকগুলি বইয়ের নাম বসাইয়া দেওয়া চলে। গ্রন্থের মধ্যেই প্রয়োজনীয় স্থলে ব্যবহৃত পুস্তকের পূর্ণ পরিচয় আছে।

ছাপার ভুল মাঝে মাঝে দু'চারটি আছে। কিন্তু সে সব চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবার আবশ্যক দেখি না।

সর্ব্বশেষে বলিয়া রাখি—এই গ্রন্থের গুণের ভাগ আমার উপদেষ্টা ও বন্ধুদের; আর ইহার দোষ, ত্রুটি ও মতামতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।



কাব্য-সত্য

সন্ধ্যা সঙ্গীত হইতে বলাকা পর্য্যন্ত কাব্যগুলি এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। সন্ধ্যা সঙ্গীত প্রকাশিত হয় ১৮৮২, বলাকা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং আলোচনার কাল সময়-হিসাবে চৌত্রিশ বৎসর। এই চৌত্রিশ বৎসরকে আমরা চারটি পর্ব্বে ভাগ করিয়াছি—

(১) সন্ধ্যা সঙ্গীত—১৮৮২

(২) সোনার তরী—১৮৯৪

(৩) খেয়া—১৯০৬

(৪) বলাকা—১৯১৬

প্রথম পর্ব্বে—সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী। দ্বিতীয় পর্ব্বে—সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কণিকা, ক্ষণিকা, কল্পনা, নৈবেদ্য, শিশু, স্মরণ। তৃতীয় পর্ব্বে—খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি। চতুর্থ পর্ব্বে,—বলাকা এবং পরে অন্যান্য কাব্য।

উৎসর্গ কাব্যখানা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও স্বতন্ত্রভাবে উহার আলোচনা করিব। কৌতূহলী পাঠক হয় তো লক্ষ্য করিবেন যে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি, বিশেষ করিয়া গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি আমরা বাদ দিয়াছি। বাদ দিয়াছি সে কথা সত্য, কিন্তু অকারণে নহে।

সন্ধ্যা সঙ্গীত পর্ব্ব

রবীন্দ্রনাথ সন্ধ্যা সঙ্গীত হইতে তাঁহার প্রকৃত কাব্যজীবন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন। ইহার কারণ এ নহে যে সন্ধ্যা সঙ্গীতের কাব্য পরিণত-শক্তির রচনা। এই পরিণতি কবির কাব্যে অনেক পরে আসিয়াছে মানসী, সোনার তরীতে।

অপরিণত শক্তির রচনা বলিয়াই সন্ধ্যা সঙ্গীত ও পরবর্ত্তী কয়েকখানি কাব্যের মূল্য। কিন্তু সে মূল্য কাব্য-হিসাবে নয়, কবি-জীবনের ইতিহাসরূপে।

কবিজীবনের ইতিহাস আলোচনা এমন স্থান হইতে করিতে হয়, যেখানে তাহাকে অপরিণত অবস্থায় পাওয়া যায়। কাব্য যখন পরিণত হইয়া উঠিল, তখন সে আর-এক জিনিষ। তখন তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া শিল্পের ইন্দ্রজাল ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার মূল উপাদান দেখিবার সুযোগ সব সময়ে হয় না। কিন্তু সন্ধ্যা সঙ্গীতের পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য তো আরও কাঁচা, তবে কেন সেখান হইতে আরম্ভ না করি? রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের উৎস, সন্ধ্যা সঙ্গীত; তৎপূর্ব্বের কাব্য নয়। আর রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহ অনুসরণ আমাদের কাজ; কাজেই আমাদের নিকট সন্ধ্যা সঙ্গীতের যে মূল্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যের তাহা নহে। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যা সঙ্গীতকে কেন রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের মূল বলিলাম এ বিষয়ে আমাদের অনুমান ছাড়াও গুরুতর প্রমাণ আছে, স্বয়ং কবির সাক্ষ্য।

সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীতের সহিত তুলনা করিয়া তৎপূর্ব্বের কাব্য পাঠ করিলে প্রথমেই চোখে পড়ে, এই সঙ্গীতাখ্য কাব্যদ্বয়ে কবি লিরিকের ধারাটি পাইয়াছেন। এখানে বক্তব্য যাহাই হউক, কবির কণ্ঠে সেই অতি-তুচ্ছ বিষয় সঙ্গীত হইয়া উঠিতেছে। ইহার পূর্ব্বে এমন করিয়া অনায়াসে কবিকণ্ঠে সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। এই যে সঙ্গীতটি পাইলেন, ইহাতেই কবি নিজের বাহনটিকে লাভ করিলেন। এই বাহনের অভাবে পুরোবর্ত্তী কাব্যে কবির গতি স্বচ্ছন্দ-অবলীলা লাভ করিতে পারে নাই। সন্ধ্যা সঙ্গীত ও প্রভাত সঙ্গীতে সুরের পক্ষলাভ ঘটিল। কিন্তু পরবর্ত্তী, ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমলে সঙ্গীতের অপেক্ষা চিত্রের উপরেই কবির অধিক ঝোঁক। মানসীতে চিত্র ও সঙ্গীত উভয় পন্থাই কবি অনুসরণ করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত তাঁহার পরীক্ষার যুগ; নানা ভাবে নানা বাহনে নিজের স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা। সোনার তরীতে কবি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার স্বাভাবিক বাহন সঙ্গীত, চিত্র আনুষঙ্গিক। আর একবার তিনি নিছক চিত্ররথে যাত্রা করিয়াছেন, সাফল্যও লাভ করিয়াছেন কিন্তু সেই শেষ বার। ইহা কল্পনা কাব্যে। তাহা হইলে দেখা গেল, সন্ধ্যা সঙ্গীত হইতে মানসী পর্য্যন্ত কবির বাহন-পরীক্ষার যুগ। একবার যেমনি তিনি বাহনসম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেন, অমনি সুরের পক্ষিরাজে তাঁহার ভাবের সপ্তলোক-যাত্রা আরম্ভ হইল সোনার তরী হইতে, আজও সে যাত্রার অবসান হয় নাই।

সন্ধ্যা সঙ্গীতকে কাঁচা বলিলাম; ইহাতে ছন্দোবন্ধ, ভাব, ভাষা অপরিণত; তাহার একমাত্র কারণ, এই পরিণতির অভাব তাঁহার অন্তরেই ছিল।

"আমার কাব্যলেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্য-হিসাবে সন্ধ্যা সঙ্গীতের মূল্য বেশী না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ট কাঁচা। উহার ছন্দ, ভাষা, ভাব, মূর্ত্তি ধরিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুসি তাই লিখিয়া গিয়াছি। সুতরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুসিটার মূল্য আছে।" [জীবনস্মৃতি ২১১-১২, ১৩৩৫]

কবি এখানে দুইটি ভাগ করিয়াছেন—লেখাটা এবং খুসিটা। পাঠক যে আনন্দ পাইবে, সেটা সর্ব্বতোভাবে লেখা হইতেই। তাহার সহিত কবির খুসির স্বতন্ত্র একটা টীকা জুড়িয়া দিবার আবশ্যক নাই। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ কাব্যে দুই-ই এক; অকাব্যে দুইটি স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। প্রকাশের অসম্পূর্ণতায় কবি বুঝিতে পারেন যে, প্রকাশ্য ব্যাপারের একটা অংশ, এবং অনেক সময়েই প্রধান অংশ, অব্যক্ত আকুতিরূপে কবির মনের মধ্যে রহিয়া গেল। চিত্তের খুসিটা কল্পনায় ভাবরূপে দানা বাঁধিয়া কাব্যসম্মত রূপ পাইল না। অর্থাৎ কাব্য-হিসাবে যাহা বিশ্বজনীন হওয়া উচিত, সেটা খুসিরূপে তাঁহার ব্যক্তিগত হইয়া রহিল। এইজন্য অনেক সময়ে দেখা যায়, কবিশ্রেষ্ঠ যাঁহারা, পরবর্ত্তী জীবনে যাঁহারা অনেক মহাকাব্যের জনক, তাঁহাদের বিশেষ স্নেহ বা মোহ থাকে—তাঁহাদের কৈশোরের অপেক্ষাকৃত অকাব্যগুলির প্রতি। ইহা যে কেবল তাঁহাদের প্রতিভার প্রথম প্রকাশ বলিয়া, তাহা নহে; অসম্পূর্ণ প্রকাশ বলিয়া। শ্রেষ্ঠ কাব্যে তাঁহারা নিঃশেষে প্রকাশিত, তাহাতে মোহাকর্ষণের মত কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু প্রথম জীবনের এই অকাব্যগুলিতে, প্রকাশ্য বিষয়ের খানিকটা তাঁহাদের হাতে থাকিয়া যায়; যে পরিমাণে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত। এই ব্যক্তিগত অংশটা, যাহা ক্ষতির খাতায়, তাহাই কবিদের মোহের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এ কথা অপ্রযোজ্য নহে। সন্ধ্যা সঙ্গীত হইতে মানসী পর্য্যন্ত অংশটার বিষয়ে তিনি যত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, এমন আর কোনও কাব্যসম্বন্ধে নহে। যে আকুতি কাব্যে রূপ পায় নাই তাহাকে প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে, আলাপ-আলোচনায় রূপ দিবার আর বিরাম নাই। স্বপ্রকাশ কাব্যগুলিসম্বন্ধে তিনি অপেক্ষাকৃত নীরব।

সন্ধ্যা সঙ্গীতের পর প্রভাত সঙ্গীত। ইহার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি, কি ভাবে কেমন করিয়া লিখিত হইল, সে বিষয়ে কবি বহু বার বহু স্থানে বহু কথা বলিয়াছেন। বাহুল্য বোধে আমরা আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। সে সময়ে কবির কোন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হইয়াছিল কিনা, আমরা তাহা জানিতে

চাহি না। আমাদের যেটুকু আবশ্যক, তাহা কাব্যেই আছে। নিজের কবিজীবন-সম্বন্ধে যে তিনি সচেতন হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবিচৈতন্যের এই অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে ছন্দের স্বচ্ছন্দ গতি ও অবিরাম চলতারূপে বিদ্যমান।

কবি এই পর্ব্বসম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে আলোচনা করিতে গিয়া ইহাকে হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের কাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন [জীবনস্মৃতি, ২৩৬]। এ সম্বন্ধে আমরা কবির সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কারণ, হৃদয়-অরণ্য হইতে কবি সম্পূর্ণরূপে কোন দিন নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে বরাবর হৃদয় হইতে বাহিরে আসিবার একটা চেষ্টা তাঁহার কাব্যে আছে। এই আলোচনা-প্রসঙ্গে [জীবনস্মৃতি ২৩৭-৩৮] কবি এই সময়টার উপরে যে গুরুত্ব চাপাইয়াছেন, প্রভাত সঙ্গীতের কাল সেই ভারবহনক্ষম কিনা সন্দেহ আছে। জীবনের উল্টা দিক্ হইতে বহু বৎসরের স্মৃতির মধ্য দিয়া তিনি এই সময়টাকে দেখিয়াছেন, এবং স্বভাবতই যে ব্যাখ্যা ইহার প্রাপ্য নহে তাহা ইহার ভাগ্যে পড়িয়াছে। কবি লিখিয়াছেন, প্রভাত সঙ্গীতের সময়টাতে শৈশবের প্রকৃতির সহিত তাঁহার পুনাম্মলন ঘটিল। আমাদের ধারণা, ইহা গীতাঞ্জলিতে ও অবশেষে বলাকার পরে ঘটিয়াছে। কবি যে সময়ে জীবনস্মৃতি লিখিতেছিলেন তখন গীতাঞ্জলি-রচনা শেষ হইয়া গিয়াছে, প্রকৃতির সহিত পুনর্ম্মিলন তাঁহার ঘটিয়াছে ; এবং এক সময়ের ঘটনা অপর একটা সময়ে, যাহাকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন, তাহার উপরে চাপাইয়া দিয়াছেন।

আমাদের কথা যে মিথ্যা নহে তাহার প্রমাণ জীবনস্মৃতিতেই আছে। কড়ি ও কোমল-প্রসঙ্গে কবি লিখিতেছেন—

"আমার কবিতা এখানে মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।" [জীবনস্মৃতি, ২৭৮] আবার—"কড়ি ও কোমল মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখ রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান।" [জীবনস্মৃতি, ২৭৯] সেই একই প্রসঙ্গে পুনরায়—"যৌবনের আরম্ভে মানুষের জীবলোক আমাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মাঝখানে আমার প্রবেশ ছিল না, আমি প্রান্তে দাঁড়াইলাম।" [জীবনস্মৃতি, ২৮১]

বড় সত্য কথা। রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি, মানুষের বিচিত্র জীবন তাঁহাকে নানা ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে ; কিন্তু তিনি সেই রহস্য-নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, বাহিরে দাঁড়াইয়া যেটুকু স্বাদ, গন্ধ, ইঙ্গিত, আভাস পাইয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার কবি-জীবনের ট্রাজেডি।

ইহার পরে ছবি ও গান এবং কড়ি ও কোমল। এ দুটিকে আমরা চিত্ররীতির কাব্য বলিয়াছি। সাঙ্গীতিক আকুলতা ইহাতে তত নাই, যত চিত্রকরোচিত নির্লিপ্ততা।

"চৌরঙ্গির নিকটবর্ত্তী সার্কুলর রোডের একটি বাগানবাড়ীতে আমরা তখন বাস করিতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বসতি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতালার জানালার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। * * নানা জিনিষকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তখন একটি একটি যেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ও মনের আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া লইয়া দেখিতাম। এক-একটি বিশেষ দৃশ্য এক-একটি বিশেষ রসে রঙে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আমার চোখে পড়িত।

"এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনা-পরিবেষ্টিত ছবিগুলি গড়িয়া তুলিতে ভারি ভাল লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক-একটি পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা। চোখ দিয়া মনের জিনিষকে, ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা। তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ্ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।" [জীবনস্মৃতি—২৫১-৫২]

ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই, কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন, ছবি আঁকিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিলে ছবি ও গানের প্রকাশ্য বিষয়কে কথায় না প্রকাশ করিয়া চিত্রে রূপস্ত করিয়া তুলিতেন। সে শক্তির অভাবে তিনি কাব্যে চিত্রপন্থার অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা কড়ি ও কোমল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এই কাব্য দুইখানিতে পূর্ব্বরচিত কাব্যের ন্যায় সাঙ্গীতিক তীব্র আকুলতা নাই; কবির ব্যক্তিত্ব যতদূরসম্ভব সঙ্কুচিত। প্রকাশ্য বিষয়কে যথাসম্ভব স্বাধীন ভাবে ফুটিয়া উঠিতে কবি সাহায্য করিয়াছেন।

কবির আর একখানা চিঠি হইতে একটা অংশ তুলিয়া দিলে দেখা যাইবে, কাব্য-হিসাবে অসম্পূর্ণ এই গ্রন্থখানার প্রতি কবির ব্যক্তিগত মোহ কি নিবিড়।

"আমার 'ছবি ও গান' আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে' বোঝা গেল, তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ এবং মনের মধ্যে হয়তো অনুভবও করছো। আমি তখন দিন রাত পাগল হ'য়ে ছিলুম। আমার সকল বাহ্য লক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেতো যে, তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখ্তে তো মনে করতে, এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার

সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্ছি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্য্যের পুলকতার মধ্যে, পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধ হয় এ রকম অবস্থা হয় :—

'উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি, মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারি দিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন-মুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।'

সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, এমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।" [সবুজ পত্র, ৪র্থ বর্ষ, ১৩২৪, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩৬-৩৭]।

কবির এই মোহের, এই নেশার মূলে কাব্যের অসম্পূর্ণ প্রকাশ। অন্তরে যে অব্যক্ত আকুতি ছিল, তাহার রঙীন কুয়াশা আজিও কবির চোখে ইন্দ্রধনু বুনিয়া দেয়। কিন্তু পাঠকের পক্ষে এখানে বেশি আশা নাই; কারণ কবির ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে পাঠকের অধিকার নাই—সে সম্পত্তি কি পার্থিব, কি আন্তরিক।

মানসী এই পর্য্যায়ের শেষ কাব্য। ইহাতেও সেই পুরাতন দ্বন্দ্ব, চিত্র ও সাঙ্গীতিক পন্থায়। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে কাব্যখানি পাঠ করিলে বুঝা যায়, এই দুইটি পন্থাই আপন আপন উৎকর্ষের দিকে চলিয়াছে। উভয়ের মিলনের দিকে নয়, কারণ এমন মিলন জগতের সাহিত্যে কদাচিৎ দেখা যায়; রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দু'চারবার মাত্র তাহা ঘটিয়াছে। চিত্রপন্থা রীতিমত দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, যেমন মেঘদূত ও অহল্যার প্রতি কবিতায়। কিন্তু মানসীর অধিকাংশ কবিতাই সুনিপুণ ভাবে সাঙ্গীতিক পন্থাকে অনুসরণ করিয়া আভাস দিতেছে যে ভবিষ্যতে কবির ইহাই প্রধান বাহন হইয়া উঠিবে।

প্রকাশের এই বহিরঙ্গের দ্বন্দ্বের সহিত তাল রাখিয়া কবির অন্তরেও একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কাব্যে চিত্ররীতি 'কংক্রীট'; ইহা বস্তুকে দেহদ্বারা, তথ্যদ্বারা, প্রকাশ করে। সাঙ্গীতিক পন্থা 'অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট'—ইহা বৈদেহী; দেহ হইতে আত্মাকে নির্য্যাস করিয়া লইয়া ইহা প্রকাশ করিতে চায়। কবির কাব্যে এই চিত্র বা দেহী পন্থা, ও সাঙ্গীতিক বা বৈদেহী পন্থা দুইটিই প্রকাশভঙ্গি খুঁজিয়াছে।

রবীন্দ্র-কাব্যে প্রেমের কবিতা অনেক আছে, ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার অর্থ এ নহে যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসেন নাই; কিন্তু তাঁহার মনের গঠনই এইরূপ যে ব্যক্তিগত সংস্পর্শ দেখিতে দেখিতে ভাবরূপে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে, এবং স্বাভবতই এই ভাবরূপ, বৈদেহী বা সাঙ্গীতিক পন্থায় আত্মপ্রকাশ করে।

এই যে দ্বন্দ্ব, কাব্যব্যাপারে যাহা চিত্র ও সঙ্গীতরীতিতে প্রকাশমান, আসলে যাহা আইডীয়াল ও রীয়ালের দ্বন্দ্বব্যতীত কিছু নয়, সে সম্বন্ধে কবিও অচেতন নহেন।

"অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal-এর মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force Ideal-এর দিকে Realকে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের Centripetal force Real-এর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে, কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে বাষ্প হ'য়ে যায় না—এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হ'য়ে কঠিন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না।" [সবুজ পত্র, ১৩২৪, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩৭-৩৯]

এই যে দুইটি বিপরীতমুখী শক্তি, কবি যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"আমি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" [তদেব]

এই দুটিই কবির অন্তরে আছে। কখন অনুরাগের পন্থা রীয়ালের দিকে কবিকে লইয়া গিয়া চিত্ররীতিকে আশ্রয় করাইতেছে; আবার কখন-বা সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা আইডীয়ালের দিকে আকর্ষণ করিয়া কবির হাতে তুলিকার পরিবর্ত্তে বাঁশী তুলিয়া দিতেছে।

এই মানসিক দ্বন্দ্ব কবিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

"ভালো করে' ভেবে দেখ্‌তে গেলে মানসীর ভালবাসার অংশটুকুই কাব্য-কথা,—বড় রকমের সুন্দর রকমের খেলা মাত্র—ওর আসল সত্যি কথাটুকু হচ্ছে এই যে, মানুষ কি চায়, তা কিছু জানে না—* * তাই জন্যে সাধ যায় 'সত্য যদি হ'ত

কল্পনা।' আমি দুটো যদি এক করতে পারতুম। * * একেই বলে ভালবাসা? আমার ভালবাসার লোক কই? আমি ভালবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি, সে মানসেই আছে। সে artistএর হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি? [সবুজ পত্র—১৩২৫, ২য় সংখ্যা]

"দুটো যদি এক করতে পারতুম।" এই Ideal ও Realকে। অন্তরে এই Ideal ও Real-এর সমন্বয় ঘটিলে বাহিরেও চিত্র- ও সঙ্গীতপন্থার সামঞ্জস্য পাওয়া যাইত। কবির ভাগ্যে কি এই মিলন ঘটিয়াছে, অন্ততঃ মানসীতে তো হয় নাই।

কবি নিজে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই, তাঁহার মনে কোন্ ভাবটা প্রবল। ভালবাসার না সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষার। কল্পনার centrifugal force না অনুরাগের centripetal force। মানসীতে ইহার মিলন ঘটে নাই, দুইটি পাশাপাশি আছে এই মাত্র। সোনার তরী হইতে কল্পনার শক্তিই যেন প্রবলতর হইয়া বিচিত্র পথে বিশ্বের জীবনের দিকে কবিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। সে বিশ্ব ব্যক্তিবিহীন। অনুরাগের শক্তি সমান বলবান্ হইলে সেখানে ব্যক্তির দেখা হয় তো মিলিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘ কাব্য-জীবনে বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন, নির্ব্বিশেষ মানুষকে পাইয়াছেন। প্রেমিককে খুঁজিয়াছেন, নির্গুণ প্রেমকে পাইয়াছেন। সগুণকে চাহিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যে নির্গুণ মিলিয়াছে। এই অতৃপ্তি, এই আকাঙ্ক্ষা, এই আন্দোলন ও অশান্তি তাঁহার কাব্যের মূলে; ইহাই তাঁহার কাব্যের মৌলিক অনুপ্রেরণা। এই কথাটি মনে রাখিয়া তাঁহার পরিণত কাব্য আলোচনা করা যাক।

সোনার তরী পর্ব্ব

সোনার তরী হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য এমন একটি পরিণতি লাভ করিয়াছে, যাহা ইতিপূর্ব্বের কোন কাব্যসম্বন্ধে বলা চলে না। মানসী-সম্বন্ধেও নহে। যদিও মানসীর কয়েকটা কবিতা সোনার তরীর প্রৌঢ়তা লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্ব্বে সব চেয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে পদ্মা নদী। শুধু এই পর্ব্বে কেন, তাঁহার বিভিন্ন কাব্যের অন্তরে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রটির মত পদ্মার প্রভাব প্রবাহিত। ক্ষণিকার পরে আর তাহার বাস্তবরূপ চোখে পড়ে না বটে, কিন্তু পদ্মারই

আদর্শ একটি অখণ্ড অচ্ছেদ্য গতিরূপে প্রসারিত। মর্ত্ত্যলোকের এই পদ্মাই আদর্শায়িত হইয়া বলাকার আকাশগঙ্গায় পরিণত হইয়াছে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিতে পদ্মাকে বোঝা আবশ্যক। শুধু পদ্মাকে নয়, ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তশায়ী এই দেশের যে-বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রাণপ্রতীক এই নদী প্রকাশ করিতেছে তাহাও না বুঝিলে চলিবে না। কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভা ভারতীয় ও বঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্বে উপজাত।

পদ্মার একটু বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা বিশেষ করিয়া বাংলার নদী। গঙ্গার সহিত ইহার নাড়ির যোগ আছে, কিন্তু পথের যোগ নাই। সমস্ত ভারতবর্ষের ধারাকে হঠাৎ অস্বীকার করিয়া খামখেয়ালি কবিকল্পনার মত ইহা স্বৈর গতিতে অজানিত পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। [illegible]।

বাংলার প্রাণপ্রতীক এই বিরাট্ নাগিণী। ইহারই প্রবাহে বাংলার আবহাওয়াতে এমন কিছু একটা আছে, যাহাতে সে অনায়াসে অতীতের সংস্কারকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে। প্রাচীনতার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া যাইবার একটা নেশা বাংলার জীবনকে নানা দিক্ দিয়া স্পর্শ করিয়াছে। ভারতবর্ষের মুখ অতীতের দিকে, বাংলার মুখ ভবিষ্যতে।

এ হেন পদ্মার তীরে ঘটনাক্রমে রবীন্দ্রনাথকে কিছুকাল বাস করিতে হইয়াছিল। পদ্মার এই গতিতে কবি আপনার অন্তর্নিহিত কবিধর্ম্মকেই যেন দেখিতে পাইলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বভাব চলতা বা গতি; এই চলতা বা গতি-ই যেন পদ্মার স্রোতে প্রবাহিত। অন্তরের আদর্শের সহিত বাহিরের দৃশ্য সায় দিয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ আপনার কবিধর্ম্মে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সোনার তরীতে তাঁহার কবিতার পরিণতি; সেই সময়টাতেই তাঁহার পদ্মাবাস; ইহা কি কেবল কাকতালীয় সংযোগ, না তাহার বেশি কিছু। পদ্মাতীরে বসিয়া কবি যে শুধু আপনার স্বাধর্ম্ম্যকে বুঝিলেন, তাহা নয়, পদ্মার কলধ্বনিতে বাংলার যে-ইতিহাস উচ্চারিত হইতেছে, তাহাও যেন শুনিলেন।

ইহার পূর্ব্বে কবি দেশবাসীর স্পর্শচ্যুত হইয়া আপন পরিবারের ও আপন অন্তরের গণ্ডিমধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। এখানে আসিয়া কবির জীবন দেশের জীবনকে স্পর্শ করিল। অনেক সমালোচক 'প্রভাত সঙ্গীতে'র সময়টাকে কবির 'হৃদয়-অরণ্য' হইতে নিষ্ক্রমণের সময় বলিয়াছেন। ইহা সত্য নহে। হৃদয়-অরণ্য হইতে যথার্থ নিষ্ক্রমণ এই সময়টাতে। কিন্তু আমাদের কথাও আংশিকভাবে সত্য মাত্র, কেননা কবি হৃদয়-অরণ্য হইতে কোন দিন সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারেন নাই।

এখন দেখা যাক, কবি কি ভাবে এই পদ্মাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে

'ছিন্নপত্র' আমাদের প্রধান সহায়। পদ্মার নানা ভাবের বহু চিত্রে ছিন্ন-পত্রের পত্রগুলি পূর্ণ। তন্মধ্যে খানকয়েক চিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক, কবিস্বভাবের কি পরিচয় পাওয়া যায়।

"ভোর থেকে আরম্ভ ক'রে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্য্যন্ত ক্রমাগতই ভেসে চলেছি। কেবল মাত্র গতির এমন একটা আকর্ষণ আছে দুধারের তটভূমি অবিশ্রান্ত চোখের উপর দিয়ে সরে' সরে' যাচ্ছে—সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি—কিছুতে তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছিনে—পড়তে মন যায় না, লিখতে মন যায় না, কোন কিছু কাজ নেই, কেবল চুপ করে চেয়ে বসে আছি। কেবল-যে দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে তা নয়—হয়ত দুধারে কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখা মাত্র চলে গেছে—কিন্তু ক্রমাগতই চল্‌ছে, এই হচ্ছে তার প্রধান আকর্ষণ।" [ছিন্নপত্র, ৫৬, ১৩৩৫]

পুনরায়:—

"আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে' নিয়ে গতিটাকে কেবল গতি ভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশুর মধ্যে যে চলাচল তা'তে খানিকটা চলা, খানিকটা না চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চল্‌ছে, সেই জন্যে আমাদের মনের সঙ্গে চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিকভাবে পদ চালনা করে, অঙ্গ চালনা করে, আমাদের মনটার আগাগোড়াই চলেছে। সেই জন্যে এই ভাদ্র মাসের পদ্মাটাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মত ভাঙ্‌ছে, চুর্‌ছে, এবং চলেছে—মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসঙ্গীতে নানা প্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্র শস্যশালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।" [ছিন্নপত্র, ২৮৮, ১৩৩৫]

নদীপ্রবাহকে কবি এখানে সামান্যভাবে মানব-মনের গতির সহিত তুলনা করিয়াছেন, কিন্তু যে-কথাটা অধিকতর সত্য, সেটা এই যে এ গতি-প্রবাহের সহিত কবির মানসলীলার স্বাভাবিক সাদৃশ্য আছে। পদ্মা ও কবিচিত্তের দুটি তার একই সুরে বাঁধা ছিল, একটির রণনে মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্যটি অনুরণিত হইয়া উঠিল।

কবির প্রতিভার স্বাভাবিক গতিধর্ম্ম পদ্মার প্রভাবে প্রথম স্ফূর্ত্ত হইল। ইহা একেবারে তাঁহার অস্তিত্বের মূলে আশ্রয় লাভ করিয়াছে বলিয়া তিনি সর্ব্বদা সে সম্বন্ধে সচেতন নহেন, কিন্তু যখনই নিজের জীবনটার দিকে চাহিয়াছেন

এই গতিকেই নানারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ছিন্নপত্রের বহুকাল পরে লিখিত একখানা চিঠিতে আছে—

"তোমাদের বইয়ে বোধ হয় পড়ে থাকবে, পাখীরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্ছি সেই জাতের পাখী। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেবো বলে আয়োজন করচি।" [ভানুসিংহের পত্রাবলী, ১ম সং, ৯]

কবির যে ইদানীং বারে বারে বিদেশ যাত্রা, তাহার প্রকাশ্য হেতু যাহাই হোক, মুখ্য কারণ তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক চলতা। বাহিরের গতি কবির স্বাভাবিক গতিপ্রিয়তাকে আঘাত করে; উভয়ের দ্বন্দ্বে কবির কাব্যপ্রতিভা নূতন ভাবে স্ফূর্তি লাভ করে। তাঁহার জীবনে চারিবার এ রকম ঘটিয়াছে। চারিবার দীর্ঘ বিদেশযাত্রার পরে কাব্য-উৎসের নূতন ধারা খুলিয়া গিয়াছে।

(১) ১৮৭৮-১৮৮০ পর্যান্ত বিলাতে বাস। ১৮৮২-তে সন্ধ্যা সঙ্গীত প্রকাশিত (২) ১৮৯০-এ কয়েক মাস বিলাতে অবস্থান। চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ ও সোনার তরী প্রভৃতি ১৮৯১-৯৩-তে লিখিত। (৩) ১৯১২-১৩ সতেরো মাস ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ভ্রমণ, ১৯১৪-তে বলাকার কবিতা রচনা আরম্ভ এবং (৪) ১৯২৪-২৫-এ দক্ষিণ আমেরিকার পথে 'পূরবী'র যাত্রী অংশের অধিকাংশ কবিতা লিখিত। কবি নদী-সম্বন্ধে যখনই সচেতন হইয়া ওঠেন, নদীর নিকট আপন ঋণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না—

"আমি জীবনের কত কাল যে এই নদীর বাণী থেকেই বাণী পেয়েছি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলবো না।" [ভানুসিংহের পত্রাবলী, ১ম সং, ১৫০]

যে-গতিকে কবি একদিন জলস্রোতে দেখিয়াছেন, জীবনের অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সহিত তাহা গভীরতর হইয়া জনস্রোতে পরিণত হইয়াছে। জল ও জন উপলক্ষ্য মাত্র, স্রোতটাই কবির নিকটে আসল। কবি একখানি চিঠিতে পথে পথিকের নানা আনাগোনা বর্ণনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন—

"ঐ সব চলার স্রোতের মধ্যে মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে' বসে আছি।" [ভানুসিংহের পত্র, ১ম সং, ৯০]

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালকদের জীবন-সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিটা কি রকমের—

"তুমি মনে করো না এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চলেছে; তার ঢেউ প্রতি মুহূর্ত্তে উঠ্‌ছে, তার বাণীর অন্ত নেই। এই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্ছে, আপনার পথ সে কাট্‌ছে, দুই তটকে গড়ে তুল্‌ছে। সে কোন এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চলেচে, দূর থেকে আমরা তার বার্ত্তার আভাস পাই মাত্র।" [ভানুসিংহের পত্র, ১ম সং, ১২০]

এতক্ষণ যাহা দেখিলাম তাহা নদীস্রোত-সম্বন্ধে, কবি যেন তাহাকে নদী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্গুণ সত্তা-হিসাবে দেখিতেছেন। পদ্মাটা যেন তত্ত্ব-হিসাবে কবির নিকটে সত্য। কিন্তু পদ্মা যে কবির নিকটে কত প্রিয়, কোন তত্ত্ব-হিসাবে নয়, প্রায় ব্যক্তির মত, তাহা দেখা যাক। পদ্মার ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে আর কে দেখিয়াছে জানি না।

"আগে পদ্মা কাছে ছিল—এখন নদী বহু দূরে সরে গেছে- আমার তেতালা ঘরের জানালা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি, অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখনই আস্‌তুম তখন দিন রাত্তির ঐ নদীর সঙ্গে আমার আলাপ চলতো, রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে, ঐ নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুন্‌তে পেতেম। তারপরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাট্‌লো, কত কাল সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম—এখন এসে দেখি সে নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সব শেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ যে একটি ঝাপ্‌সা বাষ্পলেখাটির মতো দেখ্‌তে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েছে। এই তো মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিষ দূরে চলে যায়, জানা জিনিষ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে, আর যে-স্রোত বন্যার মতো প্রাণ মনকে প্লাবিত করেছে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে। [ভানুসিংহের পত্র, ১ম সং, ১২২-২৩]

ইহা কি পদ্মার বর্ণনা? ইহা কবির অতীত জীবনের স্মৃতি; পদ্মা ও কবির জীবন একত্র জড়িত হইয়া গিয়াছে—একটাকে ছাড়িয়া আর একটা লওয়া মুস্কিল।

কবির কাব্যে যে কয়েকটি মূল উপাদান, পৃথিবীর প্রতি আসক্তি, বাংলা দেশের জীবনের ও সৌন্দর্য্যের প্রতি আগ্রহ, বাংলার প্রকৃতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট বিরাট্ বৈরাগ্যের সুর, সবগুলিরই দীক্ষা এই পদ্মার নিকট হইতে। ছিন্নপত্র হইতে অংশ উদ্ধার করিয়া প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই। কৌতূহলী পাঠক ছিন্নপত্রখানা পড়িয়া লইবেন।

পদ্মাস্রোতের এই গতি কবির জীবনকে যে শুধু গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা নহে। অন্যের জীবন-সম্বন্ধেও কবির ধারণা গড়িয়া তুলিয়াছে। বোটে করিয়া অবিরাম ভাসিয়া চলিতে চলিতে যে-দেখা তাহাতে মনোযোগ আছে, কিন্তু কোথাও সে মনোযোগের সন্নিবেশ নাই—এ যেন ছবি দেখা। এ ভাবে দেখা আর্টিষ্টের দেখা, কর্ম্মীর দেখা নহে। জীবনকে নিজের জীবন হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখা কবির অভ্যাস হইয়া গিয়াছে সেইজন্য নদীতীরের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে মুহূর্ত্তে আদর্শ করিয়া তুলিতে কবির বাধে না। ছিন্নপত্রের [৬৭–৬৮, ১৩৩৫] একখানি চিঠিতে নদীতীরের দৃশ্য সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখিতে দেখিতে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের তেপান্তরের দেশের একটি নদীতীর হইয়া উঠিল এবং কবি সেই দেশের রাজপুত্রের মত নিদ্রিত রাজকন্যার অন্বেষণে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বস্তুত সমগ্র মানবজীবনের প্রতিই কবির এই দৃষ্টি। কোনকিছুকে তিনি দৃঢ়ভাবে আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। এই জীবনতন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে তাঁহার আসন নাই, দূর হইতে দেখিতেছেন, এক দৃষ্টিতে যাহা বুঝিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে—অধিক প্রয়াসে নিষ্ফলতা! জীবনকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিবার ইচ্ছা, কিন্তু এমন তাঁহার অবস্থান যে সেরূপ কোন আশা নাই। কবি ও জীবন পাশাপাশি ঘর করিল কিন্তু এক ঘরে বাস করা হইয়া উঠিল না।

সোনার তরী পর্ব্বে যেমন পদ্মার গুরুত্ব, চিত্রা কাব্যে সেই গুরুত্ব জীবনদেবতার। জীবনদেবতা কি, সে বিষয়ে আমরা চিত্রা-প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি; এখানে জীবনদেবতা-সম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য যাহা আছে তাহাই বলিব।

জগতে ও জীবনে এমন কোন কথা নাই যাহা কাব্যের উপাদান হইতে পারে না, কিন্তু জগত ও জীবনের সব কথা কাব্য নয়। জীবনদেবতা কবির ব্যক্তিগত জীবনের নিয়ন্ত্রী দেবতা, সেই হিসাবে কাব্যের উপাদান। কিন্তু সর্ব্বত্র এই ভাবটি কাব্য হইয়া উঠিয়াছে কিনা, তাহা কাব্য-প্রসঙ্গে দেখাইব। এ আলোচনা উপাদানের আলোচনা। চিত্রায় জীবনদেবতা ভাবের স্ফূর্ত্তি, সোনার তরীতেও তাহার আভাস আছে। এখন, সোনার তরী ও চিত্রায় এই জীবন-দেবতা ভাবের চারিটি স্তর দেখা যায়।

(১) সোনার তরীতে জীবনদেবতা পূর্ণভাবে স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশ পান নাই। প্রধানত তিনি কবিতা ও কল্পনার মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়াছেন। মানস সুন্দরীতে ইহা :—

"এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হ'য়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশদিশি
অস্ফুট কল্লোল ধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোন কূল আছে।"

আবার নিরুদ্দেশ যাত্রায় :—

"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী,
বল কোন পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।

* * *

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকুল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগন কোণে!
কি আছে হোথায়, চলেছি কিসের
অন্বেষণে।"

আর সোনার তরীর সেই প্রসিদ্ধ :—

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা পালে চলে যায়
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু-ধারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।"

এই তিন জন কি স্বতন্ত্র? ইহাদের মধ্যে জীবনদেবতার পূর্ব্বাভাস; ইহারা কবির নিকট সম্পূর্ণভাবে পরিচিত নহেন; কিন্তু কবি এটুকু বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার জীবনতরণীর হালটা ইহাদের মুঠার মধ্যে। তাঁহারা এখনও সম্পূর্ণভাবে কবির জীবনটাকে আয়ত্ত করেন নাই, তবে কবির কাব্য অনেকটা তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

(২) দ্বিতীয় স্তরের প্রধান আলোচ্য বিষয় অন্তর্যামী কবিতা। এখানে জীবন-দেবতা কবির জীবনে আরো গভীর ছায়াপাত করিয়াছেন। কবির কাব্যপ্রেরণার উৎসের ধারে তাঁহার বাস। ইহার পূর্ব্বে ছিল এই উৎসের জলে তাঁহার ছায়াপাত। কিন্তু এবার এই উৎসের মূলেই তিনি। এতদিন ছিল তাঁহার বিষয়ে কবিতা কিন্তু এবারে তিনিই কবিতার বিষয়।

(৩) তৃতীয় স্তরে জীবনদেবতা কবিতাটি। এখানে দেখি কবির জীবনের ঘটনা ও মানসিক আবেগের তিনি নিয়ন্ত্রী। এতক্ষণে জীবনদেবতা নামটি যেন সার্থক হইয়াছে।

(৪) চতুর্থ স্তরে একবারের জন্য জীবনদেবতা বিশ্বদেবতায় পরিণত হইয়াছেন।

"অচল আলোকে রয়েছ দাঁড়ায়ে,
কিরণ বসন অঙ্গে জড়ায়ে
চরণের তলে পড়িছে গড়ায়ে
ছড়ায়ে বিবিধ ভঙ্গে।
গন্ধ তোমার ঘিরে চারিধার,
উড়িছে আকুল কুন্তলভার,
নিখিল গগন কাঁপিছে তোমার
পরশ-রস-তরঙ্গে।" [অন্তর্য্যামী, চিত্রা]

একবারের জন্য এইজন্য বলিলাম যে জীবনদেবতা বিশ্বদেবতা নহেন, কিংবা জীবনদেবতাই যে ক্রমে বিশ্বদেবতায় পরিণত হইয়াছেন, এমনও নহে। অন্যত্র জীবনদেবতা যেমন অপর ভাবের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, এখানেও সেই রকম একটা মিশ্রণ।

চিত্রায় অন্তর্য্যামী ও জীবন দেবতা কবিতা দুটির মধ্যে একটু প্রভেদ আছে।

অন্তর্য্যামীতে জীবনদেবতার সহিত কবির পুরা পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই। ইহা যেন জীবনদেবতার পূর্ব্বরাগ, ইহার প্রধান রস, অর্দ্ধ পরিচয় ও রহস্যের। জীবন-দেবতায় এই মিলন সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—অন্তরঙ্গতাই ইহার প্রধান রস।

চৈতালিতে দুই-একটি ব্যতীত প্রথম শ্রেণীর কবিতা নাই। কবির বহুসৃষ্টি-ক্লান্ত প্রতিভা কিছুক্ষণের জন্য এখানে যেন বিশ্রাম করিতেছে। কিন্তু পদ্মার প্রতি কবির আসক্তি এখানে পদ্মাকে অতিক্রম করিয়া পদ্মা-তীরকেও অধিকার করিয়াছে।

ক্ষণিকা পদ্মাতীরের কাব্য, এখানে কবি পদ্মা ও নিজের অন্তর্লোককে অতিক্রম করিয়া পদ্মা-তীর ও বাহিরের সংসারের জীবনে কতকটা প্রবেশ করিয়াছেন; অভিজ্ঞতার এই নূতন পারিপার্শ্বিকতা ক্ষণিকা কাব্যের উপাদান।

আরও একটি কথা। আমরা যতই কবির কাব্যের শিখরের দিকে উঠিতেছি ততই পৃথিবীর সংস্রব স্বল্পতর ও বায়ু লঘুতর হইয়া আসিতেছে। জীবনে যাহা কিছু আনন্দ-ও-সান্ত্বনাজনক কবি চিত্রায় তাহাদিগকে ভূতলের স্বর্গখণ্ড বলিয়াছেন। কিন্তু ক্ষণিকায় আসিয়া তাহা :—

"শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে !
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায় কথা না শুধায়
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গারে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।" [ক্ষণিকা—উদ্বোধন]

ক্ষণিকার জীবনের সেই চরম আনন্দকণাগুলি ক্ষণিক মুহূর্ত্ত। অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ছিল বস্তু, এখানে তাহা কাল। এইরূপে বস্তুবিশ্বকে কালবিশ্বরূপে প্রকাশের চেষ্টা কবির ক্রমপরিণতিশীল আর্টের একটা লক্ষণ। বলাকায় ইহার চরম। সেখানে ভূতলের পদ্মা দ্যুলোকের আকাশগঙ্গা।

এই পর্ব্বে আর তিনখানি কাব্য আছে—কল্পনা, কথা ও কাহিনী, নৈবেদ্য। পূর্ব্বের কাব্যগুলি হইতে ইহারা একটু স্বতন্ত্র। আগের গুলির উপজীব্য বর্ত্তমান, সে বর্ত্তমান কবির ব্যক্তিগত জীবনের, অথবা দেশের। উপরি-উক্ত তিন খানিতে উপজীব্য ভারতবর্ষের অতীত জীবন; বস্তুত এই তিন খানিতে প্রাচীন ভারতে কবির মানসভ্রমণের ইতিহাস।

কবির সদাজাগ্রত চিরচঞ্চল কৌতূহল দেশের বর্ত্তমান গণ্ডি অতিক্রম করিয়া কবিকে প্রাচীন ভারতের মধ্যে লইয়া গিয়াছে। কল্পনা-সর্ব্বস্ব সেই প্রাচীন জীবনকে কবি তিনখানি কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের সৌন্দর্য্যময় অংশ—কল্পনায়; ঐতিহাসিক মহত্ত্ব—কথা ও কাহিনীতে, এবং অধ্যাত্ম জীবনের বার্ত্তা—নৈবেদ্যে।

এই মানসভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুরাতন আশ্রয়টিতে আর কবি সান্ত্বনা পাইলেন না; তাঁহার জীবনস্রোত এই মানসভ্রমণের ফলে সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত হইল।

খেয়াপর্ব্ব

রবীন্দ্রনাথ কবি, কবিতা তাঁহার আত্মপ্রকাশের প্রধান প্রণালী, তাহার সঙ্গে গদ্যও আছে। ইহা একটা আনুষঙ্গিক উপায় মাত্র; এতক্ষণ আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে এই দুটিই আছে, তবে পদ্যই নিঃসংশয়িত ভাবে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এইবারে সে রীতির যেন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে।

নৈবেদ্য-প্রকাশের পরে অর্থাৎ ১৯০২ হইতে বলাকার কবিতা-রচনার সময় ১৯১৪ পর্য্যন্ত, এই দ্বাদশ বৎসর রবীন্দ্রপ্রতিভার বনবাস। সে যে একেবারে অজ্ঞাতবাস করিয়াছে তাহা নহে, প্রধানত গদ্যের ছদ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়াই বিচরণ করিয়াছে। কেন এমনটি হইল, তাহা আলোচনার পূর্ব্বে এই সময়টাতে কবির প্রধান গদ্য ও পদ্য গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দেখা যাক।

গদ্য	গদ্য
চোখের বালি, ১৯০২	গোরা
নৌকাডুবি	শারদোৎসব
স্বদেশী সমাজ	প্রায়শ্চিত্ত
জাতীয় বিদ্যালয়	রাজা
চারিত্র-পূজা	জীবনস্মৃতি

গদ্য	পদ্য
অচলায়তন	খেয়া, শিশু, স্মরণ, উৎসর্গ
ডাকঘর	গীতাঞ্জলি
শান্তিনিকেতন গ্রন্থাবলী, ১ম-১৭শ (১৯০৮-১৯১৬)	গীতিমাল্য-রচনার আরম্ভ.

এই গদ্য গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই এই সময়টিতে রচনা। ইহা ব্যতীত কবি ঘনিষ্ঠ ভাবে বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সহিত জড়িত থাকায় নানা স্থানে, বক্তৃতা ও সভাপতিত্বে ব্যাপৃত এবং ছোট-বড় নানা পত্রিকার সম্পাদনায় নিযুক্ত।

অবশ্য এই আন্দোলনের মধ্যেই তিনি খেয়া লিখিতেছিলেন, কিন্তু গীতাঞ্জলি এই আন্দোলন ত্যাগ করিবার পর লিখিত। এই সময়ে কবি ১৯০৮ কিংবা ১৯০৯-এ রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনের নিজ্জনতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এখন সমস্যা, পদ্য যাঁহার আত্ম-প্রকাশের প্রধান উপায়, তাঁহাকে প্রধানত গদ্যের আশ্রয় লইতে হইল কেন? ইতিপূর্ব্বে একটা সময়কে কবির প্রাচীন ভারতে মানস-ভ্রমণের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই মানসভ্রমণ হইতে কবি বর্ত্তমান জগতে ফিরিয়া আসিলেন। সময়-হিসাবে ইহার দূরত্ব সামান্যই। কিন্তু এই অল্প সময়েই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিল। কবি মানসচক্ষে যাহা দেখিলেন বহির্জগতে তাহার কোনও অনুদৃশ্য পাইলেন না। একদিকে ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের সেই সর্ব্বাঙ্গীন মহত্ত্ব, অন্যদিকে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের এই দুরতিক্রম্য ক্ষুদ্রতা। এই দুস্তর দ্বিধা কবিচিত্তের সেই সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া দিল—কবির আত্মপ্রকাশের জন্য যাহা একান্ত আবশ্যক। সেই সময়টিতে নবোৎসাহে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইল। কবি ভাবিলেন এই সূত্র ধরিয়া যদি আবার ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মহত্ত্বের সূত্রপাত হয়। প্রাণে-মনে তিনি আন্দোলনে যোগ দিলেন। আন্দোলনে তাঁহার এই যোগদান সেই মানসভ্রমণের একটা ফল। কবি-হিসাবে যাহা কাব্যে প্রকাশ করা স্বাভাবিক ছিল, কর্ম্মী-হিসাবে তাহাকে তিনি কার্য্যে রূপ দিতে চেষ্টা করিলেন। কল্পনার সহিত কার্য্যের মিল কবে হইয়া থাকে? বিশেষ, আন্দোলনটাতে যোগ দিয়া, বর্ত্তমান আকারে ইহা চালাইবার ব্যর্থতা তাঁহার মনে বারংবার উদিত হইতে লাগিল। তিনি আন্দোলন ত্যাগ করিলেন, শান্তিনিকেতনের নির্জ্জনতায় ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু যে-কবিধর্ম্মকে তিনি হারাইয়াছিলেন, তখনো তাহা ফিরিয়া পাইলেন না। এই সময়ে গীতাঞ্জলির ও কিছু পরে গীতিমাল্যের অপূর্ব্ব গানগুলি রচনা করিলেন। এ গানগুলির

প্রধান উপজীব্য ভগবৎ প্রেম। কিন্তু ভগবৎ প্রেম রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান উপজীব্য নহে। ইহাতে রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহের একটি শাখা জন্মলাভ করিল, কিন্তু স্বয়ং কবি ইহাতেও তাঁহার বিলুপ্ত কবিধর্ম্ম ফিরিয়া পাইলেন না।

এই মানসভ্রমণের পরে কবির প্রথম কাব্য খেয়া পাঠক-সমাজের কাছে দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল। উত্তরোত্তর এই দুর্ব্বোধ্যতার অপবাদ বাড়িয়াই চলিল। কেহ তাঁহাকে বলিল 'মিস্টিক', কেহ বলিল বাউল, কেহ বলিল পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণকারী, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে বৈষ্ণব কবিদের মন্ত্রশিষ্য বলিল। কিন্তু সকলেই প্রায় একবাক্যে বলিল কবির প্রতিভার সে দীপ্তি আর নাই। সমালোচকেরা কবির পূর্ব্বেকার কাব্য আবৃত্তি করিয়া কবিকে একেবারে নিরুত্তর করিয়া দিল। কিন্তু কেহই রবীন্দ্রনাথকে বুঝিল না।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়টিতে প্রতিভার স্বধর্ম্মচ্যুত। রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান রস মানব-রস। সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালব্যাপী মানব তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অভিনন্দন পাইয়াছে। অভিনন্দনের এই সমগ্রতা ও আন্তরিকতা আর কেহ পায় নাই—না প্রকৃতি, না স্বয়ং ভগবান্। মানসভ্রমণের ফলে, অতীত ও বর্ত্তমানের আদর্শ ও বাস্তবের পার্থক্যে, তাঁহার চিত্তে যে দ্বিধার জন্ম, এই দ্বিধাই কিছু কালের জন্য তাঁহার কাব্যপ্রতিভাকে বাধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টির পক্ষে কবিপ্রতিভার একটি একাগ্রতা আবশ্যক। এই একাগ্রতা নানা কারণে দ্বিধা হইয়া যাইতে পারে। কাল-মাহাত্ম্য তাহার মধ্যে একটা।

এই সময়টি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই রকম একটা দুঃসময়। এই সময়ে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য মানব-সমাজ লাভ করে নাই—ভগবান্ লাভ করিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্র-সাহিত্য বৈচিত্র্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু কাব্য-প্রতিভা স্বধর্ম্মচ্যুত হওয়ায় বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যে কতটা ক্ষতি হইয়া গেল, তাহা কেবল অনুমানই করিতে পারি, প্রমাণ করিবার উপায় নাই।

এই কাব্যপ্রবাহ হইতে কবির গানগুলি বাদ দিয়াছি,—কবির ভাষায় সুরহীন গান শিখাহীন প্রদীপের মত। এখন এই শিখাহীন প্রদীপের আলোচনা করিলে কবির প্রতি অবিচারের আশঙ্কাই অধিক। সঙ্গীতকলায় আমাদের অধিকার না থাকায় এই অনধিকার চর্চ্চার লোভ সংবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই গানগুলির সহিত গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালিকেও বাদ দিয়াছি। ইহাতে বোধ হয় পাঠকের দুঃখের চেয়ে বিস্ময়ের কারণ অধিক। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির দ্বারাই পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রখ্যাত। এ দেশেও, নিতান্ত দুঃখের বিষয়, অনেক স্থলে তিনি কেবল মাত্র গীতাঞ্জলির দ্বারা পঠিত। এমন স্থলে গীতাঞ্জলিত্রয়ীকে এই কাব্য আলোচনা

হইতে কেন বাদ দিলাম, একটু বিস্তৃতভাবে তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

"চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সঙ্কোচ বোধ করি। কেন না গানের বহিতে আসল জিনিষই বাদ পড়িয়া যায়। সঙ্গীত বাদ দিয়া সঙ্গীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয় যেমন গণপতিকে বাদ দিয়া তাহার মূষিকটাকে ধরিয়া রাখা।" [জীবনস্মৃতি, ২১৭ পৃ°, ১৩৩৫]

গানের বই ছাপিতে গিয়া কবি এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। গান, বিশেষ গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি সমালোচনা না করিবার ইহা গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ কি? এই গ্রন্থের নাম রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ; এই প্রবাহ সন্ধ্যা সঙ্গীতের শিখর হইতে উদ্গত হইয়া, পুষ্টতর গভীরতর হইতে হইতে চলিয়াছে। আমরা মূল স্রোতকেই অনুসরণ করিতেছি, ইহার শাখা উপশাখা অসংখ্য; তাহাদের অনুধাবন করিলে, কোন কালেই আর লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়া উঠিবে না। গীতাঞ্জলিত্রয়ী রবীন্দ্র-কাব্যের একটি শাখা, ইহা সমগ্র কাব্যকে বৈচিত্র্য ও গভীরতা দিয়াছে মাত্র।

এই শাখাটি রবীন্দ্র-কাব্যে অনেকটা প্রক্ষেপের মত। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে আজকাল, বিদেশে গীতাঞ্জলির সমাদরের ফলে, রবীন্দ্রনাথকে গীতাঞ্জলির কবি-হিসাবে দেখিবার একটা দুশ্চেষ্টা হইতেছে। অবশ্যই তিনি গীতাঞ্জলির কবি, কিন্তু তাহা একাংশ মাত্র, এবং অবশ্যই শ্রেষ্ঠ অংশ নহে।

রবীন্দ্র-কাব্য-প্রেরণার মূলে প্রধানত নারীর প্রেম; কাব্যের প্রধান ধর্ম্ম জগতের বিচিত্রতার আকর্ষণে ইহার বহুমুখিতা; এবং এই কাব্যের মূল বন্দনীয় মানব। গীতাঞ্জলি প্রভৃতির প্রেরণার মূলে ভগবৎ ভক্তি। পূরবী ও তৎপরবর্ত্তী কাব্যে দেখিতে পাই, নারীর প্রেম পুনরায় দেখা দিয়াছে। এমন ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলি-পর্ব্বে নারীর প্রেমের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের কথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। কাব্যের বহুমুখিতা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। মানব-জীবনের দশ দিক্ তাঁহাকে ডাক দিয়াছে, এবং তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি দশ মুখে সাড়া দিয়াছেন। এই বৈচিত্র্যের জন্য অনেক সময় তাঁহার কাব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই বিচিত্রতাও উক্ত পর্ব্বের বৈশিষ্ট্য নহে।

তার পরে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য মানুষ পাইয়াছে; ভগবান্ বা প্রকৃতি নহে। গীতাঞ্জলিতে ইহারও ব্যতিক্রম। অবশ্য এ তিনটি লক্ষণেরই ব্যত্যয় গানের বই তিনখানিতে আছে।

অতীত ভারতে মানসভ্রমণের ফলে কবির জীবনে একটা আধ্যাত্মিক অরাজকতার যুগ আসিয়াছিল। ইহার পরিচয় এই সময়টিতে কাব্যের অসদ্ভাবে ও গদ্যের

প্রাচুর্ভাবে। গীতাঞ্জলিতে আসিয়া তিনি আবার কাব্যকে পাইলেন, কিন্তু তাঁহার কাব্য ধর্ম্ম তখনো ফিরিয়া আসিল না।

বাহিরের কয়েকটি ঘটনায় কবির স্বাভাবিক ভগবদ্ভক্তিকে এই সময়ে আত্যন্তিক ভাবে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল; সেই অস্বাভাবিক আগ্রহে, মানব-জীবনের প্রতি কবির স্বাভাবিক আগ্রহ যেন কিছুদিনের জন্য চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এক কথায়, ইতিপূর্ব্বে কবির নিকটে মানব-জীবনটা বড় ছিল, এই সময়টাতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনটা বড় হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কবির পত্নীর মৃত্যু হয়, তার পরে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রথমা কন্যা ও তিন বৎসর না যাইতেই কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ পরলোক গমন করেন। উপরি-উপরি তিনটি মৃত্যুশোক, তদুপরি আবার ব্যাধিতে কবির শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই সব কারণে কবির দৃষ্টি কিছুকালের জন্য নিজের অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে পড়িল। তাঁহার জীবনে ভগবদ্ভক্তি গোড়া হইতেই ছিল। যে-সব উপাদানে কবির জীবন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, মহর্ষির প্রভাব তাহার একটি। এই সময়টিতে মহর্ষির প্রভাব যেমন প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে, এমন আর কখনও নহে।

ভগবদ্ভক্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটি আনুষঙ্গিক উপাদানরূপে গোড়া হইতেই ছিল, গীতাঞ্জলি-পর্ব্ব তাহারই শ্রেষ্ঠ বিকাশ। কিন্তু যে উপাদান তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উপাদান, সেই সর্ব্বমানবের সহিত একাত্মকতা-বোধ, তাহা কিছুকালের জন্য গীতাঞ্জলি-পর্ব্বে বাধাগ্রস্ত ও অবলুপ্ত হইলেও পরবর্ত্তী কাব্যে ইহার পুনরাবর্ত্তন ও নবতেজে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে—বলাকা, পূরবী, মহুয়ায়।

গীতাঞ্জলির সুলভ আধ্যাত্মিক আনন্দবাদ বলাকার কোন কোন কবিতার বিরাট্ বিশ্বব্যাপী সংশয়ের দ্বারা প্রতিহত। সেই আনন্দবাদ ও সংশয় পূরবী ও মহুয়াতে চরম শান্তি ও অখণ্ড করুণায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সেই শান্তি ও করুণার আধার ভগবান্ নহেন, প্রকৃতির স্পর্শ ও নারীর প্রেম। সে প্রেম যৌবনের উত্তপ্ত প্রেম নহে। ইহার সহিত এমন একটি সবিষাদ করুণা ও সরল শান্তির ভাব জড়িত যে ইহাকে কৈশোর প্রেম বলা উচিত, বস্তুত ইহা কৈশোর প্রেমের স্মৃতি। বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা ও অতীতের স্মৃতি ইহার মূল উপাদান। ইহা কৈশোর প্রেম বলিয়াই ইহার লক্ষ্য যে-নারী, কবি তাহাকে লীলাসঙ্গিনী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তিই যদি কবির যথার্থ ধর্ম্ম হইত, তবে কাব্যের পঞ্চমাঙ্কে আসিয়া কবি-প্রতিভা এই লীলা-সঙ্গিনীতে আশ্রয় খুঁজিত না। মানবমুখী কবি গীতাঞ্জলির পরবর্ত্তী কাব্যে স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই বলাকা পূরবী মহুয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কি কারণে মূল কাব্য-প্রবাহের অন্তর্গত নহে, তাহা দেখিলাম।

এখন দেখা যাক, কোন্ কোন্ গুণে কবির কাব্যে ইহার যথার্থ স্থান, অন্তত স্থান পাওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর হইতেই গান লিখিতেছেন, কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যাইবে গীতাঞ্জলি-পর্ব্ব হইতে গান,—কবিতা নহে,—তাঁহার ভাবের বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি সংখ্যা বাহুল্যে, কি কাব্য-সৌন্দর্য্যে গীতাঞ্জলির উত্তর-পর্ব্বের গান তৎপূর্ব্বের গানের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণ কি? সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে: জীবনের পরিণতির সঙ্গে কবি এমন একটা ছায়া-শরীরী জগতকে প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিলেন, যাহা কেবল সঙ্গীতের দ্বারাই কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব। কবির জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরের ভাবের বাহন কবিতা, কারণ সে জগৎটা সূক্ষ্ম-শরীরী হইলেও একেবারে ছায়া-শরীরী নহে। কিন্তু পঞ্চাশের কাছে আসিয়া কবির জগৎ ছায়া-শরীরী হইয়া উঠিয়াছে।

গীতাঞ্জলি-পর্ব্ব হইতে গান যেমন কবির ভাবের প্রধান বাহন হইয়া দাঁড়াইল, তেমনি এই সময়ে গানের যে ঠাট তিনি আবিষ্কার করিলেন, পরবর্ত্তী কালে তাহা কবির এবং কিয়ৎ পরিমাণে বাংলা সাহিত্যের গানের প্রধান ঠাট হইয়া উঠিয়াছে। কবির কৈশোর ও যৌবনের গানে অসংখ্য বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তাহা যেন কোনো কলাগত পরিণতি লাভ করে নাই বলিয়াই তাহাতে এত বিচিত্রতা, এত ঠাট-বদল। গীতাঞ্জলির পরের গানগুলি ঠাটের সেই পরিণতিকে লাভ করিয়াছে, কোনো পরিবর্ত্তনে যাহার সম্পূর্ণতার হানি না হইয়া আরো বিচিত্র হইয়া ওঠে।

এই তো গেল গানের বহিরঙ্গের কথা। অন্তরঙ্গে, অনেকের বিশ্বাস, গীতাঞ্জলির গান, বৈষ্ণব কবিতার নিছক প্রভাবমূলক। বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব গীতাঞ্জলিতে আছে, যেমন আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্যত্র। কাজেই ইহা গীতাঞ্জলির বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু একথাও সত্য নয় যে কোনো বৈষ্ণব কবি, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, গীতাঞ্জলির গান লিখিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠন বিচিত্র; তাহার অনেকগুলি স্তর আছে: উপনিষদের স্তর, প্রাকৃতিক অনুরাগের স্তর, দেশ-প্রাণতার স্তর, আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের স্তর। বৈষ্ণব-ভাবের অর্থাৎ যে স্তরে মানব-প্রেমের সহিত ভগবৎ-প্রেম মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, সেই বৈষ্ণব-স্তরও ইহার অন্যতম। গীতাঞ্জলি-পর্ব্বের গান এই সমস্ত স্তরের ভিতর দিয়া নির্য্যাসিত হইয়া রূপ লাভ করিয়াছে—বৈষ্ণব কবিদের একসুর-মনে এমন বিচিত্র রাগিণী ধ্বনিত হইতে পারিত না। বৈষ্ণব পদের যে বিচিত্রতা, তাহা প্রেমের নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগের ভাববৈচিত্র্যে গঠিত। বৈষ্ণব কবিরা জীবনের একটি ভাগকেই অসংখ্য ভাবে যাচাই করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক কালে জীবন যখন অত্যন্ত জটিল ও বিস্তৃত,

কবির অনুবিত্তর বহুমুখী না হইয়া উপায় নাই। এ দোষ বা গুণ কোন কবি-সম্প্রদায়ের নয়—অতীত ও বর্ত্তমানের। এই বহুমুখিতার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কবিদের হইতে পৃথক্। কবির জীবনে যে স্তরগুলির কথা বলিলাম, সব স্তরের নির্য্যাস গীতাঞ্জলি-পর্ব্বের গানে আছে। এমন গানও আছে, আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষায় ক্রমবিকাশবাদ না জানিলে, কোন মহাকবির পক্ষেও লেখা যাহা অসম্ভব হইত। [গীতিমাল্য, ৯৯ সংখ্যক গান]

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। গীতাঞ্জলিতে আমিয়া বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক অনুরাগের গান আমরা পাই। ইহার পূর্ব্বে প্রকৃতি মানুষকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার কাব্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে সে কেবল নিজের গৌরবেই কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক অনুরাগ স্পষ্টতর হইয়া অসংখ্য গানে প্রকাশিত। ইহা কেন হইল? ইহা তাঁহার শৈশবের প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের পুনরবতারণা মাত্র। শৈশব হইতেই প্রকৃতির সহিত কবি একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন; সঙ্গিহীন শৈশব-জীবনে প্রকৃতিই তাঁহার খেলার সাথী ছিল। এই প্রেম চির জীবন তিনি বহন করিয়াছেন। কিন্তু যৌবনে ও প্রৌঢ়ে জীবনের বিচিত্র আবর্ত্তে পড়িয়া শৈশবের সঙ্গী অনেকটা পিছাইয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের প্রেমে ও প্রকৃতির প্রেমে প্রভেদ এই যে, মানুষের প্রেমে দ্বন্দ্ব আছে, তাহা সজীব মনের সহিত সজীব মনের সংঘাত। প্রকৃতির প্রেম নির্দ্বন্দ্ব; তাহার দিক্ হইতে কোনো বাধা, কোনো প্রচেষ্টা নাই; এই প্রেমে মানুষ যেন সম্পূর্ণ ভাবে আপনার শক্তিকে লাভ করিতে পায় না। যৌবনের শক্তি-বহুল সময়টা দ্বন্দ্ব চায়, সংঘাত চায়, তাহাতে আপনাকে সে সম্পূর্ণভাবে লাভ করে। কাজেই প্রাকৃতিক প্রেম অনেক সময়েই যৌবনকে পুরাপুরি সন্তুষ্ট করিতে পারে না। এ প্রেম শৈশবের এবং বার্দ্ধক্যের। কবির শৈশবে প্রকৃতি যে সঙ্গ দান করিত, সেই পুরাতন সঙ্গ পুনরায় তিনি নূতন ভাবে, এবং দীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মিশ্রণে নিবিড়ভাবে ফিরিয়া পাইলেন এই সময়টাতে। পরবর্ত্তী কালে এই পুরাতন সঙ্গী কবিজীবনের প্রধান একটি পাত্র হইয়া উঠিয়াছে।

বলাকা-পর্ব্ব

এই সময়টিতে কবির কাব্যজীবনে একটি পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে আসিতেছিল, হঠাৎ একটি ঘটনায় তাহা অভাবিতপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বলাকা প্রকাশিত হইল। কিন্তু ইহার অনেক কবিতা ১৯১৪ হইতে অর্থাৎ কবির ইউরোপ

প্রত্যাবর্ত্তনের অল্প পরেই রচিত হইতেছিল। 'বলাকায় আসিয়া কবি পুনরায় মানুষের কবি হইয়া দেখা দিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ নৈবেদ্য-প্রকাশের পর হইতে কবির প্রতিভার বনবাস; বার বৎসর পরে কবি-প্রতিভা বনবাসের তপস্যায় উজ্জ্বল পাণ্ডবগণের মত পুনরায় মানবের ক্ষেত্রে দেখা দিল। নৈবেদ্য-প্রকাশের পর হইতে আধ্যাত্মিক অরাজকতায় কবি-প্রতিভা যে সঙ্গতি-লাভের চেষ্টা করিতেছিল—যে অনুসন্ধানে মানবের কবিকে সাময়িক ভাবে মানুষের দেবতার পাদপীঠে লইয়া গিয়াছিল, সেই চেষ্টা সেই অনুসন্ধানের অন্তে মানুষের কবি পুনরায় সংসারের ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ঠিক পূর্ব্বের কাব্য আর হইল না। গীতাঞ্জলি-পর্ব্বের অভিজ্ঞতার রং কবির পরবর্ত্তী কাব্য রঞ্জিত করিয়া তুলিল। সেই জন্য বলাকা পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্য হইতে অভিজ্ঞতার ও অভিজ্ঞতার প্রকাশে বিচিত্র ও জটিলতর।

গীতাঞ্জলিতে যে অভিজ্ঞতার বিকাশ, গীতিমাল্যে আসিয়া তাহা পূর্ণতর হইয়াছে, কিন্তু গীতালি পড়িলেই স্পষ্ট দেখা যায়, সে অভিজ্ঞতার বর্ণ ফিকা হইয়া আসিতেছে, সে প্রেরণা অনেক পরিমাণে চলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার ঝোঁকটা রহিয়াছে মাত্র। তার পরেই বলাকা। সূর্য্যোদয়ে অব্যবহিত পূর্ব্বের অন্ধকারটিই গভীরতম। বলাকার পূর্ব্বেই গীতালি।

বলাকাতে কবি-প্রতিভার পুনরাবর্ত্তন ঘটিল কেমন করিয়া? যে যে কারণে গীতাঞ্জলির আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল, সে সমস্ত ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া যাইতেছিল। মৃত্যুর শোক হৃদয়ের ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া কল্পনার ভাণ্ডারে গিয়া পড়িল। শারীরিক ব্যাধি ও অবসাদ দূর হইয়া নূতন ভাবে কবি স্বাস্থ্যের আনন্দ লাভ করিলেন; এবং দীর্ঘকাল বিদেশ-ভ্রমণে কবি-প্রতিভা গতিমন্ত্রে পুনরুদ্দীপিত হইয়া দেখা দিল। যে-মানবকে তিনি চির দিন অনুসন্ধান করিতেছিলেন—এ দেশে কেবল যাহার ভগ্নাংশ মাত্র লাভ করিয়াছিলেন—ইউরোপের পূর্ণতর ক্ষেত্রে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে পাইলেন। সহসা নোবেল-পুরস্কারের সিংহদ্বার খুলিয়া মানুষের কবিকে সমস্ত মানব-সমাজ যেন আনন্দে অভ্যর্থনা করিল।'

রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির পক্ষে নোবেল-পুরস্কার এমন কিছু অসম্ভাবিত সৌভাগ্য নহে। কিন্তু এই উপলক্ষ্যটা তাঁহার কাব্য-জীবনের ইতিহাসের পক্ষে স্মরণীয়। এই সুযোগ না ঘটিলে, কবি যেভাবে ইউরোপের বৃহৎ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র মানব-সমাজের অভিজ্ঞতা আজ লাভ করিতে পাইয়াছেন এমন সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ; এবং ইহা সম্ভব না হইলে কবি-প্রতিভা গীতাঞ্জলির অভিজ্ঞতা-পর্ব্ব হইতে ফিরিয়া পুনরায় আপনার স্বাভাবিক সঞ্চরণের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিত কিনা সন্দেহ। কবির প্রতিভার বহুমুখিতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা আছে, এ

দেশের ক্ষুদ্র জীবন-ক্ষেত্রে যেন তাহা পূর্ণভাবে পাখা মেলিতে না পারিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিল। এই ঈগল-শিশুর সতত প্রসরণশীল ডানার পক্ষে পিঞ্জর যত বড়ই হউক, তাহা পিঞ্জর মাত্র। ইহার পাখা মেলিবার পক্ষে ইউরেশিয়ার সুবৃহৎ আকাশ-পট আবশ্যক।

বলাকা রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভা-নাটকের তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম অঙ্ক যতগুলি সূত্র ও সম্ভাবনা লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল, দ্বিতীয় অঙ্কে তাহা ঘাত-প্রতিঘাতে বিচিত্র হইয়া তৃতীয় অঙ্কে সম্ভাব্যতার চরমে উঠিয়াছে। শেষের দুইটি অঙ্কে অন্য কোন সম্ভাবনা নাই—কেবল তৃতীয়ে যাহা নাটকীয়তার শিখরে উঠিয়াছে, শেষ দুইটিতে তাহারই সুযোগ্য সমাধান। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সুরু হইতে যে শিল্পধর্ম্ম ও ভাবের সূত্রপাত দেখা যায়, বলাকায় তাহা পূর্ণ পরিণতি পাইয়াছে।

বলাকায় প্রধান লক্ষণীয় ইহার ছন্দ। ছন্দের এই অভিনব বৈষম্যে কবি কি করিয়া উপস্থিত হইলেন—সে ইতিহাস আলোচনা করা যাক।

সন্ধ্যাসঙ্গীত কবি-প্রতিভার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় কাব্য। সন্ধ্যাসঙ্গীতেই কবি প্রথম পূর্ব্বতন ভাষার জড়তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে গীতিকাব্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, গতি বা ভাষার চলতা কবির আয়ত্ত ছিল না। সন্ধ্যাসঙ্গীতে প্রথম বারের জন্য ইহা দেখা দিল।

মানসীর শেষে এবং সোনার তরীতে আসিয়া শিল্পধর্ম্মের আর একটি সম্পদ্ কবি লাভ করিলেন—তাহা ভাষার সংহতি-শক্তি। এই গুটির যে কোনো একটিকে বাদ দিলে শিল্পের চরম সার্থকতা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। এই গতি ও সংহতির সামঞ্জস্য শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যে দেখা যায়। ভাষার এই গতি যেমন মনের একটি লক্ষণ, ভাষার সংহতিও তেমনি মনের সংযমের পরিচায়ক। এই সংহতি-সংযম-বিহীন শিল্পী অপ্রতিহত গতির স্রোতে আপনাকে উদ্দাম করিয়া দিয়া নিঃস্ব করিয়া ফেলে। বিশেষ যাহার প্রতিভার ধর্ম্মই চলতা, তাহার পক্ষে এই সংহতি-গুণ অপরিহার্য্য। সোনার তরীর পূর্ব্বে কবির কাব্য যে পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাহার প্রধান কারণ তিনি এই সংহতি-শক্তি তখনও লাভ করেন নাই।

এই গতি ও সংহতির দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের চেষ্টার ইতিহাস-ই সোনার তরী হইতে নৈবেদ্যের ইতিহাস। গীতাঞ্জলি-পর্ব্ব প্রধানত সঙ্গীতাত্মক বলিয়া উহাতে গতির প্রাধান্য। শুধু তাই নহে উক্ত পর্ব্বের আধ্যাত্মিক অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে কবি সোনার তরীতে আয়ত্ত সংহতি-গুণকেও এই সময়ে হারাইয়াছিলেন। বলাকায় আসিয়া প্রতিভার যথার্থ ক্ষেত্র লাভের সঙ্গেই প্রতিভার পূর্ব্বায়ত্ত এই

শক্তি ফিরিয়া আসিল। বলাকার ছন্দ এই দুই শক্তির শিল্পসম্মত সামঞ্জস্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কল্পনায় এই সংহতিগুণের চরম। ইহার অনেকগুলি কবিতাই এক একটি শ্লোকে সংহত হইয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আবার ক্ষণিকার অধিকাংশ কবিতার সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিরল ধারায় যেন বহিয়া গিয়াছে। ইহাতে গতির চরম। এই দুটিই বলাকায় লক্ষ্য করিবার মত।

এই ছন্দের কবিতাগুলিতে কয়েকটি ছত্র লইয়া একটি শ্লোক বাঁধিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে বন্ধন কল্পনার শ্লোকবন্ধনের মত অপরিবর্ত্তনীয় ও দৃঢ়পিনদ্ধ নহে। প্রত্যেকটি শ্লোক স্বকীয় প্রয়োজন ও ধর্ম্ম অনুসারে হ্রস্ব, দীর্ঘ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ হইয়া বিচিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে। কল্পনার প্রত্যেকটি শ্লোকে একই নিয়মের পুনরাবর্ত্তন; একটি শ্লোকের আকৃতিকে ব্যষ্টি ধরিয়া, অনেকগুলি শ্লোকে একটি কবিতা গঠিত। ইহার বৈচিত্র্য একই ব্যষ্টির আবর্ত্তনের উপরে নির্ভর করে। বলাকায় শ্লোকের আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতির উপরে অধিক নির্ভর। প্রত্যেকটি শ্লোক নিজের স্বভাব অনুসারে গঠিত, আবার অনেকগুলি বিচিত্রধর্ম্মী শ্লোক লইয়া একটি অবিভাজ্য সম্পূর্ণতার সৃষ্টি। এক দিকে শ্লোকের সংহতি, অন্য দিকে প্রত্যেকটি শ্লোকের বিচিত্র গতি, ইহারই সুনিপুণ সমাবেশ বলাকার ছন্দ।

এই গেল যেমন কাব্যের বহিরঙ্গের কথা—অন্তরঙ্গেও এই রূপ একটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। চলতা-ধর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেন একটা নদীর স্রোতকে অনুধাবন করিয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বের কাব্যে ইহা পদ্মা। কিন্তু বলাকায় আসিয়া দেখি সেই মর্ত্ত্যধারা আকাশ-গঙ্গায় পরিণত হইয়াছে। ব্যোমযানে করিয়া যতই উচ্চে ওঠা যায়, ক্রমে বায়ু-মণ্ডল পৃথিবীর সংস্পর্শ-শূন্য হইতে হইতে স্বচ্ছ ও লঘু হইয়া আসে। বলাকার এই অত্যুচ্চ শিখরে কাব্য প্রায় নির্গুণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যেন স্বতন্ত্র একটা দেশ—পৃথিবীর একটা ছায়াশরীরী সংস্করণের মত। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যের মত বস্তু-বিশ্বের জগৎ নয়; কাল-বিশ্বের জগৎ। এ জগতের প্রধান উপাদান কাল এবং তাহার ধর্ম্মই চলিয়া-যাওয়া; অর্থাৎ যে চলতা পূর্ব্বে কাব্যের ধর্ম্ম ছিল এখানে তাহাই কাব্য-বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

একটা উদাহরণ লওয়া যাক। সোনার তরী, চিত্রায় কবি যে ক্রম-বিকাশ-বাদের কথা বলিয়াছেন, যেমন বসুন্ধরা বা সমুদ্রের প্রতি কবিতায়, তাহা ডারবিনের উদ্ভাবিত কায়িক বা পার্থিব ইভল্যুশন। স্থূল জগতের কতকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়মের চক্রান্তে জীব-জগতে অন্ধভাবে একটা উন্নতির সোপান শ্রেণী চলিয়াছে। নিম্নতম জীব হইতে উচ্চতম সকলেই আপনার অজ্ঞাতসারে প্রাণ-পুরুষের তাড়নায় উচ্চতর

সোপানে উঠিয়া যাইতেছে। ইহা হইতে না আছে তাহার নিস্তার না আছে তাহার স্বেচ্ছায় একচুল এদিকে ওদিকে যাইবার শক্তি। এখানে মানুষ জড় জগতের সগোত্র। এই মৌলিক জড়ত্ব মানুষের পক্ষে গৌরবের নয়।

বলাকার ক্রম-বিকাশ-বাদ এমন জড় যাত্রা নহে। ইহার কাল-বিশ্ব আপনার নিয়মে আপনি প্রবর্ত্তনা পাইয়া বিকশিত হইতেছে। আমরা ক্ষুদ্র দৃষ্টি-বশত তাহার একাংশ মাত্র দেখি বলিয়াই তাহার আগুন্ত সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। অবশ্য বার্গসঁ স্পষ্টত ইহার আগুন্ত এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার মতে এই কাল-বিশ্বের একমাত্র ধর্ম্ম অর্থহীন নিরুদ্দেশ গতি। রবীন্দ্রনাথ এমন কথা বলিতে পারেন না। তিনি জীবনে যে ঐক্য ও মহাপরিণামকে অনুসন্ধান করিতেছেন, যাহার আভাস তিনি ক্ষণে ক্ষণে পাইয়াছেন, গীতাঞ্জলি পর্ব্বের অভিজ্ঞতায় যে পরিণতির স্বাদলাভ সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল, এমন অবস্থায় বার্গসঁর দুর্জ্ঞেয় নিরর্থক গতিবাদ তিনি স্বীকার করিতে পারেন না।

যদিও ইহা সত্য, তবু তিনি এই নিরর্থক গতিবাদের যতটা নিকটে এখানে আসিয়াছেন, এমন ইহার আগেও নয়, পরেও নয়। বলাকায় এই গতিবাদ দুই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কতকগুলি কবিতায় কেবল গতি, তাহাতে পরিণাম বা সার্থকতার উল্লেখ স্পষ্ট ভাবে নাই। দুটি তিনটি কবিতায় গতি যে পরিণতির মুখে আগত তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

সমসাময়িক ফাল্গুনীতেও এই একই গতিবাদ। বৎসরের চক্র নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া আবর্ত্তিত হইলে দেখি তাহার পরিণাম বসন্ত। মানুষের জীবনে একই লীলা। যৌবনের দল অবিরাম অনুসন্ধানের পর রহস্যের অন্ধকার গুহাটার ভিতর হইতে নবযৌবনকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। পিছন হইতে যাহাকে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইয়াছিল—চক্র সম্পূর্ণ আবর্ত্তিত হইলে সম্মুখ হইতে তাহাকে যৌবন রূপে দেখা গেল। অবশ্য সে-যৌবন 'ফাল্গুনীর যুবক দলের' অপেক্ষা গম্ভীরতর আর একটা অভিজ্ঞতা। এই যৌবন, দৈহিক যৌবন ও বার্দ্ধক্য, জীবনের এই দুই বিপরীত কোটির পরপারে অবস্থিত একটা আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য ছাড়া আর কিছু নয়।

বলাকাতেও এই তত্ত্ব আর এক ভাবে প্রকাশিত। পৃথিবীর জড় ও জৈব সকলের মধ্যেই একটা অবিশ্রাম গতির আকাঙ্ক্ষা; ইহার কারণ সকলেরই মনে একটা রূপ গ্রহণ করিবার আগ্রহ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেকে ঈপ্সিত রূপ না পাইতেছে, ততক্ষণ গতি ও পরিবর্ত্তনের আর সীমা নাই। একটা ভাঙিয়া আর একটা, একটির পরিবর্ত্তনে আর একটি—কিন্তু যেমনি ইহারা ঈপ্সিত রূপে আশ্রয় লাভ করিয়া আত্ম-অস্তিত্বে সচেতন হইতেছে অমনি এই অবিরাম গতির সার্থকতা। তার পূর্ব্বে না আছে

ইহার বিরাম, এবং স্বরূপ লাভ না করিলে না ঘুচে ইহার নিরর্থকতা। বিশ্বের ধূলা-বালি হইতে মানুষের চৈতন্য সবই এই এক আন্দোলনে, এক আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত, আন্দোলিত।

যেমন ধরা যাক শিল্পীর মন। একটি ভাব-তরঙ্গে তাহার চিত্তের অখণ্ড শান্তি চঞ্চল হইয়া শত সহস্র তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল। কল্পনার ক্রিয়া সুরু হইল। এই ক্রিয়াটা যতক্ষণ রূপ না পাইতেছে ততক্ষণ ইহার শান্তি নাই। যে পরিমাণে সে শান্ত হইতেছে, সেই পরিমাণে সে রূপ পাইতেছে; তাহার যতটুকু শান্ত হইল, ততটুকু রূপ পাইল। আমরা যখন শিল্প সৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হই, তখন ক্রিয়াটা সম্পূর্ণ ভাবে থামিয়া গিয়াছে। শিল্প সৃষ্টির এক প্রান্তে সৃষ্টি, অপর প্রান্তে শিল্পীর চিত্তের ক্রিয়া, মাঝখানে এই পরিবর্ত্তনশীল গতি ও স্থিতির লীলা। আমরা সাধারণত সৃষ্টি ও ক্রিয়া সম্বন্ধেই সচেতন, অধিকাংশ লোকেই স্বভাবে মাঝখানকার প্রক্রিয়াটাকে অনুধাবন করি না। করি আর না করি, সৃষ্টি তত্ত্বের আসল রহস্যটা ওইখানে।

সমাজে বা রাষ্ট্রেও ঠিক তেমনি। সমাজে বা রাষ্ট্রে মানুষের চিত্ত যতক্ষণ একটা ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য না পাইতেছে, ততক্ষণ বিদ্রোহ ও অরাজকতার পালা। বিদ্রোহ এবং অরাজকতা এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যাবস্থা; ইহার পরিণাম একটা সুশৃঙ্খলিত সামাজিক ব্যবস্থান। এই মধ্যাবস্থাটাকে রবীন্দ্রনাথ চরম বলিয়া মনে করেন না, সেই জন্য তিনি সমাজে বা রাষ্ট্রে বা শিল্পে বিদ্রোহনায়ক নহেন। একথা অবশ্য সত্য, তিনি এমন অনেক মত প্রচার করিয়াছেন, যাহা বিদ্রোহের জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আরো একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, তাঁহার বিদ্রোহ, সর্ব্বদাই একটা গভীরতর সামঞ্জস্যে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত। আর সামঞ্জস্যই তো শান্তি। ফলত রবীন্দ্রনাথের মতে যেমন বিশ্বের মধ্যাবস্থায় বিদ্রোহ বা গতি, তেমনি তাঁহার ফিলজফির প্রারম্ভে বিদ্রোহ আর অন্তে সামঞ্জস্য ও শান্তি।

বলাকায় তত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলাম অবিরাম গতি অবিচলিত বিরামের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া সার্থকতা লাভ করিল। আবার বলাকায় বহিরঙ্গের দিক্ হইতেও দেখিয়াছি, কাব্যের গতি সংহতির মধ্যে ধরা দিয়াছে। অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে একই প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে অনুসৃত হইয়াছে। এই যে সর্ব্বাঙ্গীন সমাবেশ বা সামঞ্জস্য ইহাই বলাকার বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে সর্ব্বতোভাবে অনুধাবন না করিলে বলাকা বুঝিবার চেষ্টা ব্যর্থ শ্রম মাত্র।

বলাকায় এই কাব্য আলোচনার সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনী আজিও নব নব কাব্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সেই সতত প্রবহমান

কাব্যপ্রবাহের অনুসরণ করিলে এ গ্রন্থ শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই, কাজেই লোভ থাকিলেও সে ইচ্ছা সংবরণ করিতে হইল। তবে দু'চার কথায় সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কাব্য-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিব।

বলাকার পরে

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'বলাকার পরে তাঁহার কাব্যে আর কোনো নূতন সূত্র নাই, পুরাতনেরই নবতন ভাবে সমাধান। এই যুগের বিশেষত্ব ইহার আত্মস্থ সহজ ভাব। যেমন অস্ত্র আর বাহুবল। অস্ত্রও শক্তি কিন্তু তাহা মানুষের সহিত একাত্ম নহে, বাহ্য। বাহুবলও শক্তি, তাহা একবারে মানুষের রক্তমাংসের সহিত জড়িত, অস্ত্রের মত বাহ্য প্রকাশ তাহার নাই। বাহ্য প্রকাশ নাই বলিয়াই, সে আরো বেশি করিয়া শক্তিমানের সম্পদ্।'

(বলাকার পরের কাব্যের সহিত পূর্ব্বের কবিতার প্রভেদ অনেকটা এই জাতীয়। বাহিরের দিক্ হইতে এ যুগের কাব্য অনেকটা সরল হইয়া আসিয়াছে, শক্তির লীলা আর তেমনভাবে পরিদৃশ্যমান নহে। ইহার কারণ শক্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক সরলতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহা কবির কাব্য অপেক্ষা গানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। কাব্যের মধ্যে যে পূর্ব্বসূত্র-সমাধানের উল্লেখ করিলাম তাহা পলাতকা ও শিশু ভোলানাথে দ্রষ্টব্য শিশু ভোলানাথ পূর্ব্বরচিত শিশু-কাব্যের প্রবাহজাত, এবং পলাতকাকে কথা ও কাহিনীর কাহিনী অংশের অনুধাবন বলিয়া মনে হয়। ছন্দটা বলাকার প্রভাব সূচনা করে। পলাতকার গল্পের পরিবেষ্টন কাহিনীর অপেক্ষা অনেক সরল ও ঘরোয়া, ইহা গল্পগুচ্ছের পরিবেষ্টনের কথা মনে করাইয়া দেয়।

পূরবীতে কবির দীর্ঘ কাব্য-জীবনের সকল ভাব-উপজীব্য ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে ইহা যেন তাঁহার বিশাল কাব্য-গ্রন্থের শেষে সূচীপত্রের মত। কাব্যের সমস্ত স্তরের চিহ্ন ইহাতে বিদ্যমান।)

ইহাতে মানসীর কিশোর প্রেম হইতে বলাকার গতিমন্ত্র কিছুই বাদ যায় নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দু'টি ভাব ইহার প্রধান উপজীব্য। কিশোর প্রেমের স্মৃতি ও প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ। শৈশবে ও বাল্যকালে অন্য কোনো ভাবের দ্বারা প্রতিহত না হইয়া প্রকৃতির সহিত কবি যেমন মিশিতে পারিয়াছিলেন, আজ দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের প্রান্তে আসিয়া তেমনি সহজভাবে পুরাতন সেই বাল্য সাথীর সহিত মিলনে উৎসুক। ইহাতে যে প্রেমের কথা, তাহাও খেলার সঙ্গিনীর প্রেম। কোনো উচ্চতর ভাবাবেশে সে প্রেমের পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই কৈশোর স্মৃতির প্রাধান্যের জন্য পূরবীকে দ্বিতীয়

কৈশোরের কাব্য বলিতে ইচ্ছা করে। পূরবী সায়াহ্নের রাগিণী, কিন্তু পূরব শব্দটিতে প্রভাতের ধ্বনি রহিয়া গিয়াছে। ওই কথাটি শব্দে ও অর্থে আপনার মধ্যে সুনিপুণ-ভাবে যেন প্রভাত ও সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই কি গ্রন্থখানির নাম পূরবী রাখা হইয়াছে?

সম্প্রতি কবি গদ্য-ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু ইহারও মূল বলাকার ছন্দে। বলাকা, পলাতকা, লিপিকা অবশেষে এই গদ্য-ছন্দ। গতানুগতিক ছন্দ হইতে বলাকা এবং পলাতকার মুক্তি। লিপিকায় আসিয়া গদ্য ও পদ্য পাশাপাশি দাঁড়াইল, কিন্তু কবির পূর্ব্বসংস্কারের জন্য গদ্যের জয় হইল। এই ছন্দকে পদ্যের মত না সাজাইয়া, শ্লোক-রূপে না রাখিয়া প্যারাগ্রাফরূপে গাঁথিয়া গেলেন।

সম্প্রতি লিপিকার ছন্দকেই গদ্যের ঠাটে না সাজাইয়া পদ্যের মত শ্লোকে সাজানো হইয়াছে। ইহা ভাল কি মন্দ সে আলোচনার স্থান ইহা নহে, তবে ইহাতে বাংলা কাব্যের দুইটি উপকার হইবে। প্রথমত বাংলা ছন্দের গতানুগতিকতা হইতে পরবর্ত্তী কবিদিগকে ভাষা ও ছন্দের স্বাভাবিক মুক্তির দিকে তাকাইতে শিক্ষা দিবে। দ্বিতীয়ত ইহাতে কাব্যবস্তুর সীমা অনেকটা বাড়িয়া যাইবে। গতানুগতিক ছন্দে, সব কথা বলা চলে না। পূর্ব্ব-সংস্কার-মুক্ত ছন্দে এমন অনেক কথা বলা যায়, যাহা অন্যত্র সম্ভব হইত না; পূর্ব্বের দীর্ঘ কাব্য-জীবনে যে সব কথা বলিতে সাহস করেন নাই, এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা রবীন্দ্রনাথ এই গদ্য-ছন্দে করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শেলি, কীট্‌স, কালিদাস

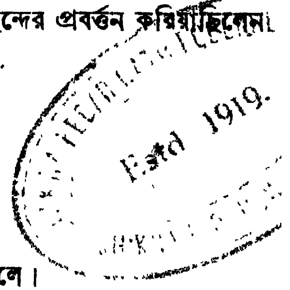
রবীন্দ্রনাথ জীবনে ও সাহিত্যে, জীবিত ও মৃত বহু ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। জীবনকে যে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিতে চায়, পরের প্রভাবকে সে এড়াইতে পারে না। কিন্তু এইসব প্রভাব তাঁহার সাহিত্যের উপাদান মাত্র, ব্যবসায়ে যেমন মূলধন; পরের মূলধনে তিনি অনেক মুনফা দেখাইয়াছেন, কাজেই তাঁহাকে ঋণী হইয়া থাকিতে হয় নাই। এখানে, তাঁহার সাহিত্যে অন্যের প্রভাবের আলোচনা,—সেই শোধ-করিয়া-দেওয়া মূলধনের আলোচনা। ইহাকে তাঁহার সাহিত্যের উপাদানরূপে দেখিলেই বিষয়টিকে সত্যভাবে দেখা হইবে।

প্রথম জীবনে তিনি বিহারীলালের কাব্য-দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এ কথা নিজেই তিনি জীবন-স্মৃতিতে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার অপেক্ষাও সত্যকথা জীবন-স্মৃতিতে আছে। তিনি এক সময়ে বিহারীলালের ছন্দের প্রভাব হইতে মুক্তি পাইলেন, সেটা সন্ধ্যা সঙ্গীতের পর্ব্ব। আমাদের আলোচনার ঐ সময় হইতে সুরু,

কাজেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিহারীলালের প্রভাব আমাদের পক্ষে তত গুরুতর নহে, যেমন গুরুতর সন্ধ্যা সঙ্গীত পর্ব্বে ঐ প্রভাব হইতে তাঁহার মুক্তি।

"বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গসুন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন—তাহা তিন মাত্রা মূলক—যেমন :—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুর-নদীর জলে
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনী-দলে।



তিন মাত্রা জিনিষটা দুই মাত্রার মতো চৌকা নহে, তাহা গোলার মতো গোল, এইজন্য তাহা দ্রুতবেগে গড়াইয়া চলিয়া যায়। তাহার এই বেগবান্ গতির নৃত্যে যেন ঘন ঘন ঝঙ্কারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। * * * সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে, কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। * * * কোনো প্রকারে পূর্ব্ব সংস্কারকে খাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিখিতে যাওয়াতে যে জোর পাইলাম—তাহাতেই এই প্রথম আবিষ্কার করিলাম যে যাহা আমার সকলের চেয়ে কাছে পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরসা করিতে পারি নাই বলিয়াই নিজের জিনিষকে পাই নাই। [জীবনস্মৃতি, ২১০-১১, ১৩৩৫]

অতএব দেখা যাইতেছে, এই গ্রন্থে বিহারীলালের প্রভাব অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্তির আলোচনা অধিকতর প্রাসঙ্গিক। কিন্তু হঠাৎ এই মুক্তি আসিল কেমন করিয়া! কবি বলিতেছেন—ইহা স্বভাবতই ঘটিয়াছিল। হয়তো তাহাই, কারণ স্বভাবের মধ্যে মুক্তির আকুতি না থাকিলে ঘটনায় তাহা ঘটিয়া উঠিত না। কিন্তু স্বভাবের ধর্ম্ম ছাড়াও আরো একটা কারণ আছে। এই সময় আর একটা বড় প্রভাব ধীরে ধীরে তাঁহাকে আবিষ্ট করিতেছিল। ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব। সন্ধ্যা সঙ্গীতের পূর্ব্বে ভানুসিংহের পদাবলী। ভানুসিংহের কবিতা লিখিবার সময়ে কবি গভীরভাবে বৈষ্ণব কবিতা অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

"পূর্ব্বেই লিখিয়াছি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম

তাহার মৈথিলী-মিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্ব্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এতো অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলাম।" [জীবনস্মৃতি, ১৪৩, ১৩৩৫]

এই অধ্যবসায়ের প্রত্যক্ষফল, ভানুসিংহের পদাবলী, কিন্তু পরোক্ষফল আরো বড়। বৈষ্ণব কবিদের বিশুদ্ধ লিরিকের সোনার কাঠির স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পূর্ব্বে যে জড়তা, যে সংস্কার ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে ইহাই তাঁহার নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। তাঁহার অন্তর্জীবনে কি ঘটিয়াছিল, জানি না, যাহার দরুন, একদিন প্রাতঃসূর্য্য-রশ্মি তাঁহার চোখের উপর হইতে বিশ্বের যবনিকা তুলিয়া দিল, কিন্তু কবির শিল্প-জীবনে সেই সূর্য্য-রশ্মি-কর বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলীর স্পর্শরূপ বাংলার গীতি কবিতার ঝঙ্কার; আর সেই তুষারাহত নির্ঝর তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কারাবদ্ধা বন্দিনী গীতি কবিতা। বৈষ্ণব কবিতা হইতে জীবনে ইহার পরেও তিনি লাভবান্ হইয়াছেন, কিন্তু এই সময়টাতে তাঁহার যে লাভ তাহা অমূল্য। ঠিক এই সময়টিতে এই স্পর্শ না আসিলে তাঁহার জীবন কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত কে বলিতে পারে? এই সময় হইতে তাঁহার জীবনে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবের সূত্রপাত। ইহার কয়েক বছর পরে তিনি ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পদরত্নাবলী নাম দিয়া বৈষ্ণব পদাবলী হইতে একখানি কাব্য-চয়নিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার বহিরঙ্গের স্পর্শেই তাঁহার ভাষার পূর্ব্বতন জড়তা হইতে মুক্তি; অন্তর্নিহিত সুপ্ত শিল্পি-ধর্ম্মের জাগরণ; লিরিক কবিতার প্রবাহের উদ্বোধন!

এই সময় রবীন্দ্রনাথ শেলির কবিতায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এই তথ্যটা সেকালের পাঠকগণও যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

"আমাকে তখন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেটা শেলির পক্ষে অপমান এবং আমার পক্ষে উপহাস স্বরূপ ছিল; তখন আমি কলভাষার কবি বলিয়া উপাধি পাইয়াছি।" [জীবনস্মৃতি, ২৬১, ১৩৩৫]

বৈষ্ণব কবিদের লিরিকের স্পর্শে যেমন কবির ভাষার জড়তা-মুক্তি ঘটিল, শেলির লিরিকেও অনেকটা তাহাতে সহায়তা করিল। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে—বৈষ্ণব কবিদের অপেক্ষা শেলির প্রভাব রবীন্দ্রনাথের এই সময়টার কাব্যে অনেক বেশি। বৈষ্ণব কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের শিল্পধর্ম্মের মাত্র ঐক্য ছিল; বৈষ্ণব কবিতার অন্তরঙ্গের সহিত তিনি নিবিড়ভাবে অন্তরঙ্গতা করিতে পারেন নাই। কিন্তু শেলির সহিত তাঁহার ঐক্য গভীরতর। রবীন্দ্রনাথ ও শেলির শিল্পধর্ম্ম একই জাতীয়;

উভয়ের মনের গড়ন একই রকম। উভয় কবির মানসিক গড়ন এক রকম হওয়াতে, তাহার প্রকাশও অনেকটা একই রীতি অনুসরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শেলির কাব্যের সহিত পরিচিত না হইলেও এই প্রকাশ-রীতির তেমন বিঘ্ন ঘটিত না, কিন্তু পরিচিত হইয়া, স্বভাবত যাহা একধর্ম্মী, তাহা প্রকাশের সুবিধা ঘটিয়াছে। ইহাকে প্রভাব বলিয়া আলোচনা করার অপেক্ষা উভয়ের প্রতিভাকে সগোত্র বলিয়া আলোচনা করা অধিকতর সঙ্গত।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বিশেষভাবে কতকগুলি শেলির বড় প্রিয় ছিল, যেমন ঝটিকা, মেঘ, নদীস্রোত, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সমুদ্রের লীলা, ইটালির আকাশের নীলকান্ত পাত্র হইতে উচ্ছ্বসিত রৌদ্রের সুবর্ণধারা, গুহামুখনিঃসৃত চঞ্চল জলপ্রবাহ, ইত্যাদি। ইহাদের বর্ণনা ও ব্যবহার ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের নিকটও এই জাতীয় দৃশ্যই প্রিয়। পদ্মার জলধারা, যাহা নিয়ত চঞ্চল, তবু যাহার অন্ত নাই; আকাশে মেঘের লীলা; গুহানিঃসৃত জলস্রোত; সূর্য্যের উদার আলো। উভয় কবির যে এই জাতীয় দৃশ্যগুলি প্রিয়—তাহার কারণ ইহাদের মধ্যে, এই পরিবর্ত্তনশীল অথচ অপরিবর্ত্তনীয় দৃশ্যগুলির মধ্যে, তাঁহারা নিজেদের কবিধর্ম্মের প্রতীক দেখিতে পান। পদ্মা রবীন্দ্রনাথের এত যে প্রিয়, তাহা যেন তাঁহার কাব্যের প্রতীক স্বরূপ। 'ফাল্গুনী' নাটকের গুহামুখনিঃসৃত নদী অনন্ত রহস্যাবৃত জীবনের প্রতীক।

ইহাদের সেই কবিধর্ম্ম কি? নিয়ত গতিশীলতা, চঞ্চলতা, পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা সেই কবিধর্ম্মের একটা দিক্। এইরূপ যে কবিধর্ম্ম তাহার আর একটা দিক্ সীমাহীনতা, কারণ অবিরাম গতি সীমাহীন আকাশেই আপনার সার্থকতা পাইতে পারে। আকাশের এই নিঃসীমতাকে প্রকাশ করে যে সূর্য্যালোক, তাহাও এই কারণে শেলি ও রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। শেলি তাঁহার স্কাইলার্কের মত ইটালির রৌদ্রদীপ্ত নীলাম্বরের তলে বসিয়া থাকিতে যে কত ভালবাসিতেন, তাঁহার জীবনী-পাঠকেরা নিশ্চয় তাহা জানেন, আর রবীন্দ্রনাথের নিকটে আলোক কত ও কেন যে প্রিয়, তাহা কবির নিজমুখেই শোনা যাক।

"বিশেষত এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জ্জনতা, পাখীদের—বিশেষত কাকের ডাক এবং সুন্দর সুদীর্ঘ অবসর—সবসুদ্ধ আমাকে উদাস করে দেয়। কেন জানিনে মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য-উপন্যাস তৈরী হয়েছে—"
[ছিন্নপত্র—২৯০-৯১, ১৩৩৫]

দেখা যাইতেছে দুপুরের রৌদ্র একটা স্বপ্নরাজ্যের দিকে কবির মনকে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। আবার—

"আমি আলো ও বাতাস এত ভালবাসি! গ্যেটে মরবার সময় বলেছিলেন—More light—আমার যদি সে সময়ে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি More light and more space! অনেকে বাংলা দেশকে সমতলভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে—কিন্তু সেইজন্যেই এদেশের মাঠের দৃশ্য নদীতীরের দৃশ্য আমার এত বেশি ভালো লাগে।"—[ছিন্নপত্র—২৯৭]

এই আলোকবিকশিত বাংলাদেশের সমতলভূমি কেন ভালো লাগে—না, তাহাতে তাঁহার চিত্তের গতিশীলতা কোনো বাধা পায় না। নিম্নের অংশে কবি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এই আলোকে তিনি অসীমতাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পান।

"আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি! আকাশ আমার সাকি * * * যেখানে আমার এই সোনার মদ সবচেয়ে সোনালি ও স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার সঙ্গে বরাবর ঐ সুনীল নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় অসীমতায় এই রকম প্রত্যক্ষ অব্যবহিত যোগ থাকবে।"—[ছিন্নপত্র, ১৩৩৫]

নীচের অংশ পড়িলে ইটালির রৌদ্রভাস্বর নভস্তলশায়ী শেলির ছবিটি মনে জাগে—

"আমি চিরদিন আলো ভালবাসি। গাজিপুরে পশ্চিমের গরমেও, আমি দুপুরবেলায়, আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিনি।" [ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৪৩-৪৪]

আবার—

"নদী আমি ভারি ভালোবাসি ; আর ভালোবাসি আকাশ।"—[ভানুসিংহ, ১৩০]

বাংলাদেশের আকাশ ও নদী দুই-ই অসীমের লীলাক্ষেত্র। বাহিরে যেমন আকাশ অন্তরে তেমনি অবকাশ। স্বভাবত দুই-ই অসীম, কিন্তু বস্তু-ও চিন্তাভারে পুর্ণ হইলে, ইহাদের কোথাও অসীমতার চিহ্ন থাকে না। কবির কিন্তু সীমাহীন আকাশ ও নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ বড় প্রিয়।

"আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায় ; সেই জন্যই আমি ছুটির দরবার করি—কেননা, ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ।"—[ভানুসিংহ, ১০১]

অবকাশ আর কিছু নয়—তাহা অন্তরের আকাশ।

"কিন্তু অবকাশ হচ্ছে বিরাটের সিংহাসন। অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ যেখানে আছে, আকাশ সেখানে ফাঁকা নয়, একেবারে পরিপূর্ণ।"—[জাপানযাত্রী, ৫৮]

তাহা হইলে দেখা গেল, কবিযুগ্মের কবিধর্ম্ম চলতা বা গতি এবং তাহার বিহারের ক্ষেত্র বাহিরে আকাশ ও অন্তরে অবকাশ। ইহার আর কোনো লক্ষণ আছে কিনা দেখা যাক।

এই যে অবিরাম গতি, স্বভাবত ইহার ধৈর্য্য কম, ইহা একান্ত অসহিষ্ণু, এবং ইহার সার্থকতা একমাত্র গতিতেই। কেবল চলিয়া যাওয়াই ইহার লক্ষ্য হইয়া দাড়ায়, তখন এ যেন কোনোমতে পথটাকে বাদ দিয়া লক্ষ্যে পৌছিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু কেবল চলিয়া যাওয়াই যাহার লক্ষ্য সে আবার পৌছিবে কোথায়? অবশেষে নিজের নিকট হইতে সে নিজে পালাইতে চেষ্টা করে। সত্য স্বতঃপ্রকাশ নহে, সে তথ্যের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। অখণ্ড বিশ্ব ক্ষুদ্র খণ্ডতার ভিতর দিয়াই ধরা দেয়। (কিন্তু এই অসহিষ্ণু, অধীর, গতিমাত্র-লক্ষ্য চলতাধর্ম্ম, ইহা যেন বুঝিতে পারে না; সে পথকে বাদ দিয়া লক্ষ্যকে, তথ্যকে বাদ দিয়া সত্যকে, খণ্ডতাকে বাদ দিয়া সমগ্রকে ধরিতে চেষ্টা করে।) শেলির কাব্যে যদি কোন ফিলজফি থাকে, তবে তাহা এই নিষ্ফলতার তত্ত্ব। তিনি জীবনে, জগতে, রাষ্ট্রে, সমাজে কোনো রূঢ় বাধা সহ্য করিতে পারিতেন না। মানব-সমাজের যে সত্যযুগ তিনি কল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে সমাজ নাই, রাষ্ট্র-শাসন নাই, কোনো আইন-কানুন, রূঢ় বাস্তবের কোন বাধা নাই, কেবল আছে মানব আর প্রেম। ইহা এমনি একটা নিগুণ সত্য যে তাহা কোন দিন আসিবে, ইহার প্রতিবাদ করাও আমরা প্রয়োজন মনে করি না। তিনি প্রেমিককে হয়ত ভালবাসেন, কিন্তু প্রেমকে ভালবাসেন আরো বেশি। নিছক প্রেম, বিশিষ্ট মানব-সংস্পর্শ ব্যতীত প্রেম, আর কোথায় আছে! যদিও বা থাকে, তাহা একটা তত্ত্ব মাত্র, তাহার সহিত আমাদের হৃদয়ের যোগ সম্ভব নহে। তাঁহার স্কাইলার্ক একটা অশরীরী আনন্দ মাত্র, পৃথিবীর সমস্ত শিশিরকণা ও সংস্রব পাখা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তবে যেন সে আকাশে যাত্রা করিয়াছে। কবি কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার যে একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।

কবিধর্ম্মের এই অসহিষ্ণুতা, ত্বরা, রবীন্দ্রনাথেও আছে। তবে বলিয়া রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ব-হিসাবে এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন যে তথ্য ও সত্য, খণ্ড ও বিশ্ব

উভয়ের মিলনেই যথার্থ পূর্ণতা কিন্তু শিল্পী-হিসাবে কতটা পরিমাণে ইহা তাঁহার কাব্যে যথার্থতা লাভ করিয়াছে, তাহা বিবেচ্য। শেলির কাব্যে যে ত্বরার কথা বলিলাম, তাহার দু'একটা উদাহরণ রবীন্দ্রনাথে দেখা যাক। জীবন-স্মৃতিতে কবি যেখানে প্রভাত সঙ্গীতের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছেন, সেখানে একটি বিরক্তিকর ব্যক্তির উল্লেখ আছে। অন্য দিন সে লোকটা আসিলে কবি বিরক্তি বোধ করিতেন। কিন্তু নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অভিনব অভিজ্ঞতার পরে

"মধ্যাহ্নকালে লোকটি যখন আসিল তখন আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইয়া তাহাকে বলিলাম, এস, এস। সে যে নির্ব্বোধ এবং অদ্ভুত রকমের ব্যক্তি, তাহার সেই বহিরাবরণটি খুলিয়া গেছে। আমি যাহাকে দেখিয়া খুসী হইলাম, এবং অভ্যর্থনা করিলাম, সে ভিতরকার লোক—আমার সঙ্গে তাহার অনৈক্য নাই—আত্মীয়তা আছে।"—[জীবনস্মৃতি, ২২৮]

এখানে কবি অকস্মাৎ সেই বহিরাবরণহীন ভিতরকার সত্যকে দেখিতে পাইলেন! কিন্তু এমন করিয়া কি সত্য প্রকাশিত হয়? সে বহিঃকে অবলম্বন করিয়াই দেখা দেয়, নতুবা তাহার অস্তিত্ব নাই। কবি যাহাকে আবরণ মনে করিতেছেন, তাহা আবরণ নহে, অন্তঃকে প্রকাশ করিবার বিচিত্র প্রণালী মাত্র। অন্তঃ এই বহিঃর অবলম্বন ব্যতীত প্রকাশ পায় না। যদি ইহা সত্য হয়, তবে দুইটাই সত্য। বহিঃটাকে অস্বীকার করিবার কারণ কি? কীট্‌স, কালিদাস, শেক্‌স্‌পীয়র হইলে, তাঁহারা এই বহিঃটাতেও কম আনন্দিত হইতেন না, এইখানেই তো বিশ্বের বিচিত্রতা! জীবন-স্মৃতিতে কবি প্রতিধ্বনি নামে কবিতাটির ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—

"কোনো বস্তুকে নয়, কিন্তু সেই প্রতিধ্বনিকেই বুঝি আমরা ভালোবাসি, কেননা দেখা গেছে একদিন যাহার দিকে তাকাই নাই, আর একদিন সেই একই বস্তু আমাদের সমস্ত মন ভুলাইয়াছে।"—[জীবনস্মৃতি, ২৩৩]

কোনো বস্তুকে নয় কেন? বস্তু ও ভিতরকার সত্য দুইটিতো স্বতন্ত্র নয়। ধ্বনিই প্রতিধ্বনি, বস্তুই সত্য! ইহার সহিত শেলির Adonais-এর সেই বিখ্যাত শ্লোকটি তুলনীয়। জীবন যেন চিত্রবর্ণ স্ফটিকের একটি দেউল; স্ফটিকে রঞ্জিত শাশ্বত সূর্য্যালোক বহুবর্ণ হইয়া দেখা দিতেছে। কবি এই জীবন-দেউলকে বিদীর্ণ করিয়া বাহিরের অখণ্ড নির্ম্মল ভাস্বরতাকে পাইতে চাহেন। কেন? আলোকের এই সপ্তবর্ণ, ইহাদের মিলনেই তো সূর্য্যের সেই শুভ্রতা। জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে যাহা বহু, জীবনের পরিবেশের বাহিরে তাহা এক! তবে ব্যস্ততা কেন? ব্যস্ততা কবির

নয়, কবির অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের। কবি হয়তো ইহা বুঝেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরতর মানুষটি বুঝিতে চায় না। সেইজন্য কবি-ব্যক্তিটি ইহা বুঝিয়া যখন প্রকাশ করেন, তখন তত্ত্ব মাত্র হয়, কিন্তু কবি-ধর্ম্ম সে তত্ত্বকে অবলীলাক্রমে ডিঙাইয়া ঠিক তাহার বিপরীত এক কাব্য লিখিয়া বসে।

তত্ত্ব-হিসাবে ইহা রবীন্দ্রনাথের অনেক স্থানে আছে, কাব্যে ও প্রবন্ধে।

"যেলোক অনন্তকে বাদ দিয়ে খণ্ডের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরো বেশি অন্ধকারে ডোবে।

*　　*　　*　　*　　*　　*

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র ক'রে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।"—[সঞ্চয়—আমার জগৎ, ১২৯ পৃঃ]

ইহাতো তত্ত্বের কথা, আমার বক্তব্য, এই তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম্ম কখনো সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লয় নাই—তবে এই পরিণাম বা জীবনসঙ্গতির দিকে কবির কাব্যপ্রবাহ চলিয়াছে।

শেলি ও রবীন্দ্রনাথ যে বড় নাট্যকার হইতে পারেন নাই, তাহার কারণ ইহাই। ইঁহারা কেহই যথেষ্ট পরিমাণে বহিরাবরণকে, অন্তঃ যে প্রণালীর দ্বারা বহিঃ-রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে স্বীকার করেন নাই। লিরিক কবিতা অল্পাধিক পরিমাণে বস্তুর নির্য্যাস, কিন্তু নাটকে বস্তুকেই আমাদের চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়। সেইজন্য নাট্য, কি কাহিনী-কাব্য, কি বর্ণনা-কাব্য, কোনোটাতেই ইঁহাদের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব নয়। যেখানেই তাঁহারা এই জাতীয় কাব্য বা নাট্য লিখিয়াছেন, কবির ধর্ম্ম কবির অজ্ঞাতসারে সেখানে লিরিকের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে। The Cenci ব্যতিক্রম।

শেলির অন্তরস্থ কবি-ধর্ম্মের মত তাঁহার প্রকাশভঙ্গিও লক্ষণীয়। একটা আর একটার বাহন। শেলির শিল্পধর্ম্মের সহিত কীট্‌সের শিল্পধর্ম্মের তুলনা করিলে প্রভেদটা ধরা পড়িবে। কীট্‌সের লক্ষ্য ছিল শব্দবিন্যাস, শব্দসমন্বয়ের প্রতি; ইহা অনেকটা পরিমাণে যেন স্পর্শযোগ্য, ইহাকে ধরা-ছোঁয়া যায়। কিন্তু শেলির লক্ষ্য ছন্দঃ-স্পন্দ বা সঙ্গীতের প্রতি, ইহা অপেক্ষাকৃত অবাস্তব। কীট্‌সের লক্ষ্য কবিতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবের প্রতি, শেলির একেবারে অখণ্ড কবিতাটির সঙ্গীতে। শেলির লক্ষ্য সঙ্গীত, সে যেন দেহাতীত প্রাণ; শব্দগুলা উপলক্ষ্য, তাহারা যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তোলে, তাহাতেই যেন শেলির আত্মরতি। এইরূপ প্রকাশভঙ্গি শেলির কবি-ধর্ম্মের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব দেখা যাইতেছে, শেলির কবি-ধর্ম্ম ও শিল্পধর্ম্মের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে

সামঞ্জস্য এত সরল নয়, তাঁহার কাব্য জটিলতর, সেইজন্য তাহার পরিণামও সুদূর-প্রসারী।

ম্যাথু আর্নল্ড যে শেলির কবিতাকে অবাস্তব বলিয়াছেন, তাহার কারণ খানিকটা পরিমাণে উপরের আলোচনায় আছে। মাটিও বস্তু, বায়ুও বস্তু, কিন্তু যে ভাবে আমরা মাটিকে বাস্তব বলি বাতাসকে সে ভাবে বলি না। কেন না, কোনো পদার্থকে বাস্তব বা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাতে খানিকটা পরিমাণে ভার থাকা আবশ্যক। মাটিতে সেই ভারটি আছে, বাতাসে কম, ঈথরে একেবারেই নাই! শেলির কাব্যে সেই ভারটি যথেষ্ট পরিমাণে নাই। ইহার একটা কারণ হয়তো—কবি জীবনের আবেষ্টন হইতে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আসল কারণ, কবির বিশিষ্ট ধর্ম্ম, যাহার আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। শেলি যদি গভীরভাবে দেশ ও সমাজে সংশ্লিষ্ট হইতেন, তবুও তাঁহার কাব্য খানিকটা পরিমাণে অবাস্তব থাকিয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকেও যে অনেকে 'বস্তুতন্ত্রহীন' মনে করে, তাহার কারণও কি এই জাতীয় নহে? ইহা তাঁহার দেশের সহিত যোগের অভাবে তেমন নহে, যেমন অন্তর্নিহিত কবিধর্ম্ম ও শিল্পিধর্ম্মের স্বভাবের জন্য!

এতক্ষণ আমরা শেলি ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যে যে ঐক্য দেখাইলাম, তাহার মূলে যে জ্ঞাতসারে একের প্রতি অন্যের প্রভাব, সম্পূর্ণভাবে এমন কথা বলা চলে না। উভয়ের মানসিক গড়ন একজাতীয় হওয়াতে উভয়ের নিকট জীবন ও জগৎ একই ভাবে ধরা দিয়াছে—ইহাই সত্যতর। এই ঐক্যের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য বুঝিবার হয়তো সুবিধা হইতে পারে। কালিদাস ও কীট্‌স্ উভয়েই রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। ইঁহাদের শিল্পধর্ম্ম রবীন্দ্রনাথ হইতে ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতরীতির কবি, ইঁহারা চিত্ররীতির। মানসীতে আসিয়া কালিদাসের প্রভাব চোখে পড়ে। তাহা কি? ইহা যে কেবল নিখুঁৎভাবে ছবি আঁকিবার শক্তি তাহা নহে। ছবি রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বেও আঁকিয়াছেন, পরেও। সেই ছবি আঁকিবার পদ্ধতির বিভিন্নতাই লক্ষণীয়। সঙ্গীতরীতিতে যে ছবি আঁকা হয়, তাহা যেন বস্তুর নির্য্যাস, বস্তুকে যতটা সম্ভব ছাঁকিয়া লইয়া একটিমাত্র রেখায় তাহার অপরিহার্য্য বিশেষত্বটি চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া। আর চিত্ররীতির ছবিতে, বস্তুটির প্রত্যেক খুঁটিনাটি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নিখুঁৎভাবে তুলির টানের পরে টানে ধীরভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলা। এই রীতিটা রবীন্দ্রনাথ মানসীপর্ব্বে আসিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস ইহা কালিদাসের কাব্যের প্রভাব, কীট্‌সের কাব্যও ইহার জন্য কম দায়ী নহে। মানসীর মেঘদূত ও অহল্যার প্রতি এই রীতির দুইটি দৃষ্টান্ত। এই রীতির লক্ষণ সোনার তরী ও চিত্রায় আছে, ইহার চরম বিকাশ কল্পনা কাব্যে। অবশ্য ইহা সঙ্গীতরীতির মত

গুরুত্ব লাভ করিতে পারে নাই ; একটি কবির পক্ষে স্বাভাবিক, আর একটি চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য হইতে পাইয়াছেন, ভাষার সংহতিশক্তি। একটিমাত্র শ্লোকের মধ্যে কাব্যের বিষয়ের দেহ ও আত্মাকে দৃঢ়-পিনদ্ধভাবে বাঁধিয়া দেওয়ার যে শক্তি, তাহা কালিদাস ও কীট্‌সের বিশেষত্ব। এই বৈশিষ্ট্য এই সময়টাতে কবি লাভ করিয়াছেন। এতদিন ছিল কাব্যের গতি, এবারে আসিল সংযম ; পরবর্ত্তী কাব্যে এই দুইটির ঘাত-প্রতিঘাতের লীলা ও বিকাশ, বলাকায় যাহার সমন্বয়; একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই ঐক্য সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনৈক্যটাই প্রধান। সে অনৈক্য উভয়ের মানসিক গঠনে।

দুই জাতীয় কবি-মন আছে। জগৎ আসিয়া যখন দেহে আঘাত করে, তখন তাহার কতকগুলি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া ছাঁকিয়া গিয়া অন্তরে উপস্থিত হয়, এটা প্রথম স্তর। সেখানেও তাহাদের স্থিতি নাই। তাহারা পুনরায় সেই স্তর হইতে নির্য্যাসিত হইয়া দ্বিতীয় কোঠায় উপস্থিত হয়। এটা দ্বিতীয় স্তর। তখন তাহারা কতকগুলি আইডীয়া মাত্র। প্রথমটাকে বলিতে পারি ইন্দ্রিয়স্তর, দ্বিতীয়টা মনস্তর বা আইডীয়াস্তর। বলা বাহুল্য, এ দুটার মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নাই এমন নহে। একদল কবি আছেন, যাঁহাদের এই ইন্দ্রিয়স্তর প্রধান ; জগৎকে তাঁহারা ঐ কোঠায় রূপ-, রস-, গন্ধ-, স্পর্শ-, শব্দরূপে পাইয়া কাব্যে পরিণত করিয়া ফিরাইয়া দেন। আর একদল কবির নিকটে আইডীয়াস্তর বড় ; তাঁহারা জগৎটাকে আইডীয়া-হিসাবে পাইয়া তদ্দ্বারা একটা অনুরূপ জগৎ গড়িতে চেষ্টা করেন। ইঁহাদের আমরা তাত্ত্বিক কবি বলিতে পারি। কালিদাস ও কীট্‌স প্রথম দলের কবি। শেলি ও রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় দলের। শেষোক্ত দুইজনের মনের গড়ন এই রকম যে জগতের রূপটা প্রথম স্তরে বেশিক্ষণ থাকিতে পারে না ; সেই স্তরে আসিয়াই নির্য্যাসিত হইয়া দ্বিতীয় কোঠায় গিয়া পৌঁছায়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, ব্যক্তিগত কবিতা স্থানীয় আবহাওয়া সাময়িক চিহ্ন বিশেষ কিছুই নাই। প্রথম স্তর হইতে দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছিতে একটু সময় লাগে ; এই সময়টুকু অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে পারেন না ; লিখিলেও তাহা উচ্চশ্রেণীর কাব্য হয় না। এ সম্বন্ধে কবিও সচেতন।

"আমি টু'কে যেতে টেঁকে যেতে পারিনে। কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েছি, কিন্তু সে সমস্ত টুক্‌রো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গ'লে ছড়িয়ে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ

হ'য়ে গিয়ে তারপরে প্রকাশের রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখনই তার সঙ্গে আমার ব্যবহার।”—[জাপানযাত্রী—২২ পৃঃ, ১৩৩৪]

দ্বিতীয় স্তরের কবিরা বস্তুর বহিরাবরণকে ভেদ করিয়া একেবারে ভিতরের সত্যকে দেখিতে চেষ্টা করেন, প্রথম দলের কবিরা কখনই সে চেষ্টা করেন না। তাঁহাদের নিকট বহিরাবরণ তুচ্ছ নয়, কারণ অন্তঃ ঐ সব ক্ষুদ্র খণ্ড অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রকাশ করে। বস্তুত অন্তঃ ও বহিঃ বিভিন্ন নয়। তথ্যের মধ্যে, বস্তুর অংশ বিশেষের মধ্যে একটি সূক্ষ্মতা আছে, এই সূক্ষ্মতাকে সহ্য করিবার শক্তি শেলি, রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কবিদের নাই। এখানে একটি ঘটনায় তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

“আরো একটু বড়ো বয়সে কুমার-সম্ভবের—

'মন্দাকিনীনির্ঝর-শীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃকম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ॥'

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই কেবল—'মন্দাকিনী নির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিত দেবদারুঃ' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যখন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তখন মন খারাপ হইয়া গেল। মৃগ অন্বেষণে তৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছ আছে, বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়োই পীড়া দিয়াছিল। যখন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তখন বেশ ছিলাম।”—[জীবনস্মৃতি, ৭৯, ১৩৩৫]

এই সূক্ষ্মতায় কবিকে পীড়া দিয়াছিল। কেন? কারণ, এই সূক্ষ্মতাকে সহিষ্ণুভাবে বহন করিয়া, খণ্ডতাকে জোড়া দিয়া সমগ্রতায় পৌঁছিবার ধৈর্য্য তাঁহার নাই। তবে আনন্দ কিসের? এই শ্লোকটির সমগ্রতার মধ্যে যে অখণ্ড সঙ্গীত আছে, যাহার মধ্যে কোনো সূক্ষ্মতা, খণ্ডতা ধরা পড়ে না, সেই সঙ্গীতটিতেই তাঁহার আত্মরতি। অর্থাৎ বিশিষ্ট নির্ব্বিশেষের মধ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলে আনন্দসঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া ওঠে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম্ম আত্মীয়তা অনুভব করে। এই বিশিষ্ট ও নির্ব্বিশেষের দ্বন্দ্ব কালিদাস কি ভাবে সমাধান করিয়াছেন দেখা যাক।

কালিদাসের মেঘদূত; মেঘদূতের মেঘ; সেই মেঘের কথা। মেঘ দ্যুলোকের; পৃথিবীর সহিত তাহার সংস্রব অল্পই। অপার্থিব সেই মেঘকে কালিদাস পৃথিবীর একটি ব্যক্তি-বিশেষের সুখদুঃখের সহিত জড়িত করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে,

যাহার কোনো মূল নাই, পরিচয় নাই, তাহাকে একটা পৌর্ব্বাপর্য্যতা, একটা বংশ-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যাহা স্বভাবত airy nothing, তাহাকে human name and habitation দেওয়া হইল। ইহাই হইল নির্ব্বিশেষকে বিশেষ করিয়া তোলা। আবার দেখি শেলির মেঘ; পৃথিবীর সহিত তাহার কোনো যোগ নাই, নিজের রাজ্যে নিজের নিয়মে, নিজের খুসিতে সে সন্তুষ্ট। নির্ব্বিশেষ-বিশিষ্ট হইল না। তাঁহার স্কাইলার্ক এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অশরীরী আনন্দ হইয়া গেল। যাহা ছিল বিশিষ্ট, তাহা হইয়া উঠিল নির্ব্বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের মেঘ ইহার মাঝামাঝি। তাহাতে তিনি নিজের মনের ভাবনার প্রতীক দেখেন; কালিদাস তাহাতে মানুষের সুখদুঃখের দূতকে দেখিয়াছেন; শেলি তাহাতে নিজের অস্তিত্ব ব্যতীত কিছুই দেখিতে পান নাই। শেলি এক প্রান্তে, কালিদাস অন্য প্রান্তে, মাঝে রবীন্দ্রনাথ; অর্থাৎ তিনি শেলির নিছক নৈর্ব্বিশিষ্ট্য হইতে যাত্রা সুরু করিয়া খানিকটা অগ্রসর হইয়াছেন, পূর্ণভাবে মানুষের দরবারে পৌঁছিতে পারেন নাই। আপনার অস্তিত্ব ও মানুষের সংসারের সীমান্তপ্রদেশের কবি তিনি।

উভয়ের কবিধর্ম্মের এই প্রভেদ শিল্পধর্ম্মেও প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের পটভূমিতে নদী; আর দেবতাত্মা নগাধিরাজ কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের পটভূমি অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন নদী ভালবাসেন, কালিদাস তেমনি পর্ব্বত। শুধু তাহাই নহে, রবীন্দ্রনাথ কেমন যেন পর্ব্বতকে সহ্য করিতে পারেন না।

"পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি, সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে' দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে বাধা। আমরা মর্ত্ত্যবাসী মানুষ—সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই,—সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে চায়, তা হ'লে সেটা আমি সইতে পারি নে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত, সেই জন্যে বাংলা দেশের দিলদরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমায় গানের গলা সেধে এসেছি, এই কারণেই দূর হ'তে তোমাদের সোলন পর্ব্বতকে নমস্কার।"—[ভানুসিংহের পত্রাবলী, ৯৫-৯৬, ১৩৩৬]

কবি সীমাহীন আকাশে মুক্তির রূপ দেখিতে পান, পর্ব্বত সেই রূপকে বাধাগ্রস্ত করে। নদী চঞ্চল, তার ধ্বনি আছে; তাই সে গানের প্রতীক। পর্ব্বত নিস্তব্ধ,

তাহার রূপ সতত প্রত্যক্ষ ; সে চিত্রের প্রতীক। বর্ত্তমান ও অতীতের মহাকবিদ্বয় তাঁহাদের বিভিন্ন শিল্পধর্ম্মকে নদী ও পর্ব্বতে যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে পর্ব্বত সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন, যেমন হিমালয় সম্বন্ধে ছয়টি সনেটে, সেখানে তাঁহাদের পটভূমিতে ভারতবর্ষ। হিমালয় ও ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার উপায় নাই। নিশ্চল হিমালয় যোগমগ্ন কালগতির প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন ভারতবর্ষের প্রতীক ; আর চঞ্চল নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল পদ্মা বাংলা দেশের। দুইটি দুই বিভিন্ন সভ্যতাকে প্রকাশ করিতেছে। কালিদাস একটি পুরাতন সভ্যতার কবি, বড় জোর সে সভ্যতাকে চিরন্তন বলিতে পারি ; সেই জন্য কালিদাসের কাব্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই ; হিমালয়ের মত, কালিদাসের আরাধ্য মহাদেবের মত, তাঁহার কাব্য দ্বন্দ্ব-সংঘাত-রহিত ; তাহা শান্ত। রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন সভ্যতার কবি, চঞ্চলতা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্যের প্রতি ব্যাকুলতা তাঁহার কাব্যের প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য অত্যন্ত জটিল। আবার এই বাংলার সভ্যতার নূতন ধারার সহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন ধারার সংঘাত ঘটিয়া তাঁহার কাব্যকে জটিলতর তরিয়া তুলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাসে প্রভেদ কত, অথচ একস্থানে উভয়ের মধ্যে গভীর ঐক্য আছে। সে তাঁহাদের কাব্যের উপজীব্যে। উভয়কেই প্রাচীন ভারতের বৃহৎ জীবনযাত্রা, তাহার তপোবনের আদর্শ, তাহার নরনারীর প্রেমের মাতৃত্ব-অবসান সম্বন্ধ, এবং তাহার রাজসন্ন্যাসীর চরিত্র অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কবির সাহিত্যের কাব্যের মূল-উপজীব্যে, এত ঐক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের অন্তর্নিহিত কাব্যধর্ম্ম বিভিন্ন হওয়াতে, তাঁহাদের কবিতা কত পৃথক্। শেলির সহিত যেমন ঐক্য, কালিদাস-কীট্‌সের সহিত তেমনি অনৈক্যের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে চেষ্টা করা ব্যতীত, এখানে এ আলোচনার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। জীবনকে যেমন নানা দিক্ হইতে দেখিতে হয়, জীবনের রহস্য যে কাব্যে আছে, তাহাকেও তেমনি বহুশ দেখার চেষ্টা করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য দ্বিধা

তথ্য ও সত্য

রবীন্দ্রনাথের কাব্য অনেকের কাছে দুরূহ ; কারণ, এ কাব্য অত্যন্ত জটিল উপাদানে রচিত। আর একজন ভারতীয় কবি, যাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে, কালিদাস, তাঁহার কাব্য এমন জটিল উপাদানের নয়। এই জটিলতার কারণ রবীন্দ্রনাথ দুইটি অল্পবিস্তর ভিন্ন সভ্যতার কবি। কালিদাসের প্রতিভায় এরূপ ভিন্ন সভ্যতার মিলন ঘটে নাই, কাজেই কালিদাসের কাব্যে দ্বিধার অভাব। রবীন্দ্রনাথের

কাব্যে একটি দ্বৈধী ভাব, একটি সংঘাত আছে। ইহা যদি স্বীকার করি, তবে পরোক্ষভাবে আরো কয়েকটি বিষয় সন্দেহের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে। কবি সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণা, জানি না কেমন করিয়া আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার কাব্যের একদেশ-দর্শন। সেই একদেশ গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য এই ত্রয়ী। নোবেল পুরস্কার গীতাঞ্জলির নামে প্রদত্ত হওয়াতে এই কাব্যখানি আমাদের চিত্তে স্বভাবতই একটা অত্যুচ্চ অস্বাভাবিক আসন লাভ করিয়াছে। এই কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা তিনটি সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছি—

(১) তাঁহার প্রতিভার চরম বিকাশ ভগবৎ-প্রেমে এবং ইহাতেই তাঁহার কাব্যের সমস্ত ধারা মিলিত হইয়াছে।

(২) তিনি আনন্দের কবি, উপনিষদের ঋষিগণের আধ্যাত্মিক বংশধর।

(৩) তাঁহার কাব্য শান্ত রসের কাব্য।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রথম সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ ভুল। এখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

গীতাঞ্জলি ত্রয়ী হইতে যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকে ঐ কাব্যগুলি আবার পড়িতে বলি, তাহাতে এমন অনেক কবিতা আছে, যাহা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। কিন্তু এ ভার আমরা কাব্যের উপর না দিয়া স্বয়ং কবিকে দিব। এই যে দ্বিধার কথা বলিলাম, দেখা যাক এ বিষয়ে কবির কি ধারণা।

"মানসী সম্বন্ধে লিখেছ, যে তার মধ্যে একটা Despair ও Resignation এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। * * কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূলমন্ত্র তখন হঠাৎ এ কথায় মনে হয়েছিল হ'তেও পারে। * *. এখন একত্র করায় মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দন্দ্ব চলছে; একটা আমাকে সর্ব্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে; আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করছে—সেই জন্য একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এই জন্য সবশুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।"

—[২৯শে জানুয়ারী, ১৮৯৮, রবীন্দ্রনাথ, সবুজ পত্র, ১৩২৫, দ্বিতীয় সংখ্যা]

আর একখানা চিঠি—

"আমি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ দুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক-জাতীয়, উদাসীন, গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিক জাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে শেলির Skylark আর একটা ওয়ার্ডস্বার্থের Skylark; একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করছে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে সে অভাব দুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্য্য-ব্যাকুল, পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ, যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে।

* * * *

কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাকলে ভাল হয়; কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক, দুর্লভ বলা যায় না, ভাল কবি মাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে—নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Ideal এর মিলনেই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force Ideal এর দিকে Realকে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের Centripetal force Realএর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে বাষ্প হয়ে যায় না—এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হ'য়ে কঠিন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। * *"

[সবুজপত্র, ১৩২৪, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৩৭-৩৯ পৃঃ, রবীন্দ্রনাথ]

বৈষ্ণব কবিগণের কবিতার উপাদান বর্ত্তমান কবির কাব্যের উপাদানের মত এমন জটিল নয়। তাঁরা কেবলমাত্র বাংলার সভ্যতার ধারাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। কালিদাসের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ বড় কি না সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কালিদাসের একটা সুবিধা ছিল, তিনি একটি মাত্র সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। কালিদাস ভারতবর্ষের ভাবধারার কবি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বাংলা ও ভারতবর্ষের যুগল ভাবধারা মিলিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান কবির কাব্য অধিকতর ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তেমনি আবার দুই সভ্যতার সংঘাতে কাব্যের চরম পরিণতিতে দ্বিধারও সঞ্চার করিয়াছে। উপরের পত্র দুইখানিতে—এই দ্বিধার বিষয়েই কবি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

প্রথম পত্রখানিতে কবি নিজের প্রকৃতিতে ভারতবর্ষের শান্তিকে য়ুরোপের

চাঞ্চল্য দ্বারা আন্দোলিত হইতে দেখিয়াছেন। এই চাঞ্চল্য য়ুরোপের পক্ষে সত্য হইলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহা কতটা পরিমাণে য়ুরোপীয় তাহা প্রশ্নাত্মক বটে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই চাঞ্চল্যকে আমরা বাংলার স্বাভাবিক গতিমন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এই চঞ্চলতা বাংলার প্রাণপ্রতীক পদ্মার মধ্যে নিয়ত লীলায়িত, এবং কি ভাবে পদ্মার এই দুরন্ত নিঃশ্বাস কবির কাব্যে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার কোলে বাংলার অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন সভ্যতা ধ্যানমগ্ন মহেশ্বরের কোলে যৌবনচঞ্চল গৌরীর মত শোভমানা। শাক্ত বঙ্গভারতী শৈব ভারতবর্ষের বুকের উপরে স্বাভাবিক চঞ্চলতায় নৃত্যমানা। কালিদাস এই সনাতন সভ্যতার কবি, তাঁহার অধিদেবতা তপঃক্লান্ত মহেশ্বর; তাঁহার কাব্যপীঠ ধ্যানমৌন হিমালয়; তাঁহার কবি-প্রতিভা 'নিবাতনিষ্কম্প-ইবপ্রদীপঃ' মহেশ্বরের মত লেশমাত্র সন্দেহের আন্দোলন বিহীন। তাঁহার কাব্যে কোথাও সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, অলৌকিক আলোকের দীপ্তিতে সমস্তই ভাস্বর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আসিয়া ভারতবর্ষের স্বাভাবিক এই ভাস্বরতা, এই অলৌকিক দীপ্তি নূতন একটি সভ্যতার দ্বিধায় ম্লান, নূতন যুগের অপরিচয়ের সঙ্কোচে দ্বিধাগ্রস্ত। ভারতবর্ষের শাশ্বত সূর্য্যালোকে বাংলার অপরীক্ষিত মেঘমালা বারংবার দীর্ঘচ্ছায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছে।

এই যুগ্মধারার কথা মনে না রাখিয়া রবীন্দ্রনাথকে পড়িলে ভুল বুঝিবার বিশেষ আশঙ্কা। এক হিসাবে, নূতন যুগের আমরা সকলেই, বাঙালী-ভারতবর্ষীয় আমরা সকলেই এই যুগ্মধারার উত্তরাধিকারী। কিন্তু রবীন্দ্র-বনস্পতির মূল যে গভীরতায় সহজে প্রবেশ করিয়াছে আমাদের তেমন নহে। তিনি এই দুটি সভ্যতার যে নিগূঢ় প্রদেশ হইতে রস গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে অতিশয় সহজে এই দুই সভ্যতাকে প্রকাশ করা সুসাধ্য হইয়াছে।

কেবল স্বাভাবিক প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ এই দুই যুগ্মধারার প্রতীক হইয়া উঠিয়াছেন, একথা বলা বোধ করি প্রতিভার প্রতি অন্ধবিশ্বাস। কবির শিক্ষা এবং পরিবারের আবহাওয়া ভারতবর্ষীয় ধারার সহিত তাঁহাকে বাল্য হইতে পরিচিত করাইবার ভার লইয়াছিল।

বাংলা দেশের সাধারণ ঘরের বালকদের পক্ষে এমন সুযোগ ঘটে না। তাহারা শিক্ষা, পরিবার ও সমাজের আবহাওয়াতে বাংলার সভ্যতাকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ অবকাশ তো হইবেই। কিন্তু যাহা উপরি-পাওনা, তাহা ঐ ভারতবর্ষীয় ধারাটাকে বাল্যকালে অনায়াসে লাভ। কবির পিতৃদেব প্রকৃত-পক্ষে বাংলাদেশে উপনিষদের ধর্ম্মের প্রধান পরিচায়ক। প্রথম বলিতে পারি না,

কারণ রাজা রামমোহন তৎপূর্ব্বে এ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্যই মহর্ষি উদ্‌যাপন করিতেছিলেন। বাংলাদেশ উপনিষদের দ্বারা কতটা লাভবান্ হইয়াছে জানি না, কিন্তু কবির পরিবার ও সমাজ ঔপনিষদ তত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে,—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত বলিতে আমরা এ গ্রন্থে যাহা বুঝিতেছি, তাহা এই উপনিষদের ভারতবর্ষ। প্রাচীন ভারতবর্ষেরও অবশ্য দুটি অংশ। একটা অতি প্রাচীন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা নবীন ভারতবর্ষ; উপনিষৎ সেই নব প্রত্যূষের জাগরণের আনন্দধ্বনি। আর একটা অংশ প্রাচীন, ইহা বেদান্তের ভারতবর্ষ। এই দুই অংশের মধ্যে কালের ব্যবধান অনেক। ভারত-ইতিহাসের একটা যুগান্তর ইতিমধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। উপনিষদের যুগ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এমন একটা কাল, যখন ঋষিগণ জগৎকে স্বীকার করিয়াও দুঃখকে অস্বীকার করিতে পারিতেন। ইহাতে জগৎও সত্য, ব্রহ্মও সত্য, কোথাও অসামঞ্জস্য নাই, কারণ এ দুয়ের মাঝে দ্বিধা সঞ্চার করিয়া দুঃখ নাই। কিন্তু বেদান্ত সেই যুগের দর্শন, যার পূর্ব্বে দেশে অনেক রাজ্য-বিপ্লব, অনেক জাতি-সংঘাত, অনেক উত্থান-পতন ঘটিয়া গিয়াছে। তখনকার তত্ত্বদর্শিগণের পক্ষে দুঃখের অভিজ্ঞতা এতই কঠোর বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল, যাহাতে ওটাকে আর তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের পক্ষে জগৎ মানেই দুঃখ। ব্রহ্ম ও জগৎ স্বতঃবিরোধী,—দুটি কখনই একসঙ্গে সত্য হইতে পারে না, অতএব তাঁহারা অতি সহজে এবং অতি সংক্ষেপে এই দুরূহ সমস্যাগ্রন্থি ছেদন করিলেন; কেবল ব্রহ্ম আছে, বাকি যাহা কিছু সব মায়া। সেই হইতে ইহাই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ধ্রুবনক্ষত্র হইয়া আছে; কারণ এ হতভাগ্য দেশের পক্ষে দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অত্যাচারের অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বের এই বিস্মৃত-প্রায় যুগের অতি-বিস্মৃত ঔপনিষদ তত্ত্বটাকে বাংলা দেশ গ্রহণ করিতে পারে নাই; কবির পরিবার খানিকটা গ্রহণ করিয়াছেন। কবির আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অধিকাংশই উপনিষদের মন্ত্র, এবং সেই মন্ত্রে সঞ্জীবিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন হইতে গৃহীত। প্রাচীন ভারতের বিরাট্ জীবনযাত্রার অন্য অংশের আভাস কবি কালিদাস ও অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণ হইতে এবং ইতিহাসের ঘটনাবলী হইতে পাইয়াছেন, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এখন, কবির জীবনে দুই সভ্যতার যুগ্মধারার এই আধ্যাত্মিক দ্বিধা যে ছিল আমরা পরোক্ষভাবে তাহা কবির কাব্য হইতে বুঝিতে পারি; কারণ কাব্য কবির অজ্ঞাতসারে রচিত জীবন-কথা। উপাদানের এই দ্বিধা নানা স্বতোবিরুদ্ধতায় কবির কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রথমে দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথ আনন্দরসের কবি কি না; ব্যবসায়ী সমালোচকদের

মতে যাহাকে বলে আনন্দবাদী। তাঁহার কাব্যে দুঃখ ও আনন্দ দুইটি সুরই আছে, ইহা বাংলা ও ভারতীয় সভ্যতার মিশ্রণ বই আর কিছু নয়।

বাংলার সাহিত্যের মূল রাগিণী বিষাদের। সত্যকথা বলিতে কি, আমার তো মনে হয়, কাব্যের, বিশেষ গীতি-কাব্যের প্রধান উৎস বিষাদে যেমন এমন আর কিছুতে নয়। শ্লোকের সহিত শোকের সম্বন্ধ আদি কবির কাল হইতে এবং তাহারো পূর্ব্ব হইতে একেবারে অনাদি কাল হইতে। যাহা হউক, বাংলার গীতিকাব্য শোকের উৎস হইতে যেমন উৎসারিত হইয়াছে, এমন আর কোনো রস হইতে নহে। বৈষ্ণব কবিদের কাব্য, সত্য বলিতে কি, বিরহ-রসের কাব্য। সে কাব্যে মিলনের স্থান আছে বটে, কিন্তু সে স্থলে যেন কবিদের হাত ভাল করিয়া খোলে নাই। বাংলার প্রকৃতির মধ্যে যে বিশাল বৈরাগ্য আছে তাহা বিশেষ করিয়া বাংলার সমতল মাঠ, উদার নদী ও অপার আকাশে ধরা দিয়াছে। এই অপার সীমাহীনতা মানুষের চিত্তকে উদাস করিয়া দেয়। বাংলার কাব্য উদাসী কাব্য। এই উদাসীনতা বৈষ্ণব-কাব্যে, কীর্ত্তনের সুরে, বাউলের গানে সর্ব্বত্র; রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও ইহা ভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আর একদিকে উপনিষদের আনন্দের তত্ত্ব।

সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে মানসী পর্য্যন্ত কাব্যকে, বোধ করি, কেহ আনন্দের কাব্য বলিবেন না। বিষাদের দ্বিগুণিত ছায়া মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির মত এই কাব্যভূমিকে আবেষ্টন করিয়া আছে। একদিকে বাংলার স্বাভাবিক বিষাদ আর একদিকে জগতের খণ্ডমূর্ত্তি দর্শনজাত কবির চিত্তের বিষাদ। ইহার পর হইতে,—উপনিষদ্ ও সংস্কৃত কাব্যের সহিত কবির পরিচয় সার্থক হওয়াতে দৃষ্টির একটু বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। সার্থক হওয়া এইজন্য বলিলাম যে, এই পরিচয় আগেই ছিল। কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়া উঠে নাই।

সোনার তরী হইতে নৈবেদ্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাব্যকেও আনন্দরসের কাব্য বলা যায় না! এখানে কি দেখি। স্বাভাবিক বিসাদ হইতে প্রাণপণ শক্তিতে আনন্দলোকে জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা। এই চেষ্টা, কেন,—না জগতের খণ্ডমূর্ত্তিকে পূর্ণভাবে কবি যেন আভাসে দেখিতে পাইয়াছেন। তাহা হইলে দেখিলাম মানসী পর্য্যন্ত বাংলার বিষাদ-ধারার সমাবেশ; নৈবেদ্যের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলার ও ভারতীয় ধারার দ্বন্দ্ব।

নৈবেদ্যে আসিয়া এমন একটা সুর দেখি, যাহাকে আনন্দের সুর বলিতে পারি। কিন্তু কাব্য হিসাবে ইহার মূল্য এইজন্য বেশী নয় যে, ইহার অধিকাংশই কবির

কাছে তত্ত্ব মাত্র, সত্য নয়। গীতাঞ্জলি ত্রয়ীতে যদিও আনন্দের উপলব্ধি নৈবেদ্যর মত এমন পূর্ণ নয়, তবু তাহা অধিকতর সত্য কারণ ইহা আর কবির নিকটে তত্ত্বমাত্র নয়, উপলব্ধ সত্য। আনন্দের এই অব্যাহত দৃষ্টি বলাকাতে আসিয়া পুনরায় দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে। একহিসাবে অর্থাৎ কাব্যতত্ত্বের দিক্ হইতে বলাকা ক্ষণিকার সগোত্র। মানব-রসের দিক্ হইতে ইহাদের সগোত্রত্বের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কাব্যতত্ত্ব হিসাবেও ইহারা ঐক্যমূলক। নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলিতে ভারতীয় ভাবের দ্বারা বাংলার ভাবের অভিভূতি; বলাকায় আসিয়া তাহার পুনরুদ্ধার। বলাকায় জগতের আনন্দরূপ সংশয় ও দ্বিধার দ্বারা খণ্ডিত। বলাকার পরের কাব্যকে অবিমিশ্র আনন্দের কাব্য বলা চলে না। তবে এই পরবর্ত্তী কাব্যে আসিয়া উভয় ধারার একটি সম্মিলন ঘটিয়াছে। কবিচিত্তে এই দ্বন্দ্ব সুখ দুঃখের সংঘাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মূলে যে বৈষম্য, তাহা কবি ও দার্শনিকের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুই বিচিত্র ও বিভিন্ন অংশ পরস্পর সদা সংযুক্ত হইয়া আছে, এক অংশ যাহাকে গ্রহণ করে অপর অংশ তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসে। ইহাতেও ভারতীয় ও বঙ্গীয় সভ্যতার তরঙ্গ-আঘাত ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় প্রকাশ ভঙ্গীর নৈর্ব্যক্তিক ও নির্গুণতার সহিত বঙ্গীয় ভক্তিমূলক Concrete প্রকাশ রীতিতে কবি-দার্শনিকের সম্মিলন ঘটাইয়া রবীন্দ্রনাথকে কবি-দার্শনিকে পরিণত করিয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার কাব্যে আমরা দেখিতে পাই: দার্শনিক হিসাবে যে মতকে তিনি মহার্ঘ্যতা দান করিতেছেন, পরমুহূর্ত্তেই স্বীয় কবিধর্ম্মের প্রেরণায় অনায়াসে, অধিকাংশ সময়েই, নিজের অজ্ঞাতসারে, তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছেন।

কবি ও দার্শনিকের এই পরস্পর বিরোধী লীলা তাঁহার কাব্যে তথ্য ও সত্যের দ্বন্দ্বে যেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, এমন আর কিছুতে নহে। আমরা যাহাকে তথ্য ও সত্য বলিলাম, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সীমা ও অসীম বলিবেন; তাহাকে অনন্ত ও সান্ত বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কি বলেন শোনা যাক—

"এই কারোয়ারে প্রকৃতির পরিশোধ নামক নাট্য কাব্যটি লিখিয়াছিলাম। কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধ ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি, প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও

সীমা নাই। * * প্রকৃতির পরিশোধের মধ্যে একদিকে যত সব পথের লোক যত সব গ্রামের নরনারী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতন ভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আর একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার এক ঘরগড়া অসীমের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে যখন সন্ন্যাসীর মিলন ঘটিল, তখনি সীমায় অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মধ্যে তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দ্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সতেজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সহিত পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিতে হইয়াছে। পরবর্ত্তী আমার কাব্য-রচনার ইহাও একটি ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য-রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'

তখনো 'আলোচনা' নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্য-প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির পরিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা আলোচনা করা হইতেছে। তত্ত্ব হিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কিনা এবং কাব্য হিসাবে প্রকৃতির পরিশোধের স্থান কি তাহা জানি না—কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে এই একটি মাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্য্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।"

[জীবনস্মৃতি—২৪৭-২৫০]

সীমা ও অসীমের এই যে সম্মিলনের কথা কবি বলিতেছেন, ইহা প্রকৃতপক্ষে কবি ও তাত্ত্বিকের মিলনের সংবাদ। এই মিলনের চেষ্টাতেই কবির কাব্যের ইতিহাস। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই মিলন পরিপূর্ণ সার্থকতা পাইয়াছে কিনা তাহা বিবেচনার

যোগ্য। কিন্তু কবি ও তাত্ত্বিকের দ্বন্দ্বই যে কবির কাব্যের শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র আইডিয়া তাহা কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

'আলোচনা' গ্রন্থে যৌবনে কবি যখন এই তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তাহা তত্ত্বমাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল; প্রৌঢ় বয়সে যখন তাহা কাব্যে পরিণত হইয়াছে বলিয়া কবির বিশ্বাস, তখনো তাহা পরিপূর্ণ সত্য নয়। তত্ত্বহিসাবে ইহার কি মূল্য, কবি তাহা জানেন না স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে, তাহা তত্ত্বহিসাবেই; কাব্যহিসাবে মূল্য আরো কম, নগণ্য বলিলেই চলে, কারণ কাব্যহিসাবে ইহা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে নাই। তাহার অর্থ এই যে কবির জীবনে এই সীমা ও অসীম দ্বন্দ্ব-বিরহিত হইয়া সত্য হইয়া ওঠে নাই;—জীবনে না হইলে কাব্যে হইবে কি প্রকারে—কাব্য তো জীবনের "বাই প্রডাক্ট"।

সীমা ও অসীমের, বা আমাদের ভাষায় তথ্য ও সত্যের, সমন্বয় না ঘটায় দাঁড়াইল এই যে, রবীন্দ্রনাথ কবি-দার্শনিক না হইয়া কবি ও দার্শনিক হইয়া আছেন।

গীতিকাব্যের প্রধান উপজীব্য,—বস্তুর নির্য্যাস, বস্তু নহে। বস্তুর নির্য্যাস বস্তুর সত্য, বস্তুর তথ্য নহে। উচ্চতম শ্রেণীর গীতিকবিহিসাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রধান উপজীব্য বস্তুর এই সত্যরূপ। যেখানে স্বাভাবিক কবিধর্ম্মকে তিনি অনুসরণ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার কাব্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে, আর যেখানেই, অন্য কোনো কারণে, কি শিক্ষার প্রভাবে, কি তত্ত্বজিজ্ঞাসা-হেতু, এই কবিধর্ম্মকে তিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার কাব্য নিম্নশ্রেণীর হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য কবি হইয়া তাঁহার এই কবিধর্ম্মকে লঙ্ঘন কেন? কবি ও দার্শনিকের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের জীবনে আছে, যেখানে এই দ্বন্দ্বে কবি পরাভূত হইয়াছেন, সেখানেই কাব্যের এই দুর্দ্দশা। ইহার জন্য উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব দায়ী। এক ও অনেকের সমন্বয়, বলা যাইতে পারে, উপনিষদ্-তত্ত্বের মূল। এক হইতেছেন বিশ্বের নির্য্যাসরূপ, আমাদের ভাষায় সত্য, কবির ভাষায় অসীম, অনেক বিশ্বের তথ্যরূপ, কবির ভাষায় সীমা। কবি যে সীমা ও অসীমের সমন্বয়কে তাঁহার কাব্যের একমাত্র ভূমিকা বলিয়াছেন, তাহার মূল এই দার্শনিক মতবাদের মধ্যে।

সাহিত্যে বিশ্বের তথ্যরূপ ও সত্যরূপ দুইয়েরই স্থান আছে। কোনো কোনো শাখায় তথ্যই প্রধান উপজীব্য; কোনো কোনোটাতে সত্য, তবে সর্ব্বত্র যেমন এখানেও তেমনি, একটা হইতে আর একটাকে পৃথক্ করিয়া লওয়া চলে না—কেবল সুবিধার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে বিবেচনা করা চলে মাত্র। নাটকে উপন্যাসে এই তথ্যরূপ

প্রধান উপজীব্য, তাহাতে airy nothingকে নিগু ণপ্রায় নির্য্যাসকে নানা তথ্যের বর্ণব্যঞ্জনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হয়। গীতিকবিতায় এই নির্য্যাসরূপের প্রাধান্য. ছোট গল্পেও অনেক সময়েই এই নিয়ম।

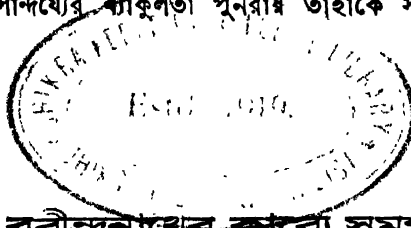
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব কবিতায়, গীতিকাব্যে। গীতিকাব্যের পরেই তাঁহার স্থান ছোট গল্পে। উপন্যাস-নাটকে তাঁহার দান অবহেলার নয়, কিন্তু ইহাতে তিনি গীতিকাব্য ও ছোট গল্পের অসামান্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ, তাঁহার স্বাভাবিক কবিধর্ম্ম অতি অনায়াসে তাঁহাকে গীতিকবিতার অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। উপন্যাস-নাটকে তিনি স্বাভাবিক কবিধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াও যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রতিভার মহার্ঘ্যতার জন্য। কিন্তু অনেক স্থলেই তিনি, অন্তরস্থ দার্শনিকের প্ররোচনায়, এই সত্যরূপকে অবহেলা করিয়া ভাল কবিতাকে নষ্ট করিয়াছেন। চিত্রার সিন্ধুতীরে কবিতাটির আরম্ভে ইহার প্রাণস্বরূপ রহস্যের রসটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। রহস্যের প্রধান উপাদান অজানার ভাব। রাত্রির অন্ধকার, অপরিচিত স্থান, অবগুণ্ঠিতা রমণী, সমস্তই এই রহস্যের জালটি বুনিয়া তুলিতেছে। কিন্তু তার পরেই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার ঘটা সুরু হইয়া গেল; অপরিচয়ের জালে ছেদ পড়িতে আরম্ভ করিল, সমস্ত দেশ ও কাল অত্যন্ত উগ্রভাবে চেতনার উপরে আঘাত করিয়া রহস্যের সুকুমার তন্তুজালকে ছিন্ন করিয়া দিল। কবি কীট্‌স এই শিল্পে অধিকতর পারদর্শী ছিলেন। নাইটিংগেল কবিতার দুইটি মাত্র ছত্রে তিনি সমুদ্রপারস্থিত একটি স্বপ্নপুরীর চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন। সেই রহস্যজালের ফাঁকগুলি এত ভরাট নয়, তাহার অবকাশ কবির ইঙ্গিত-অনুসারে পাঠকের কল্পনা-দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিবার সুযোগ আছে।

এখন এই তথ্য ও সত্যের সমাবেশমাত্র কবি-প্রতিভায় ঘটিয়াছে, সমন্বয় ঘটে নাই, ইহা কি কবি নিজে জানেন না? আমার তো মনে হয় তিনি জানেন। তবে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করিতেছি, তিনি তাহা করেন নাই, এই মাত্র। পূর্ব্বে উদ্ধৃত সবুজপত্রের পত্রখানিতে এ বিষয়ে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"আমি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না, সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি আধ্যাত্মিক জাতীয় মনে করেন, ইহা গৃহত্যাগী নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিক জাতীয়, সাকারে জড়িত। কবির বিশ্বাস ভাল কবিমাত্রেই ইহাদের দুই অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন থাকে। সে কথা সত্য। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথেও ইহাদের দুই অংশের সমাবেশ ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ইহাদের সমন্বয় তাঁহার প্রতিভায় ঘটে নাই। সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রতিভায় সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-

পূর্ণ ভালবাসার অপেক্ষা প্রবল। "যে ভালবাসে সে অভাব দুঃখ পীড়িত সম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক, আর যে সৌন্দর্য্যব্যাকুল সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা।" "অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force, Idealএর দিকে Realকে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের Centripetal force Realএর দিকে Idealকে আকর্ষণ করে—"

প্রেম ও সৌন্দর্য্যব্যাকুলতার মধ্যে যে সমন্বয় থাকিলে কল্পনার Centrifugal ও Centripetal forceএ বিরোধ না ঘটিয়া প্রতিভার শতদল পূর্ণ বিকশিত হইয়া ওঠে, এমন সামঞ্জস্য অল্প ক্ষেত্রেই ঘটে, রবীন্দ্রনাথেও অল্পই ঘটিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহা হইয়াছে তাহা অন্য রকম। সৌন্দর্য্যব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথে অধিক প্রবল হওয়াতে, সুখদুঃখ ক্ষুদ্রখণ্ডতাপূর্ণ সংসারের দিক্ হইতে তাহাকে পরিপূর্ণ Idealএর দিকে বারংবার টানিয়া লইয়া গিয়াছে। যে মানুষের কবি হইতে তাঁহার কবিজীবনের চরম বাসনা, তাহার দিক্ হইতে এই সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ ব্যাকুলতা তাঁহাকে উদাস করিয়া দিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব ও পরাজয়ের চিহ্ন এবার ফিরাও মোরে কবিতায়। পরিপূর্ণ Idealএর সঙ্গীত-লোক হইতে অসম্পূর্ণ সংসারে অবতীর্ণ হইতে তাঁহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা। প্রাণপণ বলে সেই সংসারের প্রান্তে আসিয়া তিনি দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সৌন্দর্য্যের ব্যাকুলতা পুনরায় তাঁহাকে সঙ্গীতলোকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।



রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সমন্বয়

প্রকৃতি ও লীলারস

এতক্ষণ আমরা কেবল কবি-প্রতিভার দ্বিধার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রশ্ন এই, প্রতিভার এই দ্বিধা কি কোনো সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্যে পরিণত হয় নাই? যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে সেই সত্তা কি?

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্র বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঙ্গতি লাভ করে নাই, এমন কথা কেহ বলিতে সাহস করিবে না, কারণ জীবনকে এমন পূর্ণভাবে দেখিবার, এমন অখণ্ডভাবে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতা জগতে দুর্লভ; সত্য কথা বলিতে কি, মহাকবি গ্যেটে ব্যতীত, আর কাহারো জীবনকাহিনীতে ইহার এমন

স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাস, সেক্সপীয়র উৎসুক পাঠক-সমাজকে চিরদিনের মত ফাঁকি দিয়াছেন, কাব্যের পটভূমিস্বরূপ তাঁহাদের জীবনকাহিনী চিরকালের মত অবলুপ্ত।)

পূর্ব্ববর্ত্তী এক অধ্যায়ে দেশীয় ও বিদেশীয় কয়েক জন কবির কাব্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যের তুলনা করিয়াছি। গ্যটের সহিত বর্ত্তমান কবির ঐক্য আরো গভীর, একেবারে জীবনের ঐক্য। বাস্তবিক, বাহিরের ঘটনার ও ভিতরের ভাবনার, এত ঐক্য অপর দুই মহাকবির মধ্যে পাওয়া দুষ্কর।

রবীন্দ্রনাথের মত গ্যটের জীবনে ও প্রতিভায় নানা দ্বন্দ্ব ছিল। একদিকে তাঁহার অন্তরের ভাবজীবন, অন্যদিকে রাজসভার কর্ম্মজীবন; একদিকে তাঁহার অন্তরে কাব্যের উৎস, অন্যদিকে চিন্তালোকে বৈজ্ঞানিক আগ্রহ; আর সমস্তকে ব্যাপ্ত করিয়া তৎকালীন জার্ম্মান সমাজ ও সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকর খণ্ডক্ষুদ্রতা। এই সমস্ত দ্বিধায় গ্যটের জীবনকে আদ্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্যই, গ্যটের গ্রন্থাবলীতে আমরা এত অসমাপ্ত রচনা, একই রচনাকে বারংবার পুনর্লেখন করিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। বহুদিন পর্য্যন্ত মহাকবি নিজের প্রতিভার স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চয় হইতে পারেন নাই। কিন্তু এই সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে জীবনের সমগ্রতাকে দেখিবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল। তাঁহার সেই বিখ্যাত পিরামিডের সহিত জীবনের উপমা! এই বিরাট্ পিরামিড সম্পূর্ণ করিবার জন্য, কবি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। গ্যটেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত, তিনি এই জীবনপিরামিড সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন, কি না? তিনি কি উত্তর দিতেন জানি না। হয়তো স্মিত করুণ হাস্যে নীরব হইয়া থাকিতেন। এ পিরামিড সম্পূর্ণ হউক বা না হউক যে ভাবে এই সম্পূর্ণতা লাভের উদ্যোগ চলিতেছিল, তাহা কম বিস্ময়কর নয়। দ্বিধাগ্রস্ত-জীবন গ্যটে, বহুখণ্ডশঃ জার্ম্মনীর কবি, লুথারশাসিত খৃষ্টান ইউরোপের কবি, গথিকশিল্পের জনকদেশের এই চিন্তাবীর, প্রাচীন গ্রীকশিল্পের অখৃষ্টান সার্ব্বভৌম আনন্দলোকে আত্মার মুক্তিলাভ করিলেন। গ্যটের পরবর্ত্তী জীবনে যদিও দ্বিধা দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই, তবু এই গ্রীক আদর্শের পথেই তাঁহার জীবন পরিচালিত। গ্যটের বিচিত্র জীবনকাহিনীর ইহাই নিগূঢ়তম রহস্য, আবার ইহাতেই সমস্ত রহস্যের সমাধান।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব যে সত্তার মধ্যে সঙ্গতি লাভের চেষ্টা করিতেছে, তাহাও ইহার অপেক্ষা কম আশ্চর্য্যের নহে। (রবীন্দ্রনাথ মানুষের কবি, আমরা সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মের কবি, সেই ভাবেই তিনি সাধারণে পরিচিত, কিন্তু তাঁহার ভাবধারার সঙ্গম ঘটিয়াছে,

মানবতায় নহে, ব্রহ্মেও নহে, প্রকৃতির মধ্যে। ইহা বিস্ময়জনক মনে হইতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে জীবনের অনেক কিছুই বিস্ময়ের।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই প্রকৃতি কি বিশুদ্ধ প্রকৃতি, না ইহার সহিত অন্য কোনো রসের মিশ্রণ আছে? আছে, কিন্তু তাহা ব্রহ্মের নহে। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির বয়সে ভগবৎপ্রেমে কাব্যের উৎস অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। বলাকায় আসিয়া সে প্রভাব শিথিল হইয়া আসিয়াছে, পূরবীতে তাহা প্রায় মুক্ত। ইহাতে যাঁহারা বিস্মিত হন তাঁহাদের বুঝা উচিত, ইহাই স্বাভাবিক এবং ইহার অন্যথা হইলেই অস্বাভাবিক হইত।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যে কখনো ভগবানের সন্ধান করেন নাই, মানুষকে খুঁজিতে গিয়া ঈশ্বরের সন্ধান মিলিয়াছে। কিন্তু ভগবানের এই মনুষ্যবিরহিত সত্তাতে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া আরো অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। এই প্রাগ্রসর গতি তাঁহাকে মানুষের দ্বারে উপস্থিত করিয়াছে, সেখানে ভগবানেরও সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। কিন্তু নানা কারণে মানুষের মধ্যে পূর্ণভাবে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই অশান্ত, অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত কবি, আরো অগ্রসর হইয়া গিয়া যাহার মধ্যে চিত্তের বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তাহা কবির বাল্যসঙ্গী—প্রকৃতি।

কিন্তু তবু তাহা নিছক প্রকৃতিমাত্র নহে। ইহার সহিত আরো একটা রস মিলিত হইয়াছে। ইহাকে আমরা লীলারস বলিতে পারি। এই লীলারস বলাকার পরবর্তী প্রায় সমস্ত কাব্যের মূল। এই লীলায় শিশু-ভোলানাথের জন্ম, পূরবীর অধিকাংশ কবিতাও এই রসেই রসায়িত।

এই লীলারস কি? লীলারস মানবরসের একটা অঙ্গ, যেমন শিশু মানব-সমাজের একটা অঙ্গ। মানুষের সহিত মিলন শিশুর সহিত মিলনের অপেক্ষা কঠিন। কারণ পূর্ণজাগ্রত মানুষের সত্তা একটা জীবন্ত সংঘাতশীল ব্যাপার। ইহাতে প্রেমের সহিত প্রেমের দ্বন্দ্ব; ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার সংঘাত; কোন পক্ষই ইহাতে নিরপেক্ষ নহে। কাজেই এখানে মিলন সহজ নহে, উভয় পক্ষের ইচ্ছার অভাব না থাকিলেও অবস্থাচক্রে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অসদ্ভাবে সে মিলন প্রায়ই অসম্পূর্ণ অসিদ্ধ থাকিয়া যায়। কিন্তু শিশু ও বালকের সহিত মিলন তেমন কঠিন নহে, কারণ ইচ্ছা আকাজ্ক্ষার দ্বন্দ্বসংঘাত এখানে তেমন উগ্র না হওয়াতে একপক্ষ প্রায় নিষ্ক্রিয়। এই নিষ্ক্রিয়তাতেই মিলনের রহস্য। এক হিসাবে প্রকৃতি শিশুর সগোত্র, তাহার দিক্ হইতে কোনো দ্বন্দ্ব সংঘাত বাধা বা ক্রিয়া নাই। কাজেই প্রকৃতির সহিত যে একাত্মকতা অনুভব করে, সে শিশুর সহিত করিতে পারে। বিশ্বপ্রকৃতিও শিশুর মত সরল, সহজ, অবোধ এবং ভাষাহীন মূক। ইহাদের প্রতি

আমরা যে ভাবটি হৃদয়ে অনুভব করি, তাহাকে লীলারস বলিতে পারি। এই লীলা রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী কাব্যের মূলপ্রেরণা।

দীর্ঘজীবনের বিচিত্র শ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার শেষে রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছেন যে মানুষের সহিত অন্তরঙ্গম হৃদ্যতা এবারের মত ঘটিল না, বাহিরের দরজা হইতেই এবারের পরিচয়। কিন্তু জীবন চেষ্টার অবসান কোনো একটা সত্তার মধ্যে আবশ্যক, নহিলে তৃপ্তি নাই। সেই সত্তা কি? জীবনের অপরাহ্নে আর একবার জীবন প্রভাতের সঙ্গীকে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। জীবনমধ্যাহ্নের ব্যস্ততায় তাহাকে ভুলিয়াই ছিলেন। এবার সেই পুরাতন সঙ্গী নূতন বেশে আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু তাহার সহিত আর এক জন আসিল; বিশ্ব প্রকৃতির সে দোসর, সে শিশুচিত্ত, লীলাসঙ্গিনী।

এই লীলাসঙ্গিনীর ভাবটিকে প্রেম বলা ভুল, ইহাকে লীলারস বলাই সঙ্গত। প্রেম মানবরস; লীলারস শিশুচিত্তের রস। প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, সংঘাত আছে, সেই জন্য মিলনও সেখানে কঠিন। লীলারস অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। এই লীলারস রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের সাধনা; এবং হয়তো ইহাতেই তাঁহার সিদ্ধি। কবির পরবর্ত্তী কাব্যে যেমন ইহার বিকাশ; শেষ জীবনের চিঠিপত্রে গদ্যপ্রবন্ধে তেমনি ইহার ব্যাখ্যা।

ভানুসিংহের পত্রাবলীর একখানি পত্রে এই ভাবটি কবি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রখানি দীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত হইল।

"গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলছিলো তখন মনে হচ্ছিল যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্ছি! একদিন আমার বয়স অল্প ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবনপাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃতরস ঢেলে দিত; কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতোই আমার বাঁশী হাতে বিরাজ করতুম।

"সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েছে, লোকালয়ের কোলাহলে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত, তারই পথের ধূলায় তার চিত্ত ম্লান। সে আপন বিক্ষত চরণ নিয়ে তার সেই সৌন্দর্য্যের স্বপ্নরাজ্যে ফিরে যেতে চাচ্ছে। তার জীবনের মধ্যাহ্নে কাজও সে অনেক করেছে, ভুলও কম করেনি, আজ তার কাজ করবার শক্তি নেই; ভুল করবার সাহস নেই। আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশী বাজিয়ে যেতে চায়। যে-রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিল—সেখানে ফিরে

যাবার আগে শান্তিসরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করতে চায়। তেমন করে ডুব দিতে যদি পারে তাহলে তার জীর্ণতা, তার ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে; আবার তার মধ্য থেকে সেই চিরশিশু বাহির হ'য়ে আসবে। সংসারের জটিলতায় ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ সৃষ্টি করে সেটা তো ধ্রুব সত্য নয়—সেটা মায়া।

"সেটা যে-মুহূর্ত্তে কুহেলিকার মত মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্ম্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এমনি করে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বালমাধুর্য্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছে।

"আজ আমি চলেছি সমুদ্র পারে কাজের ক্ষেত্রে; যখন সেই কাজের ভিড়ে থাকবো তখন হয়তো আমার ভিতরকার কর্ম্মী আর-সকল কথা ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তবু সেই সুদূর গানের ঝরণাতলায় বাঁশীর বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে নিশ্চয়ই ডাকবে; ডাকবে সেই নির্জ্জন নির্ম্মল নিভৃত ঝরণাতলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বুকের মধ্যে এসে আজ কুহরিত হচ্ছে। বলছে, সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ হয় নি, এখনো আমার সুরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি, এখনো সেই নব নব বিস্ময় দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতর মহলে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়।

"তাই, যদিও আজ চলেছি পশ্চিম সমুদ্রের তীরে, আমার মন খুজে বেড়াচ্ছে আর এক তীরে সকল-কাজ-ভোলা সেই বালকটাকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে; এখন সে কোথায় ঘুরে মরছে। ফিরে আয়, ফিরে আয়, বলে' ডাক পড়েছে। একজন কে তার গান শুনতে ভালবাসে। আকাশের মাঝখানে তার আসন পাতা, সেই তো শিশুকালে তাকে বাঁশীর শিক্ষা দিয়েছিল, নিশীথ রাতের শেষরাগিণী বাজানোর ছলে সে তার বাঁশী ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে পড়ছে।" [ভানুসিংহের পত্রাবলী, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪]

এখানে সেই বেদনা। প্রকৃতির মাতৃক্রোড়ে শিশুচিত্তের প্রসন্নতা লাভের প্রয়াস। এই প্রয়াসকে বৃদ্ধ কবির অন্তিম সাধনা বলা যাইতে পারে। এই বেদনার প্রেরণাতেই শিশুভোলানাথ কাব্যের জন্ম।

কবি বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত হইয়া একবার পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইলেন। কি দেখিলেন? সেই সুদূর অতীতে তাঁহার স্বাভাবিক শৈশব, আর সম্মুখে অনতিলঙ্ঘ্য

তাঁহার সাধনার শৈশব। সেই অতীতে তাঁহার জীবনরঙ্গমঞ্চে প্রকৃতি ছিল প্রধান নায়ক; মানুষ ছিল পশ্চাতে পটভূমিকার মত। তারপরে যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে, কর্ম্মের জটিলব্যস্ততায়, প্রকৃতি পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মানুষ প্রধান অভিনেতার পদ পাইয়াছিল। কিন্তু আজ বৃদ্ধ বয়সে, একটা কথা মর্ম্মান্তিক ভাবে বুঝিতে পারা গেল, এই প্রধান পাত্রের জটিল অসম্পূর্ণ বিরহ-মিলন-পূর্ণ জীবন-যাত্রার অন্দর মহলে তাঁহার প্রবেশ ঘটে নাই। কবি লুব্ধভাবে ব্যাকুলভাবে তাহার সিংহদ্বারের বাহিরে বাঁশী হাতে করিয়া অসমাপ্ত মিলনের দীর্ঘায়িত বিরহের বেদনাই শুধু জানাইয়াছেন। আজ আবার সেই জীবনরঙ্গালয়ে প্রকৃতি প্রধান পদ লাভ করিল, মানুষ তাহার অনাবিষ্কৃত রহস্য লইয়া পুনরায় পটভূমিকায় পিছাইয়া গেল।

প্রকৃতির সহিত এইরূপ বিপুল একাত্মকতা কবি চিরকাল অনুভব করিয়াছেন; কি বার্দ্ধক্যে কি যৌবনে! কিন্তু বার্দ্ধক্যে যাহা প্রায়সত্য হইয়া উঠিয়াছে, যৌবনের জটিলতায় তাহা স্বপ্নের মত আভাসিত মাত্র হইত। ছিন্ন পত্রের অনেকগুলি পত্রে এই ভাবের উল্লেখ আছে।

এ যেমন চিঠিপত্রে আত্মব্যাখ্যা তেমনি কাব্যে আত্মবিকাশও আছে। শিশু ভোলানাথে শিশুচিত্তের নিমিত্ত ব্যাকুলতা, আর পূরবীতে লীলাসঙ্গিনীর সহিত মিলনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। প্রকৃতি শিশু ও লীলাসঙ্গিনী এই তিনই এক রসের অন্তর্গত, তাহাকে আমরা লীলারস বলিয়াছি। ইহা বাল্যসঙ্গিনীর প্রতি যে মনোভাব তাহাই;—ইহা যে রীতিমত প্রেম নহে, তাহা বলা বাহুল্য; ইহা একপাক্ষিক এবং অনেকটা নিষ্ক্রিয়। পূরবীর অধিকাংশ কবিতাই এই রসে রসিত। বিশেষ ভাবে লীলাসঙ্গিনী, শেষ অর্ঘ্য, আহ্বান, ক্ষণিকা, খেলা, মুক্তি, দোসর কবিতাগুলি মিলাইয়া পড়িলেই আমাদের কথা বোঝা যাইবে।

শিশু ভোলানাথে শিশুচিত্তের, পূরবীতে লীলাসঙ্গিনীর যেমন আভাস, তেমনি বলাকার পরের যুগের অধিকাংশ গানে প্রকৃতির প্রতি একাত্মকতার ব্যঞ্জনা। এই যুগের অধিকাংশ গানের আধার প্রকৃতি; সেই পাত্রে নানা ভাবের ও নানা রসের সম্মিলন ঘটিয়াছে। আবার বিশুদ্ধ প্রকৃতিপ্রীতির গানের সংখ্যাও অনেক। প্রবাহিনী নামে গানের বইখানি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহাতে বিশুদ্ধ প্রকৃতি বিষয়ে গান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সংখ্যাতেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব এমন সাংখ্যদর্শন আমাদের নহে। কিন্তু কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বের কথা যেখানে মুখ্য নহে, কবিচিত্তের অভিবিকাশ কোন্ দিকে ইহাই আলোচ্য, সেখানে সংখ্যার একটা মূল্য আছে বৈকি। বলাকার পরের কাব্য বিস্তৃতভাবে আমাদের আলোচনার নহে, কাজেই

ইহা বিশদরূপে মিলাইয়া পাঠ করিবার ভার আমরা পাঠকের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

এই লীলায় রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতার ও বহুরসবাহী প্রতিভার সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছে, এমন কথা কখনো বলিতে পারি না। কারণ বিরাট্ প্রতিভার পরিণাম কখনোই এমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মানব-জীবনের সপ্তপারাবারের সহিত নাড়ির যোগে আবদ্ধ। কখন্ কোন্‌টা হইতে যে কোটালের বান ছুটিয়া আসে, তাহার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই; নানা রসের স্বতোবিরুদ্ধ ভাবসম্মিলন এই প্রতিভায় তাই এমন অনায়াস। তবে অন্যান্য সমস্ত রসপ্রবাহের মধ্যে লীলারসটাই এখন প্রবল, আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে পারি।

রবীন্দ্রকাব্যে দোষ

অতিকথন ও সামান্যকথন

সূর্য্যেও কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাহা নিন্দকের চোখে, যাহারা কখনো সূর্য্যের দিকে চোখ ফিরায় না, ধরা পড়ে না। সূর্য্যের যাহারা অতিভক্ত অর্থাৎ যাহারা ভক্তির আতিশয্যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, তাঁহার ধ্যান করে, তাহাদের চোখেও সে কলঙ্ক ধরা পড়ে না। কিন্তু যাহারা দিনের পর দিন দূরবীক্ষণ-যোগে সূর্য্যকে পরীক্ষা করিতে থাকে; সূর্য্যের স্বরূপের যাহারা তপঃপরিশ্রমী, সূর্য্য জ্যোতির্যবনিকা অপসারিত করিয়া তাহাদের নিকটে আপন কলঙ্ক উদ্ঘাটিত করেন।

রবীন্দ্রকাব্যেও দোষ আছে। কিন্তু সে দোষের স্বরূপ না নিন্দকের নিকটে না অতিভক্তের নিকটে প্রকাশিত। যে সব কাব্যরসপিপাসু চিত্ত, জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য পাঠে অভিজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ কাব্যেও যাঁহারা দোষকে অসম্ভব মনে করেন না, যাঁহাদের কবির প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা কাব্যের দোষে সঙ্কুচিত হয় না, কাব্যের দোষ তাঁহাদের নিকটেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমরা রবীন্দ্রকাব্যের নানা গুণের আলোচনা করিয়াছি, এবারে, দোষের আলোচনা না করিলে এ গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিশেষ, নির্গুণ কাব্যের ন্যায় নির্দোষ কাব্যও আপন বিশুদ্ধিতায় আলোচনার অযোগ্য।

সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে বলাকা পর্য্যন্ত আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র। কিন্তু দোষ-

নির্ণয়ের এই অধ্যায়ে সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে মানসী পর্য্যন্ত আমরা বাদ দিব। এই অংশটাকে পরিণত কাব্যের সম্মান দিতে স্বয়ং কবির আপত্তি আছে; আমরাও তাহা সমর্থন করি। যাহাকে একান্ত চিত্তে প্রশংসা করিতে পারিব না, কঠোর ভাবে তাহার দোষ সমালোচনা সাহিত্যিক নিষ্ঠুরতা মাত্র। যে অংশ পূর্ণভাবে প্রশংসার যোগ্য, দোষ সমালোচনাও তাহার পূর্ণভাবে করিব।

রবীন্দ্রকাব্যে প্রধানত দুইটি দোষ: সামান্যকথন ও অতিকথন। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ গীতিকবিতা; গীতিকাব্যের প্রধান উপজীব্য বস্তুর নির্য্যাস। এই বস্তুর নির্য্যাস স্বভাবত আপনাকে সূক্ষ্মরূপে প্রকাশ করে। ইহাকে বস্তুর আত্মা বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা সূক্ষ্মদেহী।

যুধিষ্ঠিরের রথ যেমন মাটির কিছু উপর দিয়া চলাফেরা করিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যও তেমনি আমাদের চেতনার উপর খানিকটা অসংলগ্ন ভাবে সঞ্চরণ করে। এই যে অসংলগ্নতার অবকাশটা ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যেখানে সেটা অতিরিক্ত হইয়া যায়, সেখানে আমাদের অন্তরের রসলোক সম্পূর্ণভাবে ইহার সঞ্চরণে সাড়া দেয় না, সংক্ষেপে, আমাদের রসানুভূতি সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হয় না। কোনো বস্তু সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য হইবার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের অপেক্ষা রাখে। সেটার কম্‌তি পড়িলে বস্তুটাকে পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ছায়াটা অবস্তু, কিন্তু তাহাকেও পূর্ণভাবে অবাস্তব বলিতে পারি না, কারণ তাহারও একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে এই রূপটিরও যখন অভাব ঘটে, তখনি ছায়া আমাদের চেতনার বহির্ভূত হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে যে অনেকে অবাস্তব মনে করেন, তাহার কারণ, উহা এই ছায়াজাতীয় বাস্তব। ম্যাথু আর্নল্ড যে শেলির অনেক কবিতাকে অবাস্তব মনে করিতেন তাহার রহস্যও কবিতার এই প্রকৃতির বিভিন্নতায়। শেলি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কাব্যই এই ছায়াজাতীয় বাস্তব। কিন্তু তবু তাহা আমাদের রসবোধ জাগ্রত করিতে অশক্ত নহে। শেলির অনেক কবিতা যে রসবোধ জাগরণে অসমর্থ তাহার কারণ, ছায়ার মধ্যেও যেটুকু বাস্তব গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহার অভাব ঘটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কাব্যেও এই বাস্তব গুণের অভাব আছে, কি তাহার কারণ তাহা গ্রন্থের অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এই ছায়াসুলভ বাস্তবগুণের অভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য যেখানে আমাদের রসবোধ জাগ্রত করিতে পারে না, সেখানে উহাকে কাব্যের দোষ বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। এই দোষটাকে আমরা সামান্য-কথন দোষ বলিতেছি। ইহা উভয় সঙ্কটের মাঝে যাত্রার মত।

গীতিকবিতা স্বভাবত বস্তুর নির্য্যাসরূপী; ইহার একদিকে তথ্যরূপ, অন্যদিকে সামান্যরূপ; মাঝের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ইহার যাত্রা। দক্ষিণে হেলিয়া পড়িলে গীতিকবিতা সুরের পক্ষ হারাইয়া ভারি ও নিরেট হইয়া পড়িতে পারে; বামে হেলিলে সামান্যরূপ গ্রহণ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট হইয়া উধাও হইয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সুদক্ষ হাতে অধিকাংশ কবিতাই সগৌরবে মধ্যপন্থায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোনো কোনো কবিতা এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া সামান্যপন্থী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই দোষ তাঁহার কাব্য অপেক্ষা গদ্যে অধিক। গদ্য জমিতে সঞ্চরণশীল পদাতিক; তাহাকে প্রতিপদক্ষেপে নানা বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া চলাফিরা করিতে হয়। এইরূপ পদচারণার দ্বারাই সে আমাদের সগোত্রত্ব প্রচার করিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইয়া ওঠে। গীতিকাব্যের মত সুরের পক্ষে বিচরণ করিলে তাহার চলে না। রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাস ও নাটক গীতিকাব্যের সহিত অত্যন্ত সগোত্র হওয়ায় যেমনভাবে আমাদের রসবোধ জাগরণ করা উচিত তেমনভাবে করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার ছোট গল্পগুলি স্বভাবতই গীতিকাব্যের সগোত্র হওয়ায় সার্থক সৃষ্টি হইয়াছে, রসবোধ-জাগরণে তাহারা সমর্থ।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতর প্রধান দোষ অতিকথন। সামান্যকথন অপেক্ষা অতিকথন দোষে তাঁহার কাব্য অধিক দূষিত। এই অতিকথন দোষ নানা কারণে ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রথম বয়সের রচনায় যেমন সামান্যকথন দোষ অধিক, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যের রচনায় তেমনি অতিকথন দোষ বেশী।

বহুকথন দোষ প্রধানত দুই কারণে ঘটে। যেখানে ভাবাবেগ শিল্পীর কলা-কৌশলকে ছাপাইয়া যায়, সেখানে কাব্য ভাবাতিশয্যে অকাব্য হইয়া ওঠে। আবার যেখানে তত্ত্ব বিষম হইয়া ওঠে, সেখানে কাব্য একান্ত ভারি হইয়া তত্ত্বের রূপ ধারণ করে। এই ভাবাতিশয্য প্রায়ই উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতির আতিশয্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। কবির ছন্দের উপর অসমান্য দক্ষতা—ভাষা ও ভাবের উপর অসাধারণ কৃতিত্ব, যেখানে থামা উচিত কবিকে সেখানে থামিতে দেয় না। একই ভাব নানা প্রকারে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে কবির যেন কতই আত্মবিলাস। বিশেষ, এই সময়ে ছন্দের নেশায় কবিকে এমনই পাইয়া বসে যে কাব্যের প্রয়োজন থামিয়া গেলেও শুধু ছন্দের নেশায় কবির অন্ধ লেখনী ছুটিয়া চলিতে থাকে। যে দিব্য কল্পনা তাঁহাকে শিল্পের পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে, সে-ই কল্পনাই আবার অনেক সময় তাঁহাকে পূর্ণতাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে প্রলুব্ধ করিয়াছে।

যেখানে তত্ত্বের জন্য কবির কাব্য ভারাক্রান্ত হইয়াছে, তাহার মূলে কবির অতিরিক্ত আত্মব্যাখ্যার ইচ্ছা। কবির পক্ষে আত্মব্যাখ্যা অপেক্ষা আত্মবিকাশের

মূল্যই যে অধিক কিংবা আত্মবিকাশই যে কবির পক্ষে আত্মব্যাখ্যা, তাহা যেন কবি ভুলিয়া যান। এই আত্মব্যাখ্যার ইচ্ছা বারংবার একই ভাবের আবৃত্তিতে প্রকাশমান। একই ভাবের পুনরাবৃত্তি অনেক কবিতায়; আবার একই ভাবের পুনরাবৃত্তি একই কবিতায়। পুনরাবৃত্তিতে যদি ভাবটি অধিকতর মনোরম হইয়া প্রকাশ পায়, তবু তাহা সহ্য হয়। কিন্তু পুরাতন ভাব যখন নিকৃষ্টবেশে দেখা দেয় তখন তাহা অসহ্য।

যে সময়টাকে লোকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আধ্যাত্মিক পর্ব্ব বলিয়া থাকে, সেই সময়ে এই জাতীয় বহুকথন তাঁহার কাব্যে অধিক দেখা যায়। খেয়া হইতে গীতালি অবধি ইহার বেশী প্রাদুর্ভাব। তাহার পরে, ইহা কমিয়াছে এমন কথা বলি না, তবে ইহা পদ্য ছাড়িয়া গদ্যকে আক্রমণ করিয়াছে। পরবর্ত্তী কালে কবি তাঁহার অনেকগুলি পূর্ব্বলিখিত ও সুন্দর নাট্যকে পুনর্লেখন করিতে গিয়া তত্ত্বের ভারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজা ভাঙ্গিয়া অরূপ রতন, অচলায়তন ভাঙ্গিয়া গুরু ও শারদোৎসব ভাঙ্গিয়া ঋণশোধের সৃষ্টি। এগুলিকে কবি-প্রতিভার অনাসৃষ্টি বলা উচিত।

এ সমস্তই কবির আত্মব্যাখ্যার অতিরিক্ত আগ্রহজাত। কবি তো সর্ব্বদাই আত্মব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; কালিদাস ও মল্লিনাথ জরাসন্ধের মত নিত্যসংযুক্ত। এই রূপই হয়, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে কবিকে অতিক্রম করিয়া টীকাকারের কণ্ঠ শোনা যায়, সেখানে বুঝিতে হইবে শিল্পধর্ম্মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এই পর্ব্বটায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবির সেই দুর্দ্দশা হইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, কবিকে এক প্রকার ধর্ম্ম বাতিকতা এই সময়টায় পাইয়া বসিয়াছিল। সেটা যে একটা বাহিরের মত মাত্র, সে যে কবির আভ্যন্তরিক অস্তিত্বের অংশ নয়, তাহা ইহার অত্যুগ্র আত্মপ্রকাশের অস্বাভাবিকতায় ধরা পড়ে।

এই যে দুইটি দোষের কথা বলিলাম, সামান্যকথন ও বহুকথন, সংক্ষেপে আমরা এ দুটিকে এই ভাবে প্রকাশ করিতে পারি। গদ্যের গুণের দ্বারা পদ্যের আক্রমণ এবং পদ্যের গুণের দ্বারা গদ্যের আক্রমণ।

সামান্যকথন, অবশ্য পরিমিত মাত্রায়, গীতিকাব্যের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণের দ্বারা কবির বহু নাট্য উপন্যাস ও প্রবন্ধ আক্রান্ত হইয়াছে। বহুকথনকে অর্থাৎ সাহিত্যের পদার্থিকতা গুণকে গদ্যের প্রধান লক্ষণ বলিতে পারা যায়, ইহা-দ্বারা কবির কাব্য বিশেষরূপে দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছে।

আবার এই দুই দোষকেই মূলত একই কারণের প্রকাশ বলিয়া ধরা যায়। এতদুভয়ই কবি-প্রতিভার ঐশ্বর্য্যের দোষ। মহাকবিগণের কাব্যের দোষ তাঁহাদের

প্রতিভার আতিশয্যের দোষ। এখন এই আতিশয্যটা কি রকম। বহুকথনটা কবির প্রতিভার আতিশয্যের প্রকাশ। আর সামান্যকথনটা উক্ত প্রতিভার আতিশয্যের অকারণ আত্মসংবরণ। কোনো স্থানে কবি অযাচিতভাবে আপন ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়াছেন, আবার কোনোখানে সে ঐশ্বর্য্য বিতরণ উচিত কি না তাহা ভাবিয়া অকস্মাৎ আত্মসংবরণ করিয়াছেন। প্রকাশটা দুই রকমের, কিন্তু কারণটা একই—ঐশ্বর্য্যের অভাব নহে, অতিভাব।

এইবারে আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা লইয়া এই দুই দোষের বিশদ ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

সোনার তরীর প্রথম কবিতাটি সোনার তরী। এই কবিতাটি লইয়া বাংলা-সাহিত্যে যত আলোচনা হইয়াছে, এমন বোধ হয় আর কোনো কবিতা লইয়া হয় নাই। আবার কবিতাটি স্বয়ং কবি ও পাঠকের উভয়েরই অত্যন্ত প্রিয়। এত তর্কবিতর্কে ইহাই প্রমাণ করে যে কবিতাটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অবিসংবাদিতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। এই অক্ষমতা কি সে? কবিতাটি সামান্যকথন-দোষ-দুষ্ট।

কবিতাটিতে কবি একখানি চিত্র আঁকিয়াছেন, সে চিত্র আবার অত্যন্ত সূক্ষ্ম কয়েকটি রেখাপাতে সংক্ষেপে অঙ্কিত। ইহাতে দোষের কিছু নাই—কারণ রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতাতেই এই পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সংক্ষেপ অঙ্কনেরও একটা সীমা আছে। ন্যূনতম যে কয়েকটি রেখা আবশ্যক তাহাতে ত্রুটি হইলে চিত্রে ফাঁক পড়িয়া যায়, রসবোধ অস্বস্তি অনুভব করে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।

প্রথম দুইটি শ্লোকে বর্ষাপ্রভাতের চিত্র সুন্দর। তৃতীয় চতুর্থ শ্লোকে সোনার তরী ও তাহার নাবিকের চিত্র; পঞ্চম ও ষষ্ঠে সবটার পরিণাম। চতুর্থ শ্লোক পর্য্যন্ত আমাদের বক্তব্য কিছু নাই। কিন্তু পঞ্চম শ্লোকের পূর্ব্বে আর একটি শ্লোক থাকিলে যেন কবিতাটির আরো ঠাস বুনানি হইত, এবং পাঠকে যে অস্বস্তি বোধ করে তাহা ঘটিয়া উঠিত না। যাহা হইতে পারিত তাহার উপর নির্ভর করিয়া তর্ক সাহিত্যে বড়ই বিপদ্‌জনক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা ছাড়া আর উপায় নাই। এ কবিতাটি যে পাঠকের অনুমোদন লাভ করিয়াছে, তাহা ইহার তত্ত্বের জন্য নয়, কবিতাটির পরিচিত বর্ষানদীর চিত্ররস এবং অপূর্ব্ব ছন্দের জন্য। অবশ্য ইহার একটা তত্ত্বের দিক্‌ও আছে, কিন্তু চিত্রে ছেদ পড়িয়া যাওয়াতে তত্ত্ব ও চিত্রের মধ্যে একটা ভাগ হইয়া গিয়াছে। আরো দুই একটি তুলির টান পড়িলে এই ছেদ অন্তর্হিত হইয়া কবিতাটি চিত্রে-তত্ত্বে একাত্ম হইয়া অনবদ্য হইয়া উঠিত।

পরশ-পাথর কবিতাটি বহুকথন-দোষে দুষ্ট। ইহার প্রথম শ্লোকে ক্ষ্যাপার পরশ-পাথর-সন্ধানের ব্যর্থ ও হাস্যকর প্রয়াস। দ্বিতীয় শ্লোকে কবি দেখাইতেছেন সমুদ্র আপন মনে অতল রহস্যের সন্ধান আলোচনা করিতেছে।

জলরাশি অবিরল করিতেছে কল কল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে।

তৃতীয় শ্লোকে :—

একদা এই সমুদ্রেই ঝাঁপ দিয়া দেবদৈত্য লক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। দেবদৈত্য যেমন এই সমুদ্র হইতে বিশ্বের নিগূঢ়তম রহস্যকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ক্ষ্যাপাও ইচ্ছা করিলে সেই সমুদ্রের তীরে পরশপাথররূপ রহস্যকে উদ্ধার করিতে পারে; ব্যঞ্জনার দ্বারা কবি ইহা প্রকাশ করিতেছেন। কাজেই আমরা বুঝিলাম পরশপাথরের রহস্য ক্ষ্যাপার পক্ষে যতই দুষ্প্রাপ্য হউক একেবারে অপ্রাপ্য নহে। ইহার পরে পাঠকের পক্ষে আর ব্যঞ্জনার আবশ্যক নাই। একেবারে আসল কথাটা, ক্ষ্যাপার সংবাদটা প্রয়োজন; কিন্তু অনর্থক আর একটা শ্লোক আসিয়া মাঝখানে বাধা দেয়। এই চতুর্থ শ্লোকটা তত্ত্বহিসাবে অনাবশ্যক, কাব্যহিসাবেও অনবদ্য নয়। ইহাতে পুরাতন ভাবের পুনরাবৃত্তি -তাহাও অত্যন্ত নিম্নস্তরের। সমুদ্রের বিরাট্ ব্যঞ্জনার পরে --

বিরহী বিহঙ্গ ডাকে সারানিশি তরুশাখে
যারে ডাকে তার দেখা না পায় অভাগা।

অত্যন্ত হাস্যকর ব্যঞ্জনা। ইহার পরে পুনরায় সমুদ্রের উপমা, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এবং স্বতোবিরুদ্ধ। যে সমুদ্রকে ইতিপূর্ব্বে অতলরহস্যের ভাণ্ডারী বলা হইয়াছে তাহাকেই আবার—

যত করে হায় হায়, কোনো কালে নাহি পায়
তবু শূন্যে তোলে বাহু, ওই তার ব্রত,

কেন যে বলা হইল তাহা কবিই জানেন। ইহার পরের গ্রহতারার পর্য্যটনের বর্ণনাটি সুন্দর, কিন্তু অপ্রয়োজনীয়। কবিতার মধ্যে চতুর্থ শ্লোকটি না থাকিলে কবিতাটি ছেদবিহীন হইয়া আরো জমিয়া উঠিত—বহুকথনের দ্বারা কবিতাটির সমগ্রতা ব্যাহত হইয়াছে।

যেতে নাহি দিব কবিতাটি প্রকৃতপক্ষে

'দিব না দিব না যেতে'—নাহি শুনে কেউ

এখানে আসিয়া শেষ হওয়া উচিত। ইহার পরের

নাহি কোনো সাড়া ।
চারিদিক্ হতে আজি

* * *

অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।

পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি মাত্র।

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ
সমস্ত পৃথিবী!

হইতে

নাহি শুনে কেউ—
নাহি কোন সাড়া।

অবধি এই কয় ছত্রে কন্যার ব্যাকুলতাকে বিশ্বপ্রকৃতিতে আরোপিত করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত বেদনা সার্ব্বভৌম হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্ত্তী চুয়াল্লিশ ছত্রে এই ভাবই আবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। নূতন কোনো আইডিয়া বা বেদনা নাই। এ কয় ছত্র না থাকিলে কবিতার সৌন্দর্য্যের কোনো ক্ষতি হইত না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পরবর্ত্তী পনেরো ছত্র মাত্র দিলেই যোগ্য উপসংহার হইত।

কাব্যে উপমা জিনিষটা সৌন্দর্য্য ও ব্যঞ্জনার সহায়ক। কিন্তু সব জিনিষের মত, তাহারও একটা সীমা আছে। উপমেয় ও উপমানের ভিতরকার ঐক্যকে কতদূর পর্য্যন্ত টানিয়া লওয়া চলে তাহার কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, কবির স্বাভাবিক শিল্পজ্ঞান তাহার একমাত্র মানদণ্ড। এমন স্থলে উপমাকে অত্যন্ত সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, তাহার উপরে দাবী অত্যধিক হইলে ব্যাপারটা হাস্যকর হইয়া উঠিতে বাধা নাই।

পরবর্ত্তী কবিতা প্রতীক্ষা। কবিতাটি উচ্চাঙ্গের নয়, কাজেই ইহার সমালোচনাও সংক্ষেপে সারিব। মৃত্যুর বিষয়ে আট পৃষ্ঠাব্যাপী এই দীর্ঘ কবিতাটি অতি-বিস্তৃত স্থানের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া ফেলিয়া সৌন্দর্য্যকে অত্যন্ত ফিকা করিয়া ফেলিয়াছে। যে বাষ্প একত্র সংহত হইলে নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করিয়া আকাশের এক প্রান্ত উজ্জ্বল করিতে পারিত, তাহা বহুব্যাপ্ত আকাশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া ক্ষীণ

কুয়াশার আভাসমাত্র রচনা করিয়াছে। কল্পনার বিদায় নামে কবিতাটি দেখিলে নক্ষত্র ও নীহারিকার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মানস-সুন্দরী—রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু ইহার শেষেও এই রকম অনাবশ্যক কয়েকটি ছত্র অকারণে ঝুলিয়া আছে।

রজনী গভীর হ'ল দীপ নিবে আসে ;

হইতে

মরণ-সুস্নিগ্ধ শুভ্র বিস্মৃতি শয়নে।"

অংশ কাব্যহিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ইহার মধ্যে যে অংশে পদ্মাতীরের বর্ণনা কাব্য-সৌন্দর্য্যে তাহার কোনো বিশিষ্টতা নাই; এতদপেক্ষা উচ্চাংশের বর্ণনা কবি নিজে বহুবার করিয়াছেন। বিশেষ, এত উচ্চাঙ্গের কাব্যসৃষ্টির পরে এমন সাধারণ বর্ণনা একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিয়াছে।

"এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে

*   *   *   *

জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।

বস্তুত এখানেই কবিতার সমাপ্তি, এবং মানস-সুন্দরীর ইহাই রহস্য। কবিতার স্বাভাবিক আবেগ যেখানে শেষ হইয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের কলম তাহার পরে আরো খানিকটা চলে। কবি ও শিল্পীর মধ্যে এই ব্যাবধান ঘুচাইতে রবীন্দ্রনাথের অনেকটা সময় লাগিয়াছে। সত্য বলিতে কি, গানগুলি বাদ দিলে, বলাকার পূর্ব্বে এই পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নাই।

হৃদয়যমুনা কবিশিল্পীর চরম সৃষ্টি। ইহা সম্পূর্ণ অনবদ্য। কেবল একটি শব্দ সম্বন্ধে আমাদের ক্ষীণ আপত্তি আছে। চতুর্থ শ্লোকের তৃতীয় ছত্রের স্নিগ্ধ শব্দটি কানে পীড়াদায়ক। অক্ষর দুইটির সংযুক্তবর্ণ মনে যে আন্দোলনটি তুলিয়া দেয়, তাহার চাঞ্চল্যে তলতীরহীন মৃত্যুসম নীলনীরের সুগভীর শান্তি যেন কাঁপিয়া ওঠে। ওই শব্দটি অতটা চাঞ্চল্যজনক না হইলে হৃদয়যমুনার শান্তি আরো বৃদ্ধি পাইত।

বসুন্ধরা কবিতায় মানস-ভ্রমণ অংশটা সামান্য দোষদুষ্ট।

চিত্রার অন্তর্য্যামী কবিতা জীবন-দেবতা পর্য্যায়ের। জীবন-দেবতার আইডিয়া তত্ত্বহিসাবে মূল্যবান্ হইতে পারে, কিন্তু ইহা কাব্যহিসাবে বিশেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই—এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

অন্তর্য্যামী কবিতাটিকে বিষয়-বস্তুহিসাবে পাঁচটি ভাগ করা চলে। প্রত্যেক ভাগে স্বতন্ত্র বিষয়ের আলোচনা, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বেশী নাই। প্রথম ভাগে যাহা সামান্যভাবে বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে তাহাই নানা উদাহরণ ও উপমায় বিশিষ্ট করিয়া তোলা হইয়াছে। কাজেই—এ অংশটাকে একেবারে অবান্তর বলা চলে না। তবু মনে হয়, কবিতাটি আকৃতিতে সংক্ষিপ্ত হইলে প্রকৃতিতে উচ্চতর সার্থকতা লাভ করিত।

আবেদন ও বিজয়িনী দুইটি কবিতাই বর্ণনামূলক। শুধু যে ইহাদের মূলে বর্ণনা, তাহা নহে, বর্ণনাই ইহাদের প্রধান উপজীব্য হওয়াতে কাব্যের প্রাণ-অংশে কৃপণতা করিতে কবি বাধ্য হইয়াছেন। আবেদনের—বর্ণনীয় বিষয় আমাদের চিত্তকে যে সৌন্দর্য্যলোকে লইয়া যায়, সেখানে উপস্থিত হইয়া আমাদের চিত্ত তদনুরূপ কোনো কেন্দ্রে আশ্রয় লাভ করে না। কিংবা সে আশ্রয় এতই দুর্ব্বল ও ক্ষীণবৃন্তশায়ী যে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিজয়িনী সম্বন্ধেও একই বক্তব্য; কবি বর্ণনার মোহে আসল কথাটা শেষ পর্য্যন্ত যেন ভুলিয়াছিলেন, হঠাৎ শেষের শ্লোকে এই ত্রুটি সারিয়া লইবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে কাব্য-সৌন্দর্য্যের ব্যর্থতা দূর হয় নাই। মদনের পরাজয়টাই ইহার আসল কথা, কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ইহা প্রক্ষিপ্তের মত বোধ হয়। ইহার আসল কারণ, কবি নবলব্ধ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শক্তিটা তখনো আত্মস্থ করিয়া লইতে পারেন নাই; এই নবলব্ধ শক্তিতে এতই মত্ত হইয়াছেন যে, তাহাতে কাব্যের সমগ্রতা যে দুষ্ট হইয়াছে তাহা যেন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন নাই।

উর্ব্বশী রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। চিত্রার কোনো কোনো সংস্করণে ইহার পঞ্চম শ্লোকের প্রথমে 'সুরসভাতলের' পরিবর্ত্তে 'ইন্দ্র সভাতলে' দেখা যায়। সুরসভার স্থলে ইন্দ্রসভা কর্ণক্রটিকর; অবশ্য আধুনিকতম সংস্করণে সুরসভা পুনরায় স্থাপিত হইয়াছে।

মোহিতকুমার সেন মহাশয়ের সংস্করণে উর্ব্বশীর সব শেষের শ্লোকটি বাদ পড়িয়াছে। কাহার রসবোধ ইহার জন্য দায়ী জানি না। দায়িত্ব যাহারই হোক—ইহাকেই বলে কাব্যের উপরে সমালোচনার বজ্রাঘাত। এই শ্লোকটি যদি অবান্তর হইত, তবে ইহা চলিত। কিন্তু ইহা অবান্তর নহে। পূর্ব্বের শ্লোকের আক্ষেপের মধ্যে ইহার অপেক্ষা রহিয়া গিয়াছে। উর্ব্বশীর চিরকালীন তিরোভাবে জগতে ও

জীবনে যে ব্যাকুলতা বিরাজমান, এই শ্লোকটি তাহা প্রকাশ করিতেছে। ইহাকে ছাঁটিয়া দেওয়ার অর্থ, কবিতাটির প্রাণকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলা।

ক্ষণিকার একটা মস্ত সুবিধা এই যে ইহার কোনো কবিতা অতিদীর্ঘ নয়; আকৃতির এই নাতিদীর্ঘতা কাব্য-প্রকৃতিকে নানা দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেকাল কবিতাটি অন্যান্য কবিতার তুলনায় কিছু বড়; ইহাতে ত্রুটিও ঘটিয়াছে, কবিও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহার সপ্তম শ্লোকটি চয়নিকায় বাদ পড়িয়াছে। ইহাতে কবির সম্মতি আছে বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কল্পনার অনেকগুলি কবিতা কবিশিল্পীর চরম সৃষ্টি; কাজেই ইহাতে ত্রুটি প্রদর্শনের বিশেষ কিছু নাই। সৃষ্টি এত সার্থক বলিয়াই অন্যত্র যে দোষ চোখে পড়িত না, এখানে তাহা অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা দেয়।

শরৎ কবিতাটি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের কৃপায় খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এই খ্যাতি—ইহার প্রাপ্য বলিয়া মনে হয় না। কবিতাটির প্রধান দোষ ইহার মধ্যে কালব্যবধান দোষ ঘটিয়াছে।

প্রথম শ্লোকে শরতের প্রাথমিক আভাসের চিহ্ন; দ্বিতীয় শ্লোকে একেবারে হৈমন্তিক নবান্ন। তৃতীয় শ্লোকে আবার শারদীয় উৎসব। চতুর্থ শ্লোকটা মাঝখানে ইতস্তত: করিতেছে। পঞ্চম শ্লোকে পুনরায় নবান্নের উৎসব; ষষ্ঠে শারদীয় মাতৃমূর্ত্তির বন্দনা।

শরতের উৎসব ও হেমন্তের নবান্নের মধ্যে ব্যবধান অনেকটা। বাংলা দেশের শারদীয় উৎসব শারদীয় প্রতিমা পূজার কেন্দ্রে আশ্রিত। কবি নানা কারণে প্রতিমার কেন্দ্রকে ব্যবহার করিতে পারেন নাই; অথচ কোন একটা কেন্দ্র না হইলেও কবিতাটি দাঁড়াইতে পারে না। কাজেই দূরবর্ত্তী নবান্ন উৎসবটাকে কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে কালব্যবধান দোষটা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ষশেষ সম্বন্ধে আমরা যথা স্থানে দীর্ঘ আলোচনায় ইহার দোষগুলি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কাজেই এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

উৎসর্গ কাব্যের প্রবাসী একটি সুন্দর কবিতা। কিন্তু কবি ইহার শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার শেষের শ্লোক দুইটি অকারণে বিষয়ান্তর বর্ণনা করিয়া কবিতাটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

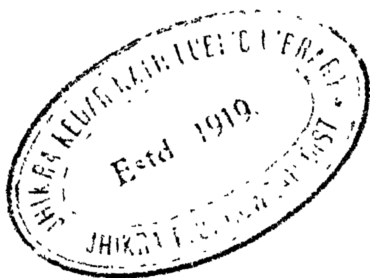
প্রথম হইতে যে একটি ব্যাকুলতার বিকাশ হইয়া উঠিতেছিল, শেষের শ্লোকে তাহা ধর্ম্মবাতিকতার চাপে কেমন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নৈবেদ্য হইতে বলাকার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়টাতে এই ধর্ম্মবাতিকতা কবির কাব্যসৃষ্টির পক্ষে প্রধান বাধা।

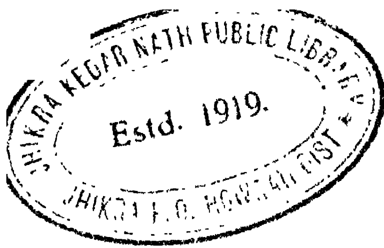
যে প্রতিভা পূর্ব্বে ও পরে এত অধিক ও এত শ্রেষ্ঠ কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এই বিষম বিঘ্নে ব্যাহত হইয়া কাব্যসৃষ্টি ত্যাগ করিয়া গদ্যের মর্ত্তভূমিতে বিচরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই ধর্ম্মবাত্তিকে যে প্রবাসী কবিতাটি অসম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা নহে, উৎসর্গের আরম্ভের ভোরের পাখী কবিতাটির শেষ শ্লোকেও যেন ইহারই কতকটা আভাস।

বলাকা কাব্যে ছয়চল্লিশটি কবিতা। অন্য কোন কাব্যের ছয়চল্লিশটি কবিতা এত কম দোষশূন্য নহে। ইহার সকল কবিতাই যে অত্যুচ্চ শ্রেণীর, এমন কথা বলি না। গোটা দুই কবিতা এ গ্রন্থে না দিলে ইহা সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব লাভ করিত। আবার কোনো কোনো কবিতায় দু'একটি শ্লোক না থাকিলেও যেন ভাল হইত। কিন্তু এই পর্য্যন্ত, ইহার অধিক দোষ এ কাব্যে নাই। এ কাব্য হয়তো কাহারো ভাল না লাগিতে পারে, কিংবা অন্য কোনো কাব্য ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনে হইতে পারে, ইহা ব্যক্তিগত রুচিভিন্নতার ব্যাপার। কিন্তু এ কাব্যে কবিশিল্পীর প্রতিভাকে নিন্দা করিবার অবকাশ অত্যন্ত স্বল্প; নাই বলিলেই হয়।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতার মধ্যে সামান্য কয়েকটি কবিতার দোষ লইয়া আলোচনা করিলাম। এই যে দুইটি দোষ,—সামান্যকথন ও বহুকথন, ইহা কেবল কাব্যের আকৃতির দোষ নয়, কবির প্রকৃতির দোষ। ইহা কবির সমগ্র অস্তিত্বের ফলাফলের সহিত জড়িত। ইহার আলোচনার অর্থ কবি-প্রকৃতির সমালোচনা, তাহাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।





সোনার তরী

সোনার তরীতে আসিয়া কবির কাব্য-প্রতিভা পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বের কাব্যগ্রন্থে দু'চারটা করিয়া ভাল কবিতা থাকিলেও, মোটের উপর সে কাব্যগুলিকে কাব্য সাধনার উদ্যোগপর্ব্ব বলা যাইতে পারে। এই পরিণতির সঙ্গে কবি-প্রতিভার যে-স্বভাব মগ্নচৈতন্য লোকে পূর্ব্বে গুপ্তপ্রায় ছিল তাহা অনেকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই স্বভাবের ধারাকে অনুসরণ করিতে পারিলে কবিকে সহজে বুঝা যাইবে। তার আগে কবির লিখিত দুইখানি পত্র পড়িয়া দেখা যাক।

মানসী সম্বন্ধে লিখেছ, যে তার মধ্যে একটা Despair এবং Resignationএর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আশু যখন বলেছিলেন, জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তিই আমার কবিত্বের মূল মন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হ'তেও পারে। এখন এক একবার মনে হয় আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। একটা আমাকে সর্ব্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা আঘাত করছে—সেই জন্য একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্ম্মের প্রতি আসক্তি, আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। এই জন্য সবশুদ্ধ মিলিয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।

[১৮৯৮, ২৯শে জানুয়ারী ; সবুজপত্র, ১৩২৫]

দ্বিতীয় পত্র :—

আমি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না, সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধহয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী ; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিক জাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে শেলির স্কাইলার্ক আর একটা

হচ্ছে ওয়াডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্ক। একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করছে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করছে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী, যে-ভালবাসে সে অভাব-দুঃখ-পীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক। আর যে সৌন্দর্য্য-ব্যাকুল সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ, যে যেটা অধিক করে অনুভব করে। [সবুজপত্র, ১৩২৪, ৪র্থ সংখ্যা]

কবি এই দুইখানি পত্রে নিজের কাব্য-প্রতিভার বিশ্লেষণ করিয়া সমালোচকের কাজ অনেকটা সহজ করিয়াদিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে কোনো অসঙ্গতি নাই। প্রথম পত্রের Despair ও Resignation দ্বিতীয় পত্রের সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এবং প্রথম পত্রের জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তি সুখদুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ [মানুষের প্রতি] ভালবাসার নামান্তরমাত্র। এই দুই ধারার দ্বন্দ্ব ও পরিণাম রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ইতিহাস, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন দেখা যাক সোনার তরীতে এই ভাবদ্বন্দ্ব কি আকার লাভ করিয়াছে, এবং পরবর্ত্তী কাব্যের কি ভবিষ্যৎ সূচিত করিতেছে।

(১)

কাব্যের গোড়াতে সোনার তরী শেষে নিরুদ্দেশ যাত্রা। এ কবিতা দুইটি প্রতিভার ভিন্নমুখী দুটি ধারার প্রতীক। সোনার তরী প্রারম্ভে অবস্থিত হইয়া কবির মানবাভিমুখিতার সুরটি ধরাইয়া দেয়; এবং খুব সম্ভবত, নিরুদ্দেশযাত্রার চূড়ান্ত অবস্থান নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা সূচনা করে। বোধহয় এ দুটি কবিতার অবস্থানের দ্বারা কবি ইহাই জানাইতে চাহেন প্রারম্ভের মানবাভিমুখিতা অন্তত এ কাব্যে সার্থকতা লাভ করে নাই। সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দিষ্টলোকের আকাঙ্ক্ষার প্রবলতা তাঁহাকে অসম্পূর্ণ মানবের সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রথম কবিতাটির ইতিহাস গল্পে শোনা যাক।

আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকা বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসচে, আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকা যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্চি—যখন আর কয়দিন থাক্‌লে ধান পাকতো তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে কি নিদারুণ তা বুঝতেই পারা যায়। [ছিন্নপত্র ১৪৮].

প্রথম বর্ষার এই রকম একটি করুণ দৃশ্য সোনার তরী কবিতাটির জন্মলগ্নে। অতএব দেখা যাইতেছে ধান সোনার বর্ণ নহে, নিতান্তই সবুজ।

কবি তাঁহার এক আঁটি সোণার ধান লইয়া নিজের জীবনের ক্ষুদ্র ঘাটটিতে, ক্ষুদ্রতর অভিজ্ঞতার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখের কালস্রোত জগতের বৃহৎ জীবনযাত্রার প্রতি ধাবিত; বড় বড় নৌকার আনাগোনা। সেই মহা জীবন-যাত্রার আভাস বহন করিয়া আনিতেছে। কবি সেই বৃহৎ জীবনের জন্য উৎসুক, মাঝি নৌকা তীরে ভিড়াইল; কবির দান, তাঁহার সাধনার ফসল, একান্ত হইয়া যাহা তাঁহাকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, মাঝি তাহা তুলিয়া লইল, কিন্তু সাধকের স্থান আর হইল না। কবিতাটির প্রাণ এই করুণ রসে। কবির দুঃখ কিসের! এতদিন নদীকূলে যাহা লইয়া তিনি আর সমস্ত ভুলিয়াছিলেন সে সমস্তই সোনার তরীর মাঝি তুলিয়া লইয়া গেল। এই প্রিয়-বস্তু-বিচ্ছেদের দুঃখ কবির।

কিন্তু সোনার তরীতে উঠিয়া পড়িবার সময় তাঁহার এখনো হয় নাই। এখনো তাঁহাকে এই শূন্য নদীর তীরে পড়িয়া থাকিয়া এই ছোট ক্ষেতে একাকী সাধনা করিয়া আরো অনেক ফসল ফলাইতে হইবে, তবে না তাঁহাকে মাঝি তুলিয়া লইবে। অপূর্ণ জীবনের এক আঁটি ফসল দিয়া তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু এ সত্য তাঁহার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। তাহা হইলে দেখা গেল, সোনার তরী মানবের বৃহৎ জীবনের আভাস বহন করিয়া আনিল, কিন্তু কবির স্থান তাহাতে হইল না। তবে সেই জীবনের সংবাদ যে তিনি লাভ করিলেন, মনে যে তাঁহার ব্যকুলতা জাগিল, আপাতত এইটুকুই সান্ত্বনা।

কবিতাটি চিত্ররস প্রধান। পদ্মাতীরের অতি পুরাতন একটি ঘটনাকে অপূর্ব্ব শব্দ-সঙ্গতি ও ছন্দো-মাহাত্ম্যে আশ্চর্য্য চিত্রসম্পদ্ দান করা হইয়াছে। ইহা প্রধানত একটি নিখুঁত চিত্র, ইহাতে যে করুণ রস আছে তাহা আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত হইয়া গিয়া সেখানে এক অলৌকিক মায়াময় করুণ ব্যঞ্জনা জাগাইয়া দেয়।

শৈশব সন্ধ্যা কবিতাটিতেও এই বৃহৎ জীবনের আভাস। ইহাতে তিনটি স্তর প্রথমে—

> সহসা উঠিল গাহি কোন্ খান হ'তে
> বন-অন্ধকারঘন কোন্ গ্রাম পথে
> যেতে যেতে গৃহমুখে বালক পথিক।

তারপরে সন্ধ্যায় গৃহমুখী বালকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া

মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা
শৈশবের।

তৃতীয়স্তরে, নিজের শৈশবকে বিশ্বময় বিস্তৃত করিয়া অনুভব ;

দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যা শয্যা মার মুখ, দীপের আলোক।

এখানে দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে: প্রথমত, এই বিশ্বজীবনের অস্তিত্ব কবির নিকটে কল্পনা মাত্র ; দ্বিতীয়ত, নিজের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে দেখিবার শক্তি নাই! এই বৃহৎ জীবন এখনো কবির নিকটে স্বয়ং-নির্ভর ও বাস্তব হইয়া ওঠে নাই।

আমার শৈশব-সন্ধ্যা কবিতায় বোধহয় কতকটা এইভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী অথচ ভালোমন্দ-এবং সুখদুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে, নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।
[ছিন্নপত্র ২৬৯]

এই ক্ষুদ্র জীবন ও চিরন্তন কলধ্বনি ব্যক্তিগত জীবন ও বিশ্বজীবন ব্যতীত আর কিছুই নহে, একটির পটভূমিতে আর একটি ; একটিকে দেখিয়া আর একটিকে মনে পড়িয়া যায় ; একটি প্রত্যক্ষ, অপরটির কেবলমাত্র আভাস।

বৈষ্ণব-কবিতাতে মানব-সমাজের প্রতি প্রীতি কবির চিত্তে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলীকে মানবসংসার হইতে বঞ্চিত করিয়া কেবল ভগবান্ ও ভক্তের উপভোগে নিয়োগ করিতে চান কবি তাঁহাদের সহিত একমত নহেন। ভক্ত ও ভগবান্ সংসারকে অতিক্রম করিয়া নাই ; এই গানগুলির এমনই মোহ যে ইহাতে ভক্ত, ভগবান্ ও মানবসমাজ একীভূত হইয়া যায়—একের প্রেম হইতে অনেকের প্রেমে যাইবার সিংহদ্বার ইহাতে বদ্ধ নয়। সেই জন্য যাঁহারা এ প্রেমকে মানুষের প্রয়োজন হইতে নির্বাসিত করিয়া রাখিতে চান তাঁহারা কৃপার পাত্র।

এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তারে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

যেতে নাহি দিব কবিতার মূল ভাবটি পৃথিবীর প্রতি, জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি। আবার সে আসক্তি বিজ্ঞ বয়ঃপ্রাপ্তের নহে। জীবনের অভিজ্ঞতা যাহার খানিকটা জন্মিয়াছে, সে জানে, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা ভবে।' কিন্তু চারি বছরের মেয়ে বুঝিতেই পারে না কেন যে তাহার পিতা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে। তাহার হৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহ সত্বেও স্নেহময় পিতা ছাড়িয়া যান। ইহাই দুঃখের রহস্য। এই শিশু-কন্যার ক্রন্দন আমাদের সকলের জীবনেই রহিয়াছে ; পৃথিবীর বয়সের তুলনায় আমরা শিশু বইকি। এখানে কবির চিত্ত তাঁহার শিশু কন্যার মত বহুকালের পৃথিবীকে, প্রিয় বস্তুকে, অপসৃয়মান সৌন্দর্য্যকে আঁকড়াইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে।

তাঁহার চোখে—

কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর
"যেতে আমি দিব না তোমায়।"

বসুন্ধরা মানুষের জননী ; সন্তানের দুঃখে তিনিও দুঃখিত। এই ভাবটিও মূল ভাবটির আনুষঙ্গিক।

বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া ; * *
* * * *

তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।

পৃথিবী দরিদ্রা, স্বর্গের অমৃত তাহার নাই, সে প্রাণপণ বলে সেই অমৃতের আভাস মাত্র দিতে পারে। পৃথিবীর সস্নেহ অক্ষমতা ও তাহার প্রতি আকর্ষণের ভাব নিম্নলিখিত কয়েকটি সনেটে প্রকাশ পাইয়াছে। মায়াবাদ, খেলা, বন্ধন, গতি, অক্ষমা, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ।

বসুন্ধরা একটি অপূর্ব্ব কবিতা। বিজ্ঞানের কোনো একটি মতবাদের সহিত সুসঙ্গত অথচ পরিপূর্ণভাবে কাব্য, এমন কবিতা প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাতে বিশ্বকে জানিবার দুর্দ্দম আকাঙ্ক্ষার সহিত, অন্তঃপুরবাসিনী ধরিত্রীকে জড়াইয়া থাকিবার ব্যাকুল আগ্রহ টানা-পোড়েনের মত বুনিয়া গিয়া বিচিত্র এক রসের সৃষ্টি করিয়াছে। এক দিকে—

নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্ত্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন, এক হ'য়ে
সকলের সনে।

এখনো মেটেনি আশা,
এখনো তোমার স্তন-অমৃত পিপাসা
মুখেতে রয়েছে লাগি।

*   *   *   *

এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়
মুখ পানে চেয়ে।

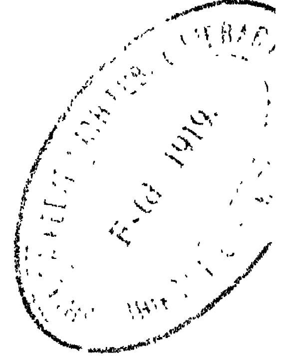
কবি নিজেই এই ভাবটিকে গদ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন।

এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলুম, যখন আমার উপরে সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত

শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক লোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকৃত, আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জলস্থলপর্ব্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাক্‌তুম, তখন শরৎ সূর্য্যালোকে, আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড ভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকৃত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্য্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছে শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে—সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে। [ছিন্ন পত্র, ১১৪]

এবার পদ্যে দেখা যাক, এই ভাবটি কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের; তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিশায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি
কোনদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব মনে অনুভব করি
তোমার মৃত্তিকামাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবন রসধারা অহর্নিশি ধরে
করিতেছে সঞ্চরণ;



কবিতাটির প্রথম অংশ কবির মানস-ভ্রমণের চিত্রে পূর্ণ। কবি কল্পনায় নব নব রাজ্য দর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু এখনো ইহা মানসভ্রমণ মাত্র। গৃহের তৃষ্ণা

মিটিলে তবে বাহিরের প্রতি টান সত্য হইয়া দেখা দেয়। ইহাতে ঘরের টানটাই বাস্তব ; বাহিরের জিজ্ঞাসা কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষা। বিশ্বের বৈচিত্র্যের জন্য আকুলতা এবং ঘরের প্রতি বালকোচিত অসহায় ও করুণ আসক্তির সম্মিলনে যে রসসঙ্গম হইয়াছে—ইহাতেই কবিতাটির বিশেষত্ব।

এই সুদীর্ঘ কবিতাটি অনেকখানিই পৃথিবীর নানা দৃশ্যের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। মানসভ্রমণের অংশটা পড়িলেই বর্ণনার মধ্যে কেমন বড় বড় ফাঁক চোখে পড়ে। কিন্তু তাহার পাশেই পদ্মাতীরের বর্ণনায় কি প্রভেদ! একখানি ছবি পাঠকের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, যে ছবি কবি বহুবার দেখিয়াছেন, কবির জীবনের সহিত যাহা বহুকালের সহবাসে একীভূত হইয়াছে।

হেরি যবে সন্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে
বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি
দূর গোষ্ঠে, মাঠ পথ উড়াইয়া ধূলি,
তরু-ঘেরা গ্রাম হ'তে উঠে ধূম-লেখা
সন্ধ্যাকাশে ; যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মত অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে।

কিংবা—

শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্বশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্রপরে,
নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া,

জগতে নানা কবি সমুদ্রকে বিভিন্ন ভাবে দেখিয়াছেন। সোনার তরীর কবির সমুদ্র, কবির জননী, শুধু তাহাই নহে, সে সমস্ত পৃথিবীর আদিম জননী, এ বিষয়ে কবির একখানি চিঠিতে আছে—

এই পৃথিবীর সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জ্জনে মুখোমুখী করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়। পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্ত

ভাবে তরঙ্গিত হ'তে থাক্‌ত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা বোঝা যায়। আমার অন্তর-সমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেই রকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কি একটা যেন সৃজিত হ'য়ে উঠছে। কত অনির্দ্দিষ্ট আশা, অকারণ আকাঙ্ক্ষা, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ নরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত, প্রত্যক্ষাতীত, প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্য্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি, মানব-মনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব্ব অপরিমেয় ব্যাপার। [ছিন্ন পত্র, ১৩২]

এখন দেখা যাক, এই ভাবটি কেমন করিয়া কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট্ জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে'
ওই তব অবিশ্রান্ত কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ;

আবার—

মানব-হৃদয়-সিন্ধুতলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্দ্ধ অনুভব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

এখানে দুর্জ্জয় সিন্ধুর সহিত কবির আত্মীয়তার সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ শিশু ও জননীর। কবি নিতান্ত অসহায় শিশুর মত আদিম জননীর নিকটে সকরুণ ভাষায় বলিতেছেন—

জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এপাশ ওপাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস।

তাই—

স্নিগ্ধ মাতৃপাণি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারংবার হানি,
*   *   *   *   *
বলো তারে "শান্তি শান্তি," বলো তারে, "ঘুমা ঘুমা, ঘুমা।"

এ আবেদন নীড়কাতর বৃহৎ জগতের সহিত অর্দ্ধপরিচিত বালকের, যে সুর পূর্ব্বের কয়েকটি কবিতায় আমরা দেখিয়াছি।

সমুদ্রের প্রতি কবিতাটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে সমুদ্র ও পৃথিবী; সমুদ্র মাতা, পৃথিবী একমাত্র কন্যা। সমুদ্র ও পৃথিবীর নানা প্রাকৃতিকদৃশ্যবৈচিত্র্যকে মাতা ও শিশুকন্যার নানা ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কখনো আশা, কখনো শঙ্কা, কখনো মহেন্দ্রমন্দিরপানে অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, কখনো সুকোমল কৌশলে সমুদ্রমাতার ন্যায় পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে, আবার কখনো স্নেহগর্ব্বসুখে ধরিত্রীর নির্ম্মল ললাট আশীর্ব্বাদে আর্দ্র করিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে সমুদ্র স্নেহক্ষুধার প্রচণ্ড পীড়নে তাহাকে চাপিয়া ধরিতেছে, আবার পরক্ষণেই নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় পদতলে আসিয়া পড়িতেছে। মাতা ও কন্যার ভাব অভিব্যক্তির বর্ণনায় কবি ৩৭টি ছত্র লইয়াছেন। যখন দুইটি পদার্থ ভিন্ন প্রকৃতির হয়, অথচ সেই আপাত পার্থক্যের মধ্যেও একটি গূঢ় ঐক্য থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে উপমা চলিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা দরকার উপমার আতিশয্যে তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিকৃত না হইয়া যায়। এখন, সমুদ্র ও পৃথিবী এই দুটি পদার্থকে মাতা ও কন্যার সকল ভাবভঙ্গীতে কিছুদূর পর্য্যন্ত বর্ণনা করা চলে, তাহার বেশি গেলে অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয়, অতি উপমার চাপে এই স্বাভাবিকত্ব কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু শেষাংশের দোষ ইহার চেয়েও গুরুতর। কবিতাটির প্রথমাংশ কল্পনা ও ভাবের যে উচ্চগ্রামে আরব্ধ হইয়াছে, পরিসমাপ্তিতে তাহা রক্ষিত হয় নাই। মধ্যমাংশে পৃথিবীর শিশু-কবি আদিম জননীর ভাষা যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছেন, এবং যখন ওই বিরাট্ জঠরে বিলীন হইয়া ছিলেন তখনকার কথা স্মরণ করিতেছিলেন। সমুদ্রে যেমন এক সময়ে মহাদেশ জাগিতেছিল, তেমনি তিনি অনুভব করিতেছেন, মানবহৃদয় সিন্ধুতলেও একটা বিরাট্ সৃষ্টি চলিতেছে, যদিও কবি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু দিতে পারেন না। অবশেষে কবি সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমার পৃথিবী পীড়ায় আজ পীড়িত, চক্ষে তাহার অশ্রু, ঘন ঘন

তাহার উষ্ণশ্বাস, সে তৃষিত, সে যেন বিকারের মরীচিকা-জালে পথ হারাইয়াছে, অতএব

অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্ত্বনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্দ্রের মতো;

পাঠক যখন আদি জননীর সান্ত্বনা-বাক্যের জন্য উৎসুক হইয়া ওঠে, তখন সে কি শোনে—

শান্তি, শান্তি,—ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা।

ইহা এমন কি সান্ত্বনার! অন্তত এমন তুচ্ছ সান্ত্বনা আদিম জননীর যোগ্য নহে। প্রথম হইতে পাঠকের মনে যে ঔৎসুক্য ও আশা জমিয়া উঠিতেছিল, দুর্ব্বল পরিসমাপ্তিতে তাহা একেবারে ভাঙিয়া না পড়িলেও পাঠককে বড়ই নিরাশ করিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক শ্রেষ্ঠ ও দীর্ঘ কবিতা শেষাংশে এই রকম একান্ত দুর্ব্বল। দেউল, বিশ্বনৃত্য, পুরস্কার প্রভৃতি কবিতার আলোচনা বাহুল্য বোধে করা হইল না, এ গুলিও উপরি-উক্ত মূল ভাবের অন্তর্গত।

(২)

কবির প্রতিভার মূল দুইটি ধারার একটির আলোচনা করিলাম; কবি যাহাকে বলিয়াছেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আসক্তি এবং সুখদুঃখপূর্ণ অসম্পূর্ণ মানবের প্রতি ভালবাসা; দ্বিতীয় ধারাটিকে কবি বলিয়াছেন—একটি Despair ও Resignationএর ভাব। ইহা সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা; ইহা মানুষের অসম্পূর্ণ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ Ideal লোকের দিকে কবিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

সোনার তরীর শেষতম নিরুদ্দেশ যাত্রায় ইহার আভাস। গোড়ার কবিতার মত এটিতেও সোনার তরী, সেই নদী, কেবল তাহাতে নাবিকাটি অপেক্ষাকৃত মনোরম। কিন্তু এ তরী সোনার ধান, অর্থাৎ মানুষের যেটুকু পূর্ণতা, Ideal, বহন করিয়া অসম্পূর্ণ মানুষকে ফেলিয়া রাখিয়া যায় না। এ তরী স্বয়ং অসম্পূর্ণ কবিকে নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্য্যের আদর্শ-লোকে বহন করিয়া লইয়া যায়। মানুষের সংসারের দিকে এ তরীর গতি নয়, ইহার লক্ষ্য—

ঊর্ম্মি-মুখর সাগরের পার,
মেঘ-চুম্বিত অস্ত-গিরির
চরণ তলে।

এ তরীর যাত্রীর চোখে পড়ে—

পশ্চিম পানে অসীম সাগর
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।

মনে আশা হয়—

আছে কি হোথায় নূতন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে।

ইহার লক্ষ্য একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতায়—

স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি
তিমির তলে।

ইহার লক্ষ্য সৌন্দর্য্যলোক, নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্য্যলোক, এবং নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণলোক। গোড়ার কবিতাটি হইতে ইহা মূলত ভিন্ন।

আকাশের চাঁদ ও পরশ পাথর দুটি কবিতাই এই এক ভাবকে প্রকাশ করিতেছে। একজন অপ্রাপ্য আকাশের চাঁদের সাধনায়, আর একজন দুষ্প্রাপ্য পরশ পাথরের সন্ধানে জীবনের সহজ-দুর্লভ ছোটখাট আনন্দগুলিকে মাটি করিয়া দিল। জীবনকে অতিক্রম করিয়া একটা অলৌকিক আদর্শের সাধনায় ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া জীবনের শেষে হঠাৎ একদিন পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া দেখে, কি ভুল তাহারা করিয়াছে। জীবন কত সুন্দর, কিন্তু সুযোগ চলিয়া গেলে তাহা কত দুর্লভ! তাহারা আর আকাশের চাঁদ চাহে না, পরশ পাথর চাহে না, জীবনের ক্ষণিক অমরতার স্বাদের জন্য তখন তাহাদের ব্যাকুলতা।

পথিকেরা এসে তাহারে শুধায়
'কে তুমি কাঁদিছ বসি?'
সে কেবল বলে নয়নের জলে
'হাতে পাই নাই শশী।'

দ্বিতীয় শ্লোকে সংসারের মধুরতার বর্ণনা—

এই পথে গৃহে কত আনাগোনা
কত ভালোবাসাবাসি,
সংসার সুখ কাছে কাছে তার
কত আসে যায় ভাসি,
মুখ ফিরাইয়া সে রহে বসিয়া
কহে সে নয়ন-জলে,—
তোমাদের আমি চাহি না কারেও
শশী চাই করতলে।

কিন্তু—

শশী যেথা ছিল সেথাই রহিল
সেও বসে এক ঠাঁই।
অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশি বাকি নাই।

তখন দেখিল, জীবন সুন্দর, পৃথিবী সুন্দর, প্রেম দুর্লভ, তখন-

নিশ্বাস ফেলি রহে আঁখি মেলি
কহে ম্রিয়মাণ মন,
শশী নাহি চাই, যদি ফিরে পাই
আর বার এ জীবন।

তখন—

দেখিল চাহিয়া জীবন পূর্ণ
সুন্দর লোকালয়

* * *

দেখে বহু দূরে ছায়াপুরীসম
অতীত জীবন রেখা

* * *

সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথা সে চলিল ভেসে।
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবি-শশীহীন দেশে।

পরশ-পাথরের ট্রাজেডি আরও করুণ! সে যে-স্পর্শমণির সন্ধান করিতেছিল, কোন্ অনবহিত ক্ষণে তাহার স্পর্শও পাইয়াছিল, কিন্তু অভ্যাসের জড়তায় তাহাকে চিনিতে না পারিয়া রক্ষা করিতে পারে নাই। হঠাৎ এ ভুল যখন ধরা পড়িল,

সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব্ব পথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে হারানো রতন
* * * *
অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষু বুঁজি
স্পর্শ লভেছিল যার একপল ভর,
বাকি অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ-পাথর।

এই ক্ষ্যাপাকে সন্ন্যাসী বলা হইল কেন? কারণ সে জীবনের চরম আনন্দকে লাভ করিবার জন্য ভুল পথ ধরিয়াছিল। জীবনের সাধনা সন্ন্যাসের সাধনা নয়, সেই জন্যই তাহার এই ব্যর্থতা।

এ দুইটি কবিতাতেই জীবনকে অতিক্রম করিয়া নিরুদ্দেশ Ideal-লোক খুঁজিবার ব্যর্থতা কবি দেখাইয়াছেন। বুদ্ধিতে ইহার ব্যর্থতা কবি বুঝিলেও জীবনে ইহার হাত সম্পূর্ণভাবে তিনি এড়াইতে পারেন নাই।

মানস-সুন্দরী রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এটি বাস্তব ও আদর্শ দুই লোকের মধ্যে উভচর। কবির প্রেয়সী, কল্পনা ও বাস্তব রাজ্যের গোধূলি-আকাশের দিক্‌প্রান্তশায়িনী সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ তারকা; কখনো সে পৃথিবীর দীপ, কখনো বা আকাশের তারা। কখনো সে একটি বিশিষ্ট নারী-মূর্ত্তিতে ধরা দেয়, আবার কখনো মূর্ত্তি দীর্ণ করিয়া বিশ্বের সৌন্দর্য্যলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। বাস্তবলোকে—

কার এত দিব্যজ্ঞান,
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ—
পূর্ব্বজন্মে নারী-রূপে ছিলে কিনা তুমি
আমারি জীবন-বনে সৌন্দর্য্যে কুসুমি
প্রণয়ে বিকশি।

আদর্শ লোকে—

বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।
ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে গন্ধ বাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজ চারি ধার।
গৃহের বণিতা ছিলে টুটিয়া আলয়
বিশ্বের কবিতারূপে হয়েছ উদয়—;

এ কবিতাটিতে কবির যুগ্ম ধারার দ্বন্দ্ব বেশ ফুটিয়াছে। কবি যাহাকে নিতান্ত ব্যক্তিগত করিয়া গৃহলক্ষ্মী করিয়া উপভোগ করিতে চান্, কোন্ অদৃষ্টের উপহাসে সে বারংবার ব্যক্তিগত এই বাস্তবতাকে উচ্ছেদ করিয়া নৈর্ব্যক্তিক রূপ গ্রহণ করে; গৃহের লক্ষ্মী নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী হইয়া ওঠে।

হৃদয়-যমুনাতেও এই একই সুর। এক হিসাবে ইহা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ত্রুটিহীন। নিজেকে উপভোগ করিবার সমস্ত আয়োজন ইহাতে পরিপূর্ণতম। কবির হৃদয় হইতেছে যমুনা, তাহা আবার কূলে কূলে পূর্ণ, তাহাতে আবার—

আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে,

দুই তীর নির্জ্জন এবং মেঘের যবনিকায় আচ্ছন্ন। এমন যমুনায় কেবল একটিমাত্র সে। ইহাতে কবি 'নিখিল বন্ধন খুলে' আপনার কল্পনায় আপনি মগ্ন। যমুনার ধীর গম্ভীর একতান তরঙ্গধ্বনি প্রতি শ্লোকের পাঁচটি করিয়া এক-শব্দক মিলে সুন্দরভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। যমুনার বৈচিত্র্যহীন তরঙ্গধ্বনি, বর্ষার অবিরল ঝর্ঝর, মেঘযবনিকায় আচ্ছন্ন একীভূত বিশ্ব এবং কবির অন্য সমস্ত-ভোলা একটিমাত্র ব্যাকুল বাসনা, সমস্তই ছন্দের ও মিলের monotony-র দ্বারা চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে।

হৃদয়-যমুনাতে প্রেমের সূচনা ও পরিণাম সুকৌশলে দেখানো হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে শুধু ভরিয়া লইবে কুম্ভ। যেন হৃদয়-যমুনার জল কুম্ভ ভরিবার জন্যই, গৃহ-কাজের জন্যই; প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো আবশ্যক যেন তাহার আর নাই। প্রেমের সূচনা তো এই রকমেই। সঙ্কোচে সাধ্বসে প্রথম পরিচয়, মৃদু মৃদু আধ আধ ভাষণ—'তল তল ছল ছল, কাঁদিবে গভীর জল!' অর্দ্ধ শঙ্কিত, মৃদু

কম্পিত পায়ে আগমন—নূপুরের রিণিকি ঝিনিকি মাত্র। প্রেমিকের হৃদয়ে গভীর জল, কিন্তু তার শব্দটি প্রায় নীরবতার মতই—তল তল ছল ছল। আর একজনের হৃদি-সংলগ্ন কুম্ভ শূন্য, কিন্তু তার পা-দুখানিও চলে কিনা চলে—নূপুর রিণিকি ঝিনি।

দ্বিতীয় শ্লোকে, প্রথম শ্লোকের সে প্রথম পরিচয়ের সঙ্কোচ খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। কলস ভরিবার কথা আর মনে নাই। এখন—

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে,

এ জলে আর গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইবার নয়। এ যমুনার সমস্ত আবশ্যক যেন, এমনি নীরবে, আত্মবিস্মৃত হইয়া তীরে বসিয়া থাকিবার জন্যই। সেই আত্মবিস্মৃতার ছুটি কালো আঁখি দিয়া মন কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার অঞ্চল যে কখন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনেও নাই। যে প্রয়োজন-সাধনের জন্য তাহার আগমন, সে প্রয়োজন ওই ভাসমান কলসের সঙ্গেই কোথায় ভাসিয়া গেল।

তৃতীয় শ্লোকে দেখি—কলস পূর্ণ করাও নহে, কলস ভাসাইয়া বসিয়া থাকাও নহে। প্রণয়ী যুগলের সম্বন্ধ নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। এখন—

যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো, হেথা
গহন তলে।

সামাজিক লজ্জাসরমের কথা আর তেমন করিয়া মনে পড়ে না,

নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ

কিন্তু এখনো লজ্জা সম্পূর্ণ যায় নাই, তাই

ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।

আর—

সোহাগ তরঙ্গ রাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি

চতুর্থ শ্লোকে—উভয় সত্তা এক হইয়া গিয়াছে—আর কোনো ভেদ চোখে পড়ে না।

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে!

প্রেমের পরিণামে এক সত্তা সম্পূর্ণভাবে আর একটির মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। ইহার তল নাই, তীর নাই, ইহা মৃত্যুর মতই শান্ত এবং স্নিগ্ধ এবং সুগভীর। ধরিত্রীর দিনরাত্রির দ্বারা ইহা অপরিমেয় এবং সূচনায় যে গীত গান ছিল তাহাও কখন নীরব হইয়া গিয়াছে। জীবনের সকল বন্ধন এবং গৃহের সকল কাজ, আজ তাহার কোথায়।

এই জীবন অতিক্রমকারী নিরুদ্দেশ লোককে অহৈতুক বিষাদের রাজ্য বলা যাইতে পারে। ইহা হৃদয়ে একটি অসীমতার ভাব জাগাইয়া দেয়। প্রকৃতির বিষাদের চিত্র চিত্তে বিষাদময় নিরুদ্দেশ লোককে জাগ্রৎ করিয়া তোলে। এক হিসাবে ইহা সৌন্দর্য্য লোকও বটে, কারণ জীবনের অসম্পূর্ণতা ক্ষুদ্র খণ্ডতা ইহাতে নাই।

ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূর বিস্তৃত সমতল ভূমি আছে এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই জন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম বৈরাগ্য আবিষ্কার করতে পেরেছে,—এই জন্যে আমাদের পূরবীতে কিংবা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের হা হা ধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারো ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেটা কর্ম্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায়নি; পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জ্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে, তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে। [ছিন্ন পত্র, ১৮৯১, ৪৬ পৃঃ] আবার—

আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্ত্তী আকাশের সঙ্গে কী একটি স্নেহভারবিনত মৌন ম্লান মিলন। অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড চির বিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধ্যা বেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কী একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়, সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটি ভাষাপূর্ণ নীরবতা। [ছিন্ন পত্র, ১৬৭; ১৮৯২]

এখন, সোনার তরীর মাঝি, নিরুদ্দেশ যাত্রার অপরিচিতা ইহারা কে? এবং ইহারা একই ব্যক্তি কিনা? যদি ইহারা এক ব্যক্তি হয়, তবে এ কে? এবং মানস-সুন্দরীতে যাঁহার উল্লেখ সে-ই বা কে?

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হ'য়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী। দশদিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি

কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে? সৌন্দর্য্য পাথারে
যে বেদনা-বায়ু ভরে ছুটে মনতরী,
সে-বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল;
অভয় আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই; বিশ্বাস বিপুল
জাগে মনে—আছে এক মহা উপকূল
এই সৌন্দর্য্যের তটে, বাসনার তীরে
মোদের দোঁহার গৃহ।

এই কর্ণধার কে? বর্ণনা দেখিয়া মনে হয় নিরুদ্দেশ যাত্রার নাবিকা এবং এ ভিন্ন নহে। বাস্তবিক পক্ষে, এই তিন চিত্রই এক ব্যক্তির, এবং এ কবির জীবনদেবতা।

চিত্রাতে জীবনদেবতার কথা স্পষ্ট করিয়া চিত্রিত, সোনার তরীতে অস্পষ্টভাবে তাহার পূর্ব্বাভাসপাত। বর্ত্তমান গ্রন্থে জীবন-দেবতার আকৃতি ও প্রকৃতি কবির নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে নাই; তাই সোনার তরীর জীবনদেবতা ছায়াসার এবং তাঁহার ক্রিয়াপদ্ধতিও অত্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট। চিত্রাতে জীবনদেবতা কি আকার লাভ করিয়াছেন এবং কবির জীবন ও কাব্যের কতখানি তিনি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন তাহা যথাস্থানে দেখিব। বর্ত্তমানে জীবনদেবতা কেবল কবির কবিতা ও কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী—

আজন্ম সাধন-ধন সুন্দরী আমার
কবিতা কল্পনা-লতা।

কখনো বা তিনি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সত্তা—

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হ'তে মর্ত্ত্য ভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যায় কনক বর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; ঊষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবন খানি,

আবার কখনো বা তিনি সোনার তরীর মাঝি হইয়া কবির জীবনের সাধনার ফসল বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। ফল কথা, সোনার তরীর জীবন-দেবতা কবির সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়া বসেন নাই, তাঁহার সম্বন্ধে কবির অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ও সচেতন নহে। সেই জন্যই সোনার তরীতে তাঁহার পরিচয় এমন ভাসা-ভাসা, খণ্ডশ, তাহা কোনো একটি বৃহৎ রূপের অন্তর্গত হইয়া অখণ্ড, এক ও সচেতন হইয়া ওঠে নাই।

(৩)

সোনার তরীর কয়েকটি কবিতাকে আমরা রূপকথার পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি: বিম্ববতী, রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে, নিদ্রিতা, সুপ্তোত্থিতা। এই ধারাটি 'কড়ি ও কোমল' হইতে সুরু; তাহার উপকথা, বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, সাতভাই চম্পা এই পর্য্যায়ের। পরবর্ত্তী কাব্যের ভ্রষ্ট লগ্ন, সব পেয়েছির দেশের অভিজ্ঞতা গভীরতর ও ইঙ্গিত সুদূরতর প্রসারী হইলেও উহাদের ঠাটটি রূপকথার। বর্ত্তমান কাব্যে ইহাদের মূল্য রূপকথার মারফতে কবির নিজের শৈশবকে পুনরায় উপভোগ করার চেষ্টায়।

(৪)

সোনার তরীতে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা আছে, হিং টিং ছট্। এই ধারাটিও পূর্ব্ববর্ত্তী মানসী হইতে সুরু। মানসীর বঙ্গবীর, ধর্ম্ম প্রচার, নববঙ্গ দম্পতীর প্রেমালাপ বিদ্রূপাত্মক। পরবর্ত্তী কাব্যের উন্নতি-লক্ষণ এই পর্য্যায়ের। "এক দিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর এক দিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস।" কবি চিত্তের এই দ্বন্দ্বের একটি দিক্ এই সব কবিতা প্রকাশ করিতেছে।



চিত্রা

সোনার তরীতে কবিপ্রতিভার যে দ্বন্দ্ব ও যে পরিণামের দিকে প্রাগ্রসর গতি দেখিলাম, চিত্রাতে তাহা পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত কবির প্রতিভা সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকা পর্য্যন্ত এই পরিণামের দিকেই ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়াছে। কল্পনা, কথা ও কাহিনী ও নৈবেদ্য-এ তাহা একটা মোড় ফিরিলেও মূলত সে সব কাব্য এই মূল ধারার অন্তর্গত। এই ভাবটি মনে রাখিলে চিত্রা, চৈতালি ছুর্কোধ্য লাগিবে না।

চিত্রাতে কবির প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বৃক্ষ-জীবনের মত দুই দিকে প্রসার লাভ করিতেছে। এক দিকে তাহা আপন ব্যক্তিত্বের নব নব দ্বার মোচন করিতেছে, অপর দিকে বিশ্বকে, নানা দিক্ হইতে, সমাজ, রাজনীতি, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব নানা ভাবে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে।

এই কাব্যের প্রথম কবিতার নাম চিত্রা। কবিতাটিতে দুইটি ধারার আভাস আছে। এক দিকে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে,
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

আবার—

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।

যে-সত্তা সমগ্র বিশ্ব নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া বিরাজিত, তাহাই আবার অন্তর্লোকে শাশ্বতরূপে একাকিত্বে উদ্ভাসিত। যাহা বাহিরে শব্দে, গন্ধে, বর্ণে এবং অসংখ্য ছন্দভঙ্গীতে ইন্দ্রিয়গ্রামকে অধিকার করিয়া আছে, তাহাই অন্তরে ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া, দেশ ও কালের অতীতরূপে কেবলমাত্র মানসবৃন্তে পরম বিস্ময়ে প্রস্ফুটিত। ইহাই চিত্রার মূল সুর।

ইহাতে কতকগুলি কবিতা আছে, যাহাতে কবি ব্যক্তিগত জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, প্রেম ও অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছেন। আবার কতকগুলিতে

ব্যক্তিগত জীবনের দিক্‌ রেখা অতিক্রম করিয়া যে-বৃহৎ সংসার বিরাজ করিতেছে, যে-সংসারের সহিত কবির পরিচয় অল্প, কিন্তু যাহাকে জানিবার ঔৎসুক্য তাঁহার অল্প নহে, সেই বৃহৎ জীবন-যাত্রার প্রতি ব্যগ্র আকুতি। এই দুই শ্রেণী ব্যতীত কয়েকটি কবিতা উপরি-উক্ত দুই ভাবরাজ্যের সীমান্তশায়ী; সেগুলিতে কখনো একটি কখনো বা অপর ভাবের আধিক্য। এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে, পূর্ব্বে যাহাকে আমরা সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশলোক বলিয়াছি, আর এখানে যাহাকে ব্যক্তিগত জীবনের রহস্যলোক বলিতেছি, ইহারা অভিন্ন নয়। বৃহৎ মানবজীবনধারা হইতে কবি যখনই পলাতক হইয়াছেন, তখন তিনি এই ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করিয়াছেন। ব্যক্তিগত রহস্য ও নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য্য-লোক, দুই-ই আত্মগত, দুই-ই কবিকে মানব-সংসার হইতে দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

১

এখন প্রথমে আমাদের বিচার্য্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে? রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে-সমস্ত দুরূহ আলোচ্য আছে, তন্মধ্যে জীবনদেবতা প্রধান।

প্রথমে স্বীকার করাই শ্রেয় যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বা অন্তর্য্যামী কবিতাকে আমরা কাব্য হিসাবে উচ্চাঙ্গ মনে করি না। কবির চিন্তাধারা ও তত্ত্ব ব্যাখ্যার দিক্‌ দিয়া কবিতা দুইটির বিশেষ মূল্য আছে। আমরা সেই হিসাবেই এ দুটিকে বিচার করিব।

জীবনদেবতা কি? জীবনদেবতা আর যাহাই হউক, ঈশ্বর নহে। পৃথিবীর দুইটি গতি আহ্নিক ও বার্ষিক; একটির দ্বারা সে চব্বিশ ঘণ্টায় নিজের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হয়, অন্যটির দ্বারা তিনশ পঁয়ষট্টি দিনে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে; আবার এই দুইটি গতি পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। আপাতদৃষ্টিতে আহ্নিক গতি বিচ্ছিন্ন হইলেও, সেই বিচ্ছিন্নতা, খণ্ডতা, অবশেষে এক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন জপমালায় আবর্ত্তিত হইতে হইতে বার্ষিক গতিকে সম্পূর্ণ করে। মানুষেরও দুইটি জীবন; একটি ব্যক্তিগত, অপরটি বিশ্বের আব্রহ্মস্তম্ব সমগ্র জীব অণুপরমাণুর সহিত একাত্ম; এই খানেই জীবনরহস্যের দ্বন্দ্ব। একস্থানে আমি আমার 'অহং'কে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের আর সকলের হইতে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। আবার অন্যত্র এক প্রকাণ্ড ইতিহাসের মধ্যে একত্র বিধৃত। ইহা স্বতবিরোধী হইলেও পরম সত্য। জীবনদেবতা এই ব্যক্তিগত জীবনের অধিষ্ঠাতা, তিনি বিশ্বদেবতা নহেন। পৃথিবীর খণ্ড আহ্নিক গতির মত মানুষের এই বিচ্ছিন্ন জীবন বহু পূর্ব্বজন্মের এবং বহুতর পরজন্মের দ্বারা একটি অখণ্ড জীবন-স্রোত গাঁথিয়া তুলিতেছে। সেই অখণ্ডতার দেবতা বিশ্বদেবতা।

কাজেই দেখা যাইতেছে, জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা এক না হইলেও পরস্পর সংবদ্ধ, যেমন সংবদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত জীবন, যেমন সংবদ্ধ পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক আবর্ত্তন। আবার এই জীবনদেবতা আছেন বলিয়াই মানুষের খণ্ড ও অখণ্ড জীবন এক পরম সমন্বয়ের সূত্রে সংযুক্ত হইয়া উঠিতেছে, নহিলে এই খণ্ড খণ্ড জীবনগুলি সূত্রহীন পুষ্পের ন্যায় মাল্য রচনা না করিয়া ঝরিয়া পড়িত। ফলতঃ জীবনদেবতা, ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে সামঞ্জস্যের সেতু। জীবনদেবতা-তত্ত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং কবিও সচেতন, এবং সৌভাগ্যক্রমে তিনি 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

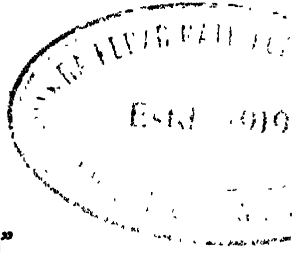
"আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্ত্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। * * তাহাদের প্রত্যেকের [কবিতার] যে-ক্ষুদ্র অর্থ-কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে-অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—

[illegible]

এ কি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই ?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। * * কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র; তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য্য বর্ত্তমান।

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে
* * *
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মত।"



কবি এখানে ব্যক্তিগত কথা বলিতেছিলেন, কি জাদু মন্ত্রে তাহা বিশ্বের হইয়া উঠিল। কবি নিজেই বিস্মিত—

যে-কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে-ব্যথা বুঝিনি জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।

শুধু যে কবিকে অতিক্রম করিয়া আর একজন নিভৃতচারী কবি বিরাজ করিতেছেন তাহা নয়। "সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্য্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন।"

যেমন কবির ব্যক্তিগত কথার মধ্যে কাহার ইচ্ছায় বৃহত্তর জীবনের আভাস ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি আবার দেখিতে পাই গৃহমুখী কবিকে টানিয়া আনিয়া বিরাট্ সংসারের বিচিত্র পথের উপরে কে দাঁড় করাইয়া দিল।

"একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই।

এই যে কবি যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া, বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না, আমি জানি অনাদি কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া

তিনি আমাকে আমার এই বর্ত্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন; সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।" কবির একখানি চিঠিতে পাই—"নিজের প্রবহমাণ জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে' দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখ্‌তে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চল্‌ছি, এইটেকে একটা বিরাট্ ব্যাপার বলে বুঝ্‌তে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্ত আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাক্‌তে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেই জন্যই এই জ্যোতির্ম্ময়শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে' নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পার্‌ত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম? * * আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎ প্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ, গন্ধ, গীত। চতুর্দ্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত কর্‌ছে, কথাবার্ত্তা দিন-রাত্রিই চল্‌ছে।"

"যে জীবনদেবতা 'রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি' তাহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত—

ওহে অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম?

তখন মনে কেবল এই প্রশ্নই ওঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি, আমার উপরে যে প্রেম, যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোন শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না?

আপনি বরিয়া লইয়াছ মোরে
না জানি কিসের আশে!
লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত
আমার নর্ম্ম আমার কর্ম্ম
তোমার বিজন বাসে!

"এখন যদি এমন হয় যে বর্ত্তমান জীবনের দ্বারা জীবনদেবতার সেবার সম্ভাবনা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তবে তিনি ইহজীবনের এই ভস্ম-শেষ আবর্জ্জনাকে ফেলিয়া দিবেন, কিন্তু যে জ্যোতিঃ-শিখা ইহার অন্তরে তাহাকে মরিতে দিবেন কেন?

এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ,
যা-কিছু আছিল মোর?

*　　*　　*

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নব রূপ, আন নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির পুরাতন মোরে,
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন ডোরে।

"নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে, যে-আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কাল মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।" [বঙ্গভাষার লেখক, ১ম খণ্ড]

২

সোনার তরীতে যে-সব ছায়াপাতের কথা বলিয়াছি, এখানে তাহা গভীরতর হইয়াছে। সেখানে যাহা আভাসমাত্র ছিল কবি এখানে আসিয়া তাহাকে জীবনের অধিষ্ঠাতা, জীবনদেবতারূপে দেখিলেন। একটি কথা ভুলিলে চলিবে না, এই ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর জীবনকে দুই কোঠায় স্বতন্ত্র করা যায় না। আলোচনার সুবিধার জন্যই কবিতাগুলিকে দুই ভাগ করা, আবার আলোচনা করিতে গিয়াই দেখিতে পাইব, এমন ভাগ চলে না, একটার মধ্যে আর একটার আভাস। ব্যক্তিগত জীবন কখন অকস্মাৎ বৃহত্তর জীবনের উদারতা লাভ করিতেছে আবার বৃহৎ জীবনের মধ্যেও ব্যক্তিগত জীবনের পরম ঘনিষ্ঠতা।

জীবনদেবতা যেমন ব্যক্তিগত দেবতার বন্দনা, প্রেমের অভিষেক তেমনি বন্দনা

"ব্যক্তিগত জীবনের পরম রমণীয় মাহাত্ম্যের। সংসারের প্রাত্যহিক আবর্ত্তের মধ্যে—

আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন, সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার, কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ ;

কিন্তু যখনি এই তুচ্ছ ক্ষুদ্র জীবন তোমার স্পর্শ-রসে রসিয়া ওঠে, অমনি—

আমি জ্যোতিষ্মান্,
অক্ষয় যৌবন মম দেবতা সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
* * *
সেথা মোর সভাসদ্,
রবিচন্দ্র তারা,

সেই পরম স্পর্শে ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করে—ক্ষুদ্র মরজীবন অমর হইয়া প্রেমের অমরাবতীতে চিরন্তন প্রণয়ী যুগ্মের সহিত একাসনে বিরাজ করিতে থাকে।

এই প্রেয়সী কে ? ইহাকে জীবনদেবতা বলিলে অত্যন্ত ফিকা করিয়া দেওয়া হয়। ইহা একান্ত সুনিশ্চিত যে কোনো ব্যক্তি বিশেষের স্মৃতিই কবিকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে, কিন্তু ইহাও আবার তেমনি সুনিশ্চিত যে সেই স্মৃতির সহিত বহুল পরিমাণে জীবনদেবতার ভাবটি মিশিয়া গিয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, ব্যক্তিগত জীবন ও প্রেম দেখিতে দেখিতে বৃহৎ জীবন ও প্রেমে পরিণত হইয়া যায়। সীমাকে ও অসীমকে দুই কোঠায় কেমন করিয়া বাঁধিয়া রাখা চলে। কবির ভাষাতে—"আমি জড় নাম দিয়ে, সসীম নাম দিয়ে, কোনো জিনিষকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ" জড়কে জড়, সীমাকে সসীম করিয়া তিনি রাখেন নাই, ইহা মনে করিলে বুঝিতে পারা যাইবে কেমন করিয়া একটি সন্ধ্যার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাঁহার কল্পনায় লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার পৃথিবীর কুমারী-দিবসের বিস্মৃত-স্মৃতি জাগরিত হইয়া উঠিল।

ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ননিমেষে
কত যুগ যুগান্তের অতীত আভাস
কত জীব জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।

সেই বাল্য নীহারিকা, প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা, এবং অবশেষে স্নিগ্ধ শ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে জীবধাত্রী জননীর কাজ, এই সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া সুপ্ত বিশ্ব-পরিবার গগনমণ্ডলে নিঃসঙ্গিনী ধরণীর অন্তর হইতে যে সুগম্ভীর ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর উঠিতেছে, তাহাও কবির প্রাণে প্রবেশ করিতেছে।

জীবনদেবতার ভাবটি কবির জীবনের নানারসের অভিজ্ঞতার সহিত মিলিয়া বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের রসে মিশ্রিত হইয়া মানসসুন্দরী কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে। চিত্রাতেও এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা আছে। জীবনদেবতা কবিতাও এক হিসাবে প্রেমের বিকাশ কিন্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে জীবনদেবতাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত। এবার যে কবিতাগুলির আলোচনা করিব তাহাতে ব্যক্তিগত প্রেম জীবন-দেবতার ছায়াসম্পাতে অলৌকিক হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রে ও প্রভাতে কবিতাটি। প্রেয়সী নিশীথে একান্তভাবে কবির, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত, বিশ্বের পটভূমি হইতে ছিন্ন হইয়া একজনের বাহুবন্ধনে সে প্রেয়সীমাত্র, সখীমাত্র। কিন্তু প্রভাতে তাহার আর এক অপূর্ব্বমূর্ত্তি, সে যেন তেমন ঘনিষ্ঠভাবে একজনের মাত্র নয়, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তখন তাহাকে দর্শন।

> দেবি, তব সীঁথি-মূলে লেখা
> নব অরুণ-সিঁদুর রেখা,
> তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
> তরুণ ইন্দুলেখা।

প্রাতঃকালে প্রেয়সী দেবী, বিশ্বের সহিত সে একাত্ম, তাই তাহার সীঁথির সিঁদুরে সূর্য্যের অরুণরাগ এবং হাতের শঙ্খে তরুণ চন্দ্রের আভাস অসম্ভব ব্যাপার নহে।

> রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
> তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি,
> প্রাতে কখন্ দেবীর বেশে
> তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
> আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
> দূরে অবনত শিরে।

রাত্রে যে রমণী প্রাণেশ্বরী, প্রভাতের পুষ্পলাবী সেই নারীই দেবী, তখন আর তাহাকে বলিবার উপায় নাই—

ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।

তখন আর না বলিয়া উপায় নাই যে—

সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে।

প্রিয়জনকে এই দুইভাবে দেখিবার আভাস সোনারতরীতেও আছে "দেবতারে প্রিয়করি, প্রিয়েরে দেবতা।" উৎসব ও সান্ত্বনা কবিতা দুটিও ব্যক্তিগত প্রেমের দ্বারা উদ্বোধিত।

কোনো কোনো কবিতায় কবির কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী কাব্যলক্ষ্মীর ভাবের সহিত জীবনদেবতার ভাবটি মিশিয়া গিয়াছে। মুস্কিল এই যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন্ কবিতায় কোন্ ভাবটি কি পরিমাণে মিশিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করা যায় না। আবেদন কবিতাটিতে কবি বহুজনবাঞ্ছিত পার্থিব ঐশ্বর্য্যের লোভ ত্যাগ করিয়াছেন, প্রার্থনা তাঁহার অতি সামান্য, "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।" সাধনায় কবির কাব্যসাধনার কথা। জগতের বহু গুণী অনেক অর্ঘ্য অনেক যন্ত্র, অনেক গান দেবীর সভায় উপস্থিত করিয়াছে। এই গুণীর সভায় কবি তাঁহার ব্যর্থ সাধনা লইয়া উপস্থিত; মনে আশা আছে, সকলের নিকটে অবজ্ঞাত হইয়াও যদি দেবীর প্রসাদ লাভ করেন তবে তাঁহার সাধনা নিষ্ফল হইবে না। আর একটি কবিতা নীরব তন্ত্রী, কবির বীণার একটি তার নীরব। যে-তারটিতে—

আমার হৃদয় বনের
যত মধুকর
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধ্বনিয়া তুলিত
গুঞ্জন স্বর

সেই শ্রেষ্ঠ তারটি কবি দেবীর চরণে রাখিয়া আসিয়াছেন তাই—

এ বীণায় বাজে না কেবল
একখানি তার
আছে তাহা শুধু মৌন মহৎ
পূজা উপহার।

কিন্তু যেখানে জীবনদেবতার ভাবের সহিত অন্য কোনো ভাবের মিশ্রণ ঘটে নাই, সে সব কবিতা কাব্যহিসাবে উচ্চদরের নহে। অন্তর্যামী ও জীবনদেবতার আলোচনা উপলক্ষ্যে ইহা বলিয়াছি—আর একটি উদাহরণ সিন্ধুতীরে কবিতাটি। সিন্ধুতীরের রমণী জীবনদেবতা ছাড়া আর কেহ নহেন। কবি এ কবিতায় যে অলৌকিক রহস্য সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সফল না হইবার একটি কারণ. ইহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খ তুচ্ছ বিষয়ের বর্ণনার বাহুল্য। রহস্যের প্রধান রস অজানার ভাব; এখন এই ভাব সৃষ্টি করিতে গেলে বর্ণনীয় বিষয়ের মধ্যে ফাঁক রাখিয়া যাইতে হয়—পাঠক সেই ফাঁকগুলি কতক কল্পনায়, কতক আভাসে ভরিয়া তুলিয়া রহস্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু কবি যদি নিজেই উপযাচক হইয়া সমস্ত ফাঁকগুলি ভরিয়া দেন, তবে অজানা কিছুই থাকে না, পাঠকের মনে রহস্যের ভাব মোটেই উদ্রিক্ত হয় না। কীট্‌সের সেই দুইটি ছত্র—একটি বাতায়ন, সম্মুখে অপার ফেন-দুরন্ত সমুদ্র। বাস্, আর কিছুই নয়! পাঠকের মন নানা কল্পনায়, নানা আভাসে ইঙ্গিতে অমনি সেই রহস্যলোক নির্ম্মাণ করিতে লাগিয়া যায়।

দ্বিতীয় কারণ, কবিতাটি পড়িতে পড়িতে স্পষ্ট অনুভব করা যায়, কবির মনে একটা কিছু তত্ত্ব অত্যন্ত জাগ্রৎ এবং কবি সে সম্বন্ধে একান্ত সচেতন। নর্ত্তকী যখন নাচে, কিছু অলঙ্কার, কিছু পরিচ্ছদ, সে দেহে বহন করে; তাহাও কতক্ষণ, যতক্ষণ তাহা নাচের সহিত তাল রাখিতে পারে; কিন্তু নৃত্যকে যদি বিজ্ঞাপনের সহায় করা হয়, ঐ উপলক্ষ্যে অলঙ্কার ও বস্ত্রের নমুনা নর্ত্তকীর অঙ্গে চাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে জিনিষের কাট্‌তি বাড়িবার সম্ভাবনা থাকিলেও বারংবার তাল কাটিয়া যায়। অযথা অতিরিক্ত পরিমাণে তত্ত্ব এই কবিতাটিতে চাপানো হইয়াছে।

তৃতীয় কারণ, কেবল জীবনদেবতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়া কবি উচ্চাঙ্গের কাব্য সৃষ্টি এখানে করিতে পারেন নাই। যে কয়টি কবিতা একমাত্র জীবনদেবতার দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ, তাহাদের অন্য মূল্য থাকিলেও কাব্যমূল্য বেশি নহে। উচ্চাঙ্গের কাব্য সৃষ্টির জন্য অন্য কোনো রসের উদ্বোধন তাঁহার প্রয়োজন; যেমন প্রেম, দেশপ্রীতি, কাব্যসাধনা ইত্যাদি।

এবারে আমরা বৃহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা যে কবিতাগুলিতে স্পষ্টরূপে আছে, তাহাদের আলোচনা করিব। স্বর্গ হইতে বিদায়। যে স্বর্গ হইতে কবি বিদায় প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা নিজের কল্পনার বিশ্ববিহীন সুখৈকরস স্বর্গ। সুখের আয়োজন যেখানে সম্পূর্ণ, কিন্তু কিছুদিন বাস করিলেই অন্তরাত্মা বিরক্ত হইয়া ওঠে। এই রকম এক সুখসর্ব্বস্ব স্বর্গ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কবি

মানসীর জীবন হইতে ছুটিয়া পালাইয়া ছিলেন। শিলাইদহের সোনার তরীর জীবনে, বৃহত্তর সংসারের বার্ত্তা মাঝে মাঝে দূর হইতে পঁহুছিলেও বস্তুত তখনো তিনি সেই স্বর্গেরই অধিবাসী। স্বর্গের অবিমিশ্র সুখে মানুষ দীর্ঘকাল তৃপ্তি পায় না; নিবিড় সুখের মধ্যে থাকিয়াও তাহার মনে ব্যাকুলতা জাগিয়া ওঠে, এই ব্যাকুলতা বৃহত্তর জীবনের জন্য। সুখ যেখানে অবিমিশ্র নয়, আরাম সেখানে স্বল্পই কিন্তু মানুষের মুক্তিও সেইখানেই নিহিত।

স্বর্গে তবে বহুক অমৃত,
মর্ত্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেম ধারা, অশ্রুজলে চির শ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

পৃথিবীতে সুখ দুঃখ দুই-ই আছে, সেই তো তাহার গৌরব, বস্তুত, স্বর্গে সুখ আছে কিন্তু আনন্দ নাই, আনন্দ একান্ত ভাবে পার্থিব। পৃথিবীতে পূর্ণতা নাই, কেবল তাহার আভাস; এই ভাবটি সোনার তরীর দরিদ্রা অক্ষমা প্রভৃতি কবিতায় আছে। 'ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলির' পরিচয় কবি শিলাইদহের পল্লীজীবনে প্রথমে পাইয়াছিলেন। পৃথিবীর দীনতা ও মানব জীবনের অসম্পূর্ণতার মাধুর্য্যই এই কবিতার চরম রস।

স্বর্গ হইতে বিদায়ের, বিশেষ রস যেমন সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতা, উর্ব্বশীর বিশেষত্ব সৌন্দর্য্যের পরম পরিপূর্ণতায়। ইহাতে সৌন্দর্য্যকে একেবারে বিশ্বের পটভূমিতে স্থাপন করা হইয়াছে। উর্ব্বশী তুমি, "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ,"—সে মানস সুন্দরীর খেলার সঙ্গিনী, সখী, গেহিণী নহে, সে রাত্রে ও প্রভাতের প্রাণেশ্বরীও নহে। এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের কোনই পূর্ব্বাপর, কোনই ইতিহাস নাই। সে—

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী।

এই সৌন্দর্য্য যেমন সমস্ত মনুষ্য-সম্পর্কের বাহিরে, তেমনি আবার ইহা সমগ্র কালেরও অতীত—

যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী

এই সৌন্দর্য্য যতই পরিপূর্ণ, যতই দেশকালাতীত হউক না কেন, তবু ইহার মধ্যে কোথায় যেন একটুখানি অশ্রুর আভাস আছে। নতুবা এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যও আমাদের

তৃপ্তি দিতে পারিত না, এই যে একটুখানি খুঁৎ—ইহাতেই এমন সৌন্দর্য্যের শেষ রক্ষা হইয়াছে। বিজয়িনীতেও ঠিক এই ভাবটি। অচ্ছোদ সরসীনীরে স্নানার্থিনী সমস্ত মানব সম্পর্কের অতীত। এমন যে অক্ষোভনীয় রমণীয়তা তাহাকে কামনার সামগ্রী বলিয়া চিন্তা করাই চলে না কাজেই –

পুষ্প ধনু পুষ্প শর ভার
সমর্পিল পদ প্রান্তে পূজা উপচার।

ইহাতে যেমন সৌন্দর্য্যকে জীবন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিবার প্রয়াস, ১৪০০ শাল কবিতায় কবি নিজের জীবনকে বর্ত্তমান কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্ণিমা কবিতা। কবি পূর্ণিমা রাত্রে দীপালোকে বসিয়া সৌন্দর্য্যতত্ত্ব পড়িতে পড়িতে বিরক্ত হইয়া যেমনি প্রদীপ নিভাইয়া দিলেন অমনি—

উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্ত দ্বারে বাতায়নে, চতুর্দ্দিক হ'তে
চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি।

একটি ক্ষুদ্র শিখা বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্যকে আড়াল করিয়া রাখে। সেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জীবনের কথা। ক্ষুদ্র বৃহতের অনুবর্ত্তী না হইলে এই রকমটি ঘটে।

সোনার তরীতে আকাশের চাঁদ নামে একটি কবিতা আছে। ইহাতে কবি অত্যন্ত একটা অবাস্তব আকাশের চাঁদের জন্য জীবনটাকে মাটি করিতে বসিয়াছিলেন, কিন্তু চিত্রার সুখ কবিতাতে বুঝিতে পারিলেন—

মনে হ'ল সুখ অতি সহজ সরল।

মানুষের চারিদিকে যে সুখে দুঃখে পূর্ণ জীবন আছে, আকাশের চাঁদ হইতে কবির দৃষ্টি নামিয়া, সহজ আনন্দে পূর্ণ, সেই জীবনের প্রতি পড়িয়াছে।

৩

এবার ফিরাও মোরে বৃহৎ জীবনের জয় গানে অভিষিক্ত। আমাদের দেশের জনসাধারণ যে কত দরিদ্র, কত অসহায়, কত শিশুর মত, এবং সেই জন্যই তাহাদের প্রতি কবির আগ্রহ, সহৃদয়তা ও শ্রদ্ধা কেমন, তাহার

অনেক পরিচয় ছিন্ন পত্রের পত্রে পত্রে আছে। একটি স্থান উদ্ধার করিয়া দিলাম।

ঘরে ঘরে বাত ধরচে, পা ফুলচে, সর্দ্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরচে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদচে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারচে না, এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য্য, দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থানে কি সহ্য হয়? সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে উপদ্রব করে আসচে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। [ছিন্ন পত্র, ২০২]

সম্মুখে যখন "কষ্টের সংসার, বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার," তখন কি বিমুখ হইয়া কবি আপনার কল্পনার কুঞ্জে বাস করিতে পারেন, জীবনের বিচিত্রতার জন্য যাহার স্বাদ, পরিপূর্ণ জীবনকে উপলব্ধি করা যাঁহার আদর্শ, তাঁহার নিকটে কল্পনার রাজত্ব যতই দুর্লভ হউক না কেন, শুধু তাহাতে তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। এই রকম এক অতৃপ্তির তাড়নাতেই একদিন তিনি গাজিপুরের মানসীর নিকুঞ্জ বিলাস ত্যাগ করিয়া শিলাইদহের কর্ম্মঘন জীবন বরণ করিয়া লইয়া ছিলেন। কবি কল্পনার কুঞ্জ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু কল্পনাকে নহে। কারণ—

এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি।

যে দিব্য কল্পনা একদিন তাঁহাকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের নন্দনলোকে ঊর্ব্বশীর সমীপে লইয়া গিয়াছিল, সেই কল্পনাই তাঁহাকে শতদুঃখে জীর্ণ সংসারের মধ্যে, একেবারে সংসারের আত্মার মধ্যে লইয়া চলিয়াছে। ইহাই কবির কর্ম্ম-প্রয়াণ। কাজের লোক তথ্য অবলম্বন করিয়া সংসারের সুখ দুঃখের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া মরে, কবি কল্পনার সাহায্যে একেবারে তথ্যের অন্তরশায়ী সত্যের সন্ধান লাভ করেন।

কবি জমিদারি পরিচালনা করিতে গিয়া দেশের লোকের প্রকৃত জীবনের পরিচয় পাইলেন, সে জীবন কত অভাবের দ্বারা ক্ষীণ, এবং বৃথা অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ। আপনার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে আরামে থাকা যায়, কিন্তু তাহা তো নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া, সত্যভাবে নিজেকে জানিতে হইলে বৃহত্তর জীবনের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধটি জানা আবশ্যক। তাই—

কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে তবে তাই কর আজি দান।

কবি তো উঠিয়া আসিলেন, কিন্তু এত রকম অভাবের মহামারীর মধ্যে কি তিনি দান করিবেন। কোনো তুচ্ছ দান নহে; প্ল্যান, দরখাস্তবৃত্তি কিছুই নহে। একটা আত্মবিস্মৃত জাতিকে আত্মবিশ্বাস দান করার মতো আর কি বড় কাজ আছে? সত্য কথা বলিতে কি আর কি-ই-বা তাহাকে দেওয়া যায়। এই আত্ম-বিশ্বাসের উদ্বোধন করিবার সঙ্কল্পই তাঁহার সমস্ত সামাজিক, রাজনীতিক সন্দর্ভগুলির প্রাণ। একবার এই আত্মবিশ্বাস জাগরিত হইলে, কোনো প্ল্যান বা প্রোগ্রামের জন্য বাধে না। উহা যে কোন লোক দিতে পারে, কিন্তু আত্মশক্তিতে বিশ্বাস, এক কথায় প্রাণ একমাত্র দিতে পারেন কবি।

এখন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগাইয়া দিবার কি উপায়? উপায় আর কিছু নহে। একবার অতীত-বিমূঢ় জাতির সম্মুখে বৃহৎ পৃথিবীর বাতায়নটা খুলিয়া যাক, সে দেখুক, জীবনের সেই সব অকুতী দুঃখাভিসারী মহাপুরুষের দল, কেহ বা স্বেচ্ছায় "পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা বিষয়ে বিরাগী" কেহ বা "মৃত্যুর গর্জ্জন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।" কাহাকেও বা "বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে।" যে মহা আদর্শের জন্য এত দুঃখের সহন, এত কঠোরতার বহন, সেই অত্যুচ্চ আদর্শের ছায়াখানিও যদি একবার এই আত্মবিমূঢ় জাতিটার চক্ষে প্রতিভাসিত হইয়া ওঠে, তবে আর ভয় নাই। এই মহা আদর্শকে কবি কর্ম্মীর দৃষ্টিতে এমন কি সাধকের দৃষ্টিতেও দেখেন নাই। তিনি কবির দৃষ্টিতে এই আদর্শকে দেখিয়াছেন, কাজেই এই মহা আদর্শ এখানে সৌন্দর্য্য-প্রতিমা; বিশেষভাবে ইহার সৌন্দর্য্যের দিক্‌টাকেই দেখানো হইয়াছে। জীবনের উচ্চতম ধারণা সৌন্দর্য্যরূপে কবির ধ্যাননেত্রে প্রকাশিত।

এই যে আইডিয়া, ইহা কেবল একটা সৌখীন কবি-কল্পনামাত্র না হইয়া কবির নিকটে কঠোর সত্যরূপে দেখা দিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা সমসাময়িক গদ্য-প্রবন্ধ-গুলিতে পাই। "এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখ" এবং "এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুক" অন্তর বাহিরের তাড়ায় অস্থির; একদিকে সামাজিক আচার-সর্ব্বস্ব শাস্ত্রের বন্ধন, বাহিরে নানাপ্রকার ছোট বড় রাজার আস্ত্রিক তাড়না, এই দুইজাতীয় অত্যাচারে দীন দরিদ্র প্রজাগণ লাঞ্ছিত। কিন্তু এই দুই রকম অত্যাচারের মূল এক। প্রজাদের আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস। আর কিছুই নয়, একবার শুধু—

> ডাকিয়া বলিতে হবে
> মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে।

একবার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগিলে—

তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মত সঙ্কোচে সত্রাসে যাবে মিশে।

১৩০২ সালে কবি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে চরিত্রচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিদ্যাসাগরকে অটল মনুষ্যত্বের, অচল আত্মবিশ্বাসের আদর্শস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন।

"আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মত দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-বীর্য্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব, এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

কবি দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী করি মানুষ করনি।

কিন্তু বিদ্যাসাগরকে তিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম-স্বরূপ দেখিয়াছিলেন—

"মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্ম্মা যেখানে চারকোটি বাঙালী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুই একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কবির চক্ষে—এই দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্ম্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ব্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। [বিদ্যাসাগর-চরিত, ১৩০২ সাল]

বিদ্যাসাগর তো হইলেন, পূর্ণ মনুষ্যের আদর্শ। এখন দেখা যাক,—এই তার্কিক জাতির নিষ্ফল তর্কপ্রিয়তা সম্বন্ধে কবির কি মত। তর্কের দ্বারা ছোটকে বড়, বড়কে নিরর্থক প্রমাণ করা যায়, এবং প্রমাণ করা যায় যে একিলিস ও কচ্ছপের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবে কচ্ছপই জয়ী।

"কিন্তু এই কুতর্কে তার্কিক অসীমভগ্নাংশের হিসাব ধরিয়াছেন, কড়া ক্রান্তি দন্তি কাকের দ্বারা তিনি ঘরে বসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কচ্ছপ চিরদিন অগ্রবর্ত্তী থাকিবে। কিন্তু এদিকে প্রকৃত কর্ম্মভূমিতে একিলিস একপদক্ষেপে সমস্ত কড়া ক্রান্তি দন্তি কাক লঙ্ঘন করিয়া কচ্ছপকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।"

আমাদের এই কচ্ছপ-স্বভাব-সুলভ-দেশে বিদ্যাসাগর কুতর্কচ্ছেদী একিলিস। এই অপরিমিত বন্ধন ও তর্কের ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে—

সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্য্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াক্কড় করাতে, ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ কড়াকড়ি করিতে গিয়া আমরা মানসিক যে স্বাধীনতা না থাকিলে পাপপুণ্যের কোন অর্থই থাকে না, সেই স্বাধানতা বলি দিয়া নাম মাত্র পুণ্যকে তহবিলে জমা করিয়াছি।

[আচারের অত্যাচার সমাজ, ১২৯৯]

উক্ত গ্রন্থের সমুদ্র যাত্রা প্রবন্ধেও এই একই কথা আছে। আমরা মানসিক স্বাধীনতা হারাইয়াছি বলিয়াই "তর্কটা এই লইয়া যে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া কোন কথা নহে।"

দেশের সাধারণ মানবজীবনের প্রতি একটা ঔৎসুক্য ধীরে ধীরে কবির মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, সেই তাগিদেই তিনি এই সময়ে ছেলে-ভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ ছড়াগুলিকে তিনি ঐতিহাসিকের হাতে সংগ্রহ করেন নাই, রসগ্রাহীর মন লইয়া করিয়াছিলেন। কিন্তু এগুলি যে-জীবনের প্রতিচ্ছবি সেই সরল শিশুসুলভ পল্লীবাসিদের প্রতি একাত্মকতা অনুভব না করিলে এ ছড়াগুলি কখনই তাঁহার ভাল লাগিতে পারিত না।

এবার ফিরাও মোরে কবিতায় যে আগ্রহাতিশয্য কেবলমাত্র কাব্যরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, উদ্ধৃত প্রবন্ধাংশ হইতে সেই ঔৎসুক্যের অপেক্ষাকৃত নিরেট গদ্যমূর্ত্তি পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কি নিজের অন্তর্লোক, কি নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য্যের লোক (দুই-ই অভিন্ন, কারণ এ দুই-ই বৃহৎ সংসার হইতে কবিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, এবং উভয়েরই রস পরিপূর্ণতার রস) হইতে মানবের বাস্তব জগতে বাহির হইয়া পড়িবার চেষ্টাই

রবীন্দ্রনাথের কাব্য। সোনার তরীতে এ চেষ্টা আভাসমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল, এখানে তাহা আকাজ্ক্ষার রূপ লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রকৃত সংসারের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়াতে কোন্ জাতীয় কাব্যবস্তু কবির প্রতিভার অনুকূল তাহা কবি ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছিলেন। মানসী পর্য্যন্ত যে কবির কাব্য অপরিণত তাহার প্রধান কারণ প্রতিভার অনুকূল কাব্যবস্তু কবি সব সময়ে ধরিতে পারেন নাই। প্রতিভা তখনই বেশ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, সমসাময়িক, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জ্জন, রাজা ও রাণী প্রভৃতি নাটকগুলিতে তাহা পরিস্ফুট।

সোনার তরীতে প্রথমে তিনি নিঃসংশয়িত ভাবে অনুকূল কাব্যবস্তুর সাক্ষাৎ পাইলেন এবং ক্রমে নৈবেদ্য পর্য্যন্ত তাহা অধিকতর আয়ত্ত হইতে লাগিল। তারপরে কয়েক বৎসর, কোন্ দুষ্টগ্রহের অভিশাপে, অনুকূল কাব্যবস্তু হইতে কবি বিচ্যুত বলাকায় পুনরায় পুরাতন কাব্যবস্তু নূতনভাবে ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে।

চৈতালি

চৈতালি কাব্যখানি কবির চৌত্রিশ হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের লেখা। সোনার তরী ও চিত্রায় পদ্মার যে রূপ দেখি, ইহাতে পদ্মা সে পদ্মা নয়। ইহার পদ্মা বর্ষার নহে, শীত-শেষের; এখানে বর্ষার উদ্বেলতা স্তিমিত হইয়া শীতের শান্তি ও চৈত্রের শ্রান্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নহে; কবি এখানে আসল পদ্মা ত্যাগ করিয়া শাখা নদী বাহিয়া লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। চৈতালিতে ছোট নদীর সুর—যাহার কলগর্জ্জন তীরভূমির লোকালয়ের কণ্ঠধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় না; যাহার এপারে ওপারের তরুপল্লব ছুঁই-ছুঁই করে; যাহার উভয় কূলের প্রতিবেশীদের মধ্যে ঘাটে আসিয়া অনায়াসে কথাবার্ত্তা চলে;—ইহা আত্মীয়তার তরল সূত্র বিশেষ। ইহাতে নীর হইতে তীরের প্রাধান্য অধিক; লোকালয় এখানে লক্ষ্য—জলাশয় নহে। কবি নিজের অন্তর্লোক হইতে বাহির হইয়া এখানে জন-সমাজের সহিত প্রেম ও জ্ঞানের সূত্রে মিলিত হইতেছেন। জ্ঞান ও প্রেম এই দুই অংশে হৃদয়ের পরিপূর্ণতা। মানুষের প্রতি প্রেমের পরিচয় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যে দেখিয়াছি কিন্তু জ্ঞানযোগের অভাবে যে-প্রেম শূন্য ছিল এইবার তাহার আভাস দেখিয়া স্পষ্ট মনে হইতেছে কবির প্রতিভা সম্পূর্ণতার দিকে চলিয়াছে।

চৈতালিতে কবি শুধু যে লোকালয়ের সহিত ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হইতে পারিয়াছেন—তাহা নহে; এতদিন তিনি পদ্মার বক্ষে থাকিয়াও পদ্মাকে নিকটতম ভাবে পান নাই—তাহাকে তিনি যথার্থভাবে লাভ করিলেন, এইখানেই। বড় নদী যেন একখানা মহাকাব্য—তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না; শাখা নদী যেমন একখানা লিরিক কবিতা—দুইবার আনা-গোনা করিলেই মুখস্থ হইয়া যায়। কবির কথাই শোনা যাক—

"পদ্মার মত বড় নদী এতই বড় যে, সে যেন ঠিক মুখস্থ ক'রে নেওয়া যায় না, আর এই কেবল ক'টি বর্ষামাসের দ্বারা অক্ষর-গোনা ছোট বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ ক'রে আমার হ'য়ে যাচ্ছে। পদ্মা নদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইচ্ছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী;—তার শান্ত জল-প্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্ম্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্ছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী"—শুধু তাই-ই নহে একান্ত ভাবে ভালবাসিবার নদীও ইহা-ই। ফরাসী লেখক

জুবেয়ারের একটি বচন আছে ভগবান এতই বিরাট যে তাঁহাকে খণ্ড করিয়া না লইলে আমরা ধারণা করিতে পারি না। নদী সম্বন্ধেও এই এক-ই কথা। কবি এই শাখা নদীতে আসিয়াই পদ্মাকে প্রেয়সী রূপে সম্বোধন করিতে পারিয়াছেন। নদীতীর ও নদী উভয়ের সঙ্গেই তার সম্বন্ধটি এখানে ব্যক্তিগত।

শ্রেণীগত হিসাবে চৈতালি পূর্ব্বের কাব্য দু'খানি হইতে স্বতন্ত্র নহে—কেবল ইহা ঐ দু'খানি গ্রন্থ হইতে খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা কেবল সামান্যত সত্য ছিল—এখানে তাহা বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ছিল "ভূতলের স্বর্গ খণ্ড গুলি"র জন্য আকাঙ্ক্ষা, এখানে তাহার পরিচয়।

ইহাতে পূর্ব্বের ভাবের আবেগ, কল্পনার মাধুর্য্য, আসক্তির তীব্রতা কিছুই নাই তবু ইহা, পরিপূর্ণতা ও পরিপক্বতার গভীর মাধুর্য্যে স্নিগ্ধ ও কর্ম্মাবসানের সার্থকতায় নীরব।

সেই কারণেই চৈতালির ভাবের বাহন সনেট। লিরিক কবিতা উদ্বাহিত নদীর স্রোতের মত—তাহাতে তীব্রতা আছে, আবেগ আছে, তাহার প্রধান ধর্ম্ম দ্রুতি বা চলতা। তাহা দিয়া চৈতালির আসক্তিহীন ভাবগুলি প্রকাশ করা চলে না। লিরিক যদি প্রবাহিত নদীর স্রোত, সনেট সেই নদীর হিম-কঠিন তুষার, নিতান্তই স্থিতি-ধর্ম্মী। তাহাতে সুবিধা এই—সনেট বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া, রহিয়া বসিয়া, অবসরমত লেখা চলে—তাহাতে লিরিকের ত্বরা নাই। সনেট স্থপতি-বিদ্যার সগোত্র, লিরিক সগোত্র সঙ্গীতের। সেই জন্য যাঁহারা শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি—সঙ্গীত যাঁহাদের বাহন, দ্রুতি বা চলতা যাঁহাদের ধর্ম্ম তাঁহারা অনেক সময়ে উচ্চদরের সনেট রচয়িতা নহেন, যেমন, শেলী, সুইনবার্ণ, রবীন্দ্রনাথ। চৈতালির ভাবের অনেকটা মন্থর ভাব, তাহা বর্ষার পদ্মার মত অত্যন্ত সচল নহে, শীত-শেষের পদ্মার ন্যায় অনেকটা স্তিমিত—কাজেই সনেট এখানে স্বভাবতই ভাবের বাহন হইয়া পড়িয়াছে। একই কারণে নৈবেদ্য কাব্যও সনেটবহুল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ সনেট-লিখিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার কাব্য স্থাপত্যের ন্যায় স্থিতিশীল—তাহা যেন খণ্ড খণ্ড শ্বেত পাথরের দ্বারা গঠিত অখণ্ড একটি সুগঠিত অট্টালিকা। সনেটের গঠনের যে একটি অমোঘ নিয়ম-কৌশল আছে রবীন্দ্রনাথ সে দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন নাই—মিল ও শ্লোক-বিভাগ তাঁহার ইচ্ছাকৃত। মাইকেল এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান ও কৃতার্থ, কিন্তু আবার ভাববৈদগ্ধ্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত মাইকেলের কোনই তুলনা চলে না।

চৈতালিতে যে ব্যক্তিগত প্রেমের কবিতা আছে সেইগুলি এখন আলোচনা করিব। প্রথম কবিতাটি 'উৎসর্গ'—ব্যক্তিগত প্রেম ইহার বিষয় বস্তু হইলেও, এই কাব্যখানির মূল সুরটি ইহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটিতে

একটি আসক্তিবিহীন সার্থক সম্পূর্ণতার ভাব আছে—কাব্যখানিরও মূল সুর ইহা-ই।

আজি মোর দ্রাক্ষা কুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।

সোনার তরী ও চিত্রাতে যে অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস তাহা এই দ্রাক্ষাকুঞ্জের ফুলের মদির গন্ধে এবং সৌন্দর্য্যে, ভ্রমরের গুঞ্জনে এবং দক্ষিণ বাতাসের অকারণ চাঞ্চল্যে—সমস্ত কানন উন্মথিত। তাহাতে আসক্তির তীব্রতা এবং অসম্পূর্ণতার আসক্তি। কিন্তু এখানে দেখি—ফুলগুলির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ হইয়া—

রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

যতদিন ফুল ছিল, তাহা একান্ত ভাবে আমারই ছিল, আমাকে লইয়াই তাহার সার্থকতা—কিন্তু আজ তাহার সফলতা আমাতে নাই। আজ তুমি ইহা লইয়া কি করিবে; তাহা জানিতে চাহি না—তুমি খুসী হইয়া হাতে লইবে, ইহাই যথেষ্ট।

লুটে লও ভরিয়া অঞ্চল
জীবনের সকল সম্বল,
নীরবে নিতান্ত অবনত
বসন্তের সর্ব্ব-সমর্পণ;
*　　*　　*
শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেল বৃন্তগুলি,

এই নীরবে নিতান্ত অবনত প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত উদার ত্যাগের ভাব আছে—প্রেমের পরিণতির ত্যাগ—মানস-সুন্দরীর ঘনিষ্ঠ আসক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

এই তুমি কে, ইহা লইয়া নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। অনেকে জীবনদেবতা বলিয়া সহজে এবং সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন জীবনদেবতা বা ভগবানের মারফতে অনেক জটিলতা সরল করিয়া ফেলা যায়—কিন্তু রস-বোধ সন্তুষ্ট হয় না। এই তুমি যে কে, বাস্তবিক সে প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কবিও আর দিতে পারিবেন না। একটি কবিতা লিখিবার সময় কবির অন্তর্লোকে যে সহস্র ভাবের আলো-ছায়া পাত হইতে থাকে,

অজস্র স্মৃতি ও অসংখ্য নর-নারীর মুখচ্ছবি উদিত হইতে থাকে—সেই সমস্ত হইতে বিশিষ্ট একজনকে বাছিয়া নাম করা নিতান্তই অরসিকের কাজ। বহু দিন-রজনীর, বহু নর-নারীর, বহু স্মৃতি-বিস্মৃতির, বহু আশা-আকাঙ্ক্ষার, বহু ভাললাগার একত্র ঘনীভূত সমাবেশ—এই তুমি। সোনার তরীতে যেমন হৃদয়-যমুনা, চিত্রাতে যেমন চিত্রা, ১৪০০ শাল—চৈতালীতে তেমনি এই কবিতাটি—সর্ব্বপ্রকার ভ্রম-প্রমাদ ও ত্রুটি-বর্জ্জিত। রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে প্রধান দুইটি দোষ, সামান্য-কথন ও অতি-কথন—উভয় দোষ-বিমুক্ত ইহা একান্ত নিখুঁৎ। ইহাতে যে তুমি-র উল্লেখ আছে তাহাকে একটি মাত্র বিশেষণে রূপ দেওয়া হইয়াছে—"শুক্তিরক্ত-নখরে বিক্ষত।"

শুধু তাহাই নহে—বিশেষণের আলোকটি ওই লীলাচঞ্চল চম্পক-কলিকা-নিটোল-অঙ্গুলিটির উপরে ফেলাতে সমস্ত মূর্ত্তি, কেবল মূর্ত্তি নহে, মূর্ত্তির অন্তরে মনটি অবধি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এই 'শুক্তিরক্ত' বিশেষণটি শুধু নখর নহে, সুখাবেশে অন্যমনে বসিয়া দশন দংশনে ফলগুলি ছেদন করিতে করিতে বহু স্মৃতির প্রগল্ভতায় কপোলে যে ক্ষণিক দ্যুতি জাগিতেছে তাহারও আভাস দিতেছে। আবার রাগ হইতে রক্ত—সেই দিক হইতে দেখিলে—একটি মাত্র সুদূর বিশেষণের দ্বারা অনুরাগের ভাবটিও ইহাতে নাই—এমন কথা বলা চলে না। শেষের শ্লোকটিতে আছে—

সারাদিন অশান্ত বাতাস
ফেলিতেছে মর্ম্মর নিশ্বাস,
বনের বুকের আন্দোলনে
কাঁপিতেছে পল্লব-অঞ্চল।

ইহা কি শুধু বনেরই কথা! সমস্ত সুখকে অতিক্রম করিয়াও যে একটি অতৃপ্তি থাকিয়া যায়—তাহাতেই কি এই মর্ম্মর-নিশ্বাস পড়িতেছে না? এই মর্ম্মর-নিশ্বাস কি তাহার-ই নহে? সমগ্র বনের সার্থক পরিপূর্ণতা আপনার আয়ত্তে পাইয়াও কেন যে অতৃপ্তি ঘোচে না! অঞ্চল শব্দটিতে আর কাহাকেও নহে, এই অঞ্চলবতীকেই প্রকাশ করিতেছে। বনের বুকে সমস্ত ফসল ফলাইয়াও যে আকাঙ্ক্ষা রহিয়া যায়—তাহাতেই কি আন্দোলন নহে, আর সেই আন্দোলনেই কি অঞ্চলবতীর বুক কাঁপিতেছে না? কিন্তু অঞ্চল তো শুধু অঞ্চল নহে—তাহা 'পল্লব-অঞ্চল'। পল্লবের মতই কোমল, পল্লবের মতই অন্তরের মাধুর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া রহস্যময়। শেষের শ্লোকে কি কবি নিজেকেই বনের সহিত একাত্ম করিয়া ফেলেন নাই—বনের বুকের আন্দোলন—কবিরই বুকের; মর্ম্মর নিশ্বাস—তাঁহারই গভীর অতৃপ্তির। কবিতাটি আকারে ক্ষুদ্র বলিয়া পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়—কিন্তু ইহা রবীন্দ্রনাথের অতিশ্রেষ্ঠ কয়েকটি কবিতার অন্যতম।

'উৎসর্গ'সম্বন্ধে যাহা বলিলাম চৈতালির প্রেমের কবিতাগুলিতে তাহা প্রযুজ্য। উদ্দামতা কাটিয়া গিয়া যৌবন প্রায় শেষ হইয়া আসিল এমন একটা সকরুণ ভাব দেখা দিতেছে। কবিতাগুলি যেন গোধূলির ছায়াতে আচ্ছন্ন। তার পরে, পল্লীগ্রামের দুইটি রূপ আছে—এক বর্ষার পল্লী—খর স্রোতের দুর্দ্দামতাময়, আর এক শীত-শেষ ও চৈত্রের পল্লী—ক্লান্তি ও করুণায় ভরা। অন্তরে যেমন কবির যৌবনশেষের সকরুণ অবসাদ, বাহিরে আবার চৈতালির সময়কার সফল ক্লান্তি। এই কাব্যের আব্‌হাওয়া এমনিতরো ম্লায়মান।

'গীতহীন,' 'আশা,' 'স্বপ্ন,' 'পল্লীগ্রামে,' প্রভৃতি কয়টি কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায় প্রিয়ার স্মৃতি লইয়া-ই কবি সন্তুষ্ট, কারণ কোথাও কবিপ্রিয়ার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের কোনো চিহ্ন নাই। কিন্তু কবির প্রেয়সী—যে-সব কবিতায় স্বয়ং আবির্ভূতা—সেখানেও আর পূর্ব্বের তীব্রতা লক্ষিত হয় না—'অসময়ে' আছে—

এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া
বসন্ত কুসুম মালা এসেছ পরিয়া ;
* * *
তোমারে হেরিয়া তারা হ'তেছে ব্যাকুল,
অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল।

আর সে দুর্জ্জয় ভাবাবেগ নাই—কেবল 'অকালে ফুটিতে চাহে সকল মুকুল' এইটুকুমাত্র। 'গানে' কবিতাটিতে খানিকটা ভাবাবেগ আছে—কিন্তু তাহা 'হৃদয়-যমুনা,' বা 'মানস-সুন্দরী'র তুলনায় নিতান্তই ফিকা।

এই পর্য্যায়ে কতগুলি কবিতা নারীর সৃষ্টি এবং রহস্য বিষয়ে—তাহাতেও এই একই ভাব। মানস-সুন্দরী একান্ত ভাবে কবির কল্পনার ধন, নিজের সৃষ্টি; উর্ব্বশী কাহারো সৃষ্ট নহে, আপনাতে আপনি বিকশি' সে ফুটিয়াছে। এতদুভয়-ই অতিবাদ। কিন্তু এখানে দেখি ভাবকেন্দ্র বেশ মধ্যস্থতা লাভ করিয়াছে।

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।

মানব-সমাজের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হওয়াতে কবি বুঝিতে পারিয়াছেন—

অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।

এই যে সৃষ্টি ইহা মনেরও বটে, মানবেরও বটে, অন্তরেরও বটে, বহির্জগতেরও বটে, নহিলে সে কি এমন ভাবে উভয় লোককে মুগ্ধ করিতে পারিত।

তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হ'তে এসেছ বাহিরে।

বাস্তবিক নারীর রূপ বাহিরের কি অন্তরের মাঝে-মাঝে তাহাতেই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

নানা ভাবাধিক্যের ঘাত-প্রতিঘাতে কবির কল্পনা যে একটি দিব্য সমতা লাভ করিতেছে, অন্তর ও বাহিরের একটি সমন্বয় সন্ধান করিতেছে—এই কবিতাগুলি সেই পরিচয় বহন করে। এই রকম সমতা-দ্বারা কবি শুধু যে প্রিয়াকে সত্যভাবে জানিতেছেন—তাহা নহে, তাহাকে সত্যভাবে জানিতে গিয়া জগতেরও প্রকৃত রূপ জানিতে পারিলেন।

যখন তোমার পরে পড়েনি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।

গৃহলক্ষ্মী কোন্ মায়ামন্ত্র বলে জগৎ-লক্ষ্মী হইয়া উঠিল! সেই পুরাতন কথা! জড় ও জীবকে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎকে কবি বিভিন্ন কোঠায় ঠেলিয়া রাখিতে পারেন না। সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনা!

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

কেবল যে জগৎকে সত্যভাবে বুঝিতে পারা যায়—তাহা নহে, প্রিয়ার মুখপদ্মে স্বয়ং জগৎ-পতি আত্মরূপ দর্শন করিতেছেন—

নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্ব-ভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

(চৈতালিতে এক জোড়া কবিতা আছে—প্রথম চুম্বন ও শেষ চুম্বন। সন্ধ্যাকালে প্রেমিকযুগলের প্রথম চুম্বন, শেষ রাত্রে তাহাদের শেষ চুম্বন। প্রেমের এই ছবি দু'খানি একান্ত ভাবে প্রণয়ী-যুগলের হইলে তাহার কোনো সার্থকতা ছিল না—এই দু'টি ছবিকেই সন্ধ্যায় বিশ্ব ও প্রাতে সংসারের পটভূমিতে দেখানো হইয়াছে।

শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনিতে নক্ষত্রসভা এবং প্রণয়ীযুগল বুঝিতে পারিল—কেহই একক নহে, বৃহৎ একটা সংসার অদূরে রহিয়াছে এবং সকলেই এক পরিবার-ভুক্ত।

প্রভাতের কর্ম্ম-ঘন সংসার প্রণয়িযুগলকে বিচ্ছিন্ন করে বটে, কিন্তু সংসারে বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই প্রেম তো মধুর এবং সেই বিচ্ছেদের অন্তে সন্ধ্যায় চুম্বন এত নিবিড়।

মৃত্যু যে প্রেমকে মুছিয়া ফেলে না, মৃত্যুও যে জীবনের স্বাভাবিক একটা অঙ্গ—এ সত্যটা কবি এমন স্পষ্ট ভাবে ইতিপূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। জীবনের সহিত ঘনীভূত পরিচয়েই বিচ্ছেদকে, মৃত্যুকে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে বুঝিতে পারা গেল।

প্রথম মিলন-ভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাটমূর্ত্তি নিরখি মধুর।

ইহাতে সোনার তরীর প্রতীক্ষার ভীতি-বিহ্বল আকুলতা নাই।

সে ছিল আর একদিন এই তরী পরে,
কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল সুধাগীতি স্বরে।

কিন্তু—

আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্ খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়ানে।

এই ভাবনার উত্তরের খানিকটা আভাস যেন পাওয়া যায়—

যেন তার আঁখি দুটি নবনীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আজি অসীম আকাশে।

জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যে প্রিয়ার একদা-সংহত সৌন্দর্য্য পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

যে বৃহত্তর জীবনের আভাস ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি চৈতালিতে আসিয়া তাহা যে শুধু গভীরতর, পরিব্যাপ্ততর হইয়াছে এমন নহে, তাহাতে আরো দুটি নূতন ভাবের ধারা সংযুক্ত হইয়া প্রশস্ততা লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে এই বৃহৎ জীবনে দেশের দৈন্যদুঃখের জন্য কাতরতা লক্ষ্য করিয়াছি, ইহাকে দেশপ্রেম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাক্। আরো একটা ভাব লক্ষ্য করিয়াছি, সংসারে যাহা কিছু মহার্ঘ্য, মহামূল্য তাহাদের ক্ষণিকতায় এবং অসম্পূর্ণতায় কবির বৈরাগ্য উপস্থিত না হইয়া এই ক্ষণিক অসম্পূর্ণ জিনিষগুলিকে

নিবিড়তর ভাবে উপলব্ধি করিবার একটা আকাঙ্খা। এই দুইটি ভাবই এখানে আছে। দেশপ্রেমের স্রোতে কবি উজান বাহিয়া প্রাচীন ভারতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই মানস-ভ্রমণের অনেক পরিচয়—চৈতালিতে।

যে একাত্মকতা-বলে তিনি সংসারকে ভালবাসিয়াছেন—মানব-সমাজের প্রত্যন্ত প্রদেশে যে অবজ্ঞাত দীনতম দুর্ভাগার দল বসতি করে এবং যে জীবজন্তু তরুলতার জগৎ বর্ত্তমান—কবির আত্মভাব এতদুভয়ের প্রতি প্রসারিত হইয়াছে। অবশ্য এক হিসাবে, পশু পক্ষী তরুলতা প্রকৃতির অন্তর্গত, এবং প্রকৃতির প্রতি প্রেম নূতন নহে। কিন্তু এখানে তিনি ইহাদিগকে সেই প্রকৃতির অন্তর্গত করিয়া অর্থাৎ এক বৃহৎ ব্যাপারের অঙ্গ-ভাবে দেখেন নাই; তাহারা স্বতন্ত্র-ভাবে বিরাজ করিতেছে, যেন তাহারা প্রত্যেকে এই মানব সংসারেই নিম্নতর দিকের সোপানসমূহ; তাহাদের সম্বন্ধ প্রকৃতি হইতে যেন মানবের সহিত ঘনিষ্ঠতর—এই ভাবেই কবি তাহাদিগকে দেখিয়াছেন।

আরো একটি কথা—পূর্ব্বের দুইটি ধারা বিপুলতর হইয়া যে নূতন দুইটি ধারার সৃষ্টি করিল—তাহাদের আর নূতন বলা চলে কই! বিশেষত পূর্ব্বেও তাহাদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য ইহাদিগকে নূতন বলিয়াই ধরিয়া লইব—কেননা তাহাদের রূপ এমন স্পষ্ট হইয়া পূর্ব্বে দেখা দেয় নাই।

চৈতালিতে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়, পূর্ব্বে যাহা সামান্যত সত্য ছিল এখানে আসিয়া তাহা বিশিষ্টভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাবরূপ ব্যক্তিত্ব তখনই পায়, বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় যখন নিকটতর, প্রত্যক্ষতর, সত্যতর, হইয়া ওঠে। পূর্ব্বে কবির প্রেম ছিল মানবের জন্য, এখন তাহা সংহত, ঘনীভূত হইয়া ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথমটা মনে হয় ইহা যেন প্রেমের অবনতি, কিন্তু বাস্তবিক প্রেমের পরীক্ষাই তো ইহাতে; তত্ত্বলোকবাসী মানবকে ভালবাসা মন্দ নহে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রেমের দ্বারা তাহার যাচাই হওয়া দরকার। চৈতালির প্রেমের কবিতাগুলি পড়িলেই অনুভব করা যায়—কোনও মানস-সুন্দরী বা জীবন-দেবতার প্রতি সেগুলি লেখা নহে। এই কথা চৈতালির সবক্ষেত্রেই খাটে।

কবির মানব-প্রীতি এক পা অগ্রসর হইয়া মানব সমাজের অবজ্ঞাত শ্রেণীকে এবং আরো এক পা অগ্রসর হইয়া পশুপক্ষী এবং তরুলতাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে।

কবির যে-দৃষ্টি ইতিপূর্ব্বে উর্ব্বশীর মত ত্রিলোক-নন্দিনী ছবি আঁকিয়াছে—এখানে দেখি সেই দৃষ্টি, অতি সাধারণ, এবং অত্যন্ত সাধারণ বলিয়াই মনোযোগের দুয়োরাণীর মত যাহারা দিনাতিপাত করিতেছে, তাহাদের প্রতি করুণায় সজল। "সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা" তাহাদের কথা সকলেই জানে। "আরো আছে শত লক্ষ

অজ্ঞাত-নামিনী" তাহাদের কথা কেহই জানে না—আর একজন আছে যাহাকে জানিয়াও লোকে নাম করে না—"তারি মাঝে বসি আছে পতিতা রমণী"—কিন্তু কবির কাছে তিনি অবজ্ঞাত নহেন।

নারী পতিতা হইলেই নারীত্ব তাহার লোপ পায়—একথা কবি বিশ্বাস করেন না। তাহারও হৃদয়ে সন্তান-স্নেহ উজ্জ্বল—এবং নিজের সন্তান না থাকিলেও পরের সন্তানের মৃত্যুতে দুঃখ তাহার আপন সন্তান-বিয়োগের মতই সুতীব্র। "দোকানীর খেলা-মুগ্ধ ছেলে" গাড়ি চাপা পড়ার করুণ ক্রন্দন ধ্বনিতে সচকিত হইয়া কবি কি দেখিলেন—

ঊর্দ্ধপানে চেয়ে দেখি স্খলিত-বসনা
লুটায়ে লুটায়ে ভূমে কাঁদে বারাঙ্গনা।

রুগ্ন সন্তানের প্রতি জননীর সতর্ক মমত্ব কত সাধারণ এবং সেই জন্যই কত তুচ্ছ।

বয়স বিংশতি হবে, শীর্ণ তনু তার
বহু বরষের রোগে অস্থিচর্ম্ম-সার।

জননী তাহাকে কি যত্নের সহিত, সতর্কতার সহিত সেবা করিতেছেন। তাঁহার মনে কি আশা! সন্তানটিকে জননী পৃথিবীর জনতার প্রতি আসক্ত দেখিতে চাহেন—কেন না—

যদি কিছু ফিরে চায় জগতের পানে,
এইটুকু আশা ধরি মা তাহারে আনে।

"দিদি" কবিতাটিতে কেমন একটি সহৃদয় সকৌতুক ভাব। দিদির পিছনে ছোট ভাইটি আসিয়া, যতক্ষণ দিদি বাসন মাজে, সে স্থির ধৈর্য্য ভরে বসিয়া থাকে। এবং অবশেষে—

বাম কক্ষে থালি—যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশু কর; জননীর প্রতিনিধি
কর্ম্ম-ভারে অবনত অতি ছোট দিদি।

এ ছবি কবি নিশ্চয় সহস্রবার বোটে বসিয়া তীরে দেখিয়াছেন—তাঁহার সেই দেখা সত্য হইয়াছে বলিয়াই আমরা এমন করিয়া ছবিটি দেখিতে পাই এবং এমন কৌতুকপূর্ণ করুণায় আমাদের হৃদয় ভিজিয়া ওঠে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি চৈতালি কাব্যগ্রন্থ জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠতার পরিচয় বহন করে অর্থাৎ তাঁহার কাব্য ও জীবন নিতান্ত নিকটতম প্রতিবেশীর মত হইয়া

দাঁড়াইয়াছে—তাহাদের নৈকট্য এতই অধিক যে কাব্য অনেক সময় দৈনন্দিন ঘটনার সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র। একখানি চিঠিতে পাই—

মনে আছে সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম; সে এসে নিত্য নিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে। এই বলে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোছ করতে গেল। [ছিন্নপত্র, ১৮৯৫, পৃষ্ঠা ৩৩৮]

কর্ম্ম কবিতায় ভৃত্যটি তিরস্কৃত হইয়া বলিতেছে—

"কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোট মেয়ে।"
এত কহি ত্বরা করি গামোছাটি কাঁধে ধরি
নিত্য কাজে গেল সে একাকী।

ইতর প্রাণীর জগতের প্রতি যে সহৃদয়তার উল্লেখ করিয়াছি সেই সম্বন্ধে একখানি চিঠিতে আছে—

কাল আমি বোটে বসে' জানালার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দে'খি—একটা কি পাখী সাঁতরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে আর তার পিছনে মহা ধর্ ধর্ মার মার রব উঠেছে। শেষ কালে দেখি একটি মুরগী তার আসন্ন মৃত্যুকালে বাবুর্চ্চিখানার নৌকা থেকে হঠাৎ কি রকমে ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে অমনি যমদূত মানুষ ক্যাঁক ক'রে তার গলা টিপে ধরে আবার নৌকা ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বল্লুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ব—র পশু প্রীতি লেখাটা এসে পৌঁছল—আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য্য হলুম। আমার ত আর মাংস খেতে রুচি হয় না। * * * আমার বোধ হয় সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সর্ব্বজীবে দয়া। প্রেম হচ্চে সমস্ত ধর্ম্মের মূলভিত্তি। [ছিন্নপত্র, ১৮৯৪, পৃষ্ঠা ২৪৮]

কবির এই জীবে দয়া নিতান্তই হৃদয় হইতে উদ্ভূত—কোনো দার্শনিক মতবাদের ফলাফল নহে। ইহা তাঁহার স্বাভাবিক মানবপ্রেমের পরিণাম। এক জায়গায় পশুপক্ষী তরুলতা বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির সহিত অখণ্ড; সেখানে তাহারা বিস্ময় আকর্ষণ করে, করুণা বা সহৃদয়তা নহে, কিন্তু অন্য স্থানে

পাখীরাও যে কতকটা আমাদেরি মত—একটা জায়গা আছে যেখানে তা'তে আমাতে প্রভেদ নেই [উক্ত পত্র]

সেখানে ইহারা অত্যন্ত অসহায়। এই পশু-প্রীতি কবির হৃদয়ের স্বভাব—

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
জড়জন্তু সবা পানে নামিবারে চায়।

মানুষ হইতে জড়তম পদার্থটি একসূত্রে গ্রথিত কিন্তু বিবর্ত্তনের ফলে মাঝে মাঝে সেই সূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বুদ্ধি সেই ছিন্নসূত্র যোড়া দিতে পারে না—কিন্তু হৃদয়—

মাঝে মাঝে ভেদ চিহ্ন আছে যত যার
সে চাহে করিতে মগ্ন লুপ্ত একাকার।

এই ভাবটি ধরিতে পারিলে কবির পশুপক্ষী-প্রীতির সম্বন্ধটি সহজ হইয়া ধরা দিবে। পশুশিশু, নরশিশুর মধ্যে প্রবেশ শুধু ভাষার, শুধু পরিচয়ের—এই সূত্রটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাই—

দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে।

এই প্রীতি হৃদয়ের স্বভাব বলিয়া হৃদয় সহজেই পালিত মহিষকে পুঁটুরাণী বলিয়া ডাকিয়া ওঠে এবং বেদের মেয়ে কুকুরছানার সহিত নিজের ভাইয়ের মত খেলা করিতে পারে। বুদ্ধি দিয়া এই যোগ প্রমাণ করা চলে না, যখন অভিমানী ভেদজ্ঞানী বুদ্ধি হাসিতে থাকে তখন সহৃদয় কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে হয়—

কোন্ আদি স্বর্গলোকে সৃষ্টির প্রভাতে
হৃদয়ে হৃদয়ে যেন নিত্য যাতায়াতে
পথ চিহ্ন পড়ে গেছে, আজো চিরদিনে
লুপ্ত হয় নাই তাহা, তাই দোঁহে চিনে।

চিত্রার 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি' পদটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার। ভূতলের যে স্বর্গ তাহা খণ্ডশঃ এবং খণ্ডত্বেই তাহার বিশেষ রস। এই খণ্ড মুহূর্ত্তগুলির, খণ্ড আনন্দগুলির জয় গানে চৈতালির অনেক কবিতার প্রাণ। এক শ্রেণীর লোক আছেন, জীবনের এই ক্ষণিকতা ও ভ্রমপ্রমাদে, জীবনের প্রতি যাঁহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাঁহাদের বিপরীত।

এ রকম করে ভেবে দেখ্‌লে [জীবনের অনিত্যতাকে] কোনো কোনো প্রকৃতিতে বৈরাগ্যের উদয় হয়—কিন্তু আমার ঠিক উল্টোই হয় ; আমার আরো বেশি করে দেখতে, বেশি করে জানতে ইচ্ছা হয়। [ছিন্নপত্র]

যিনি জড়ে জীবে সীমায় অসীমে ভাগ করিয়া রাখিতে পারেন না, তাঁহার কাছে জীবন তুচ্ছ নয়, আর তাহা তুচ্ছ নয় বলিয়াই স্বয়ং জীবনেশ্বরকে জীবনের মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন। সব দেশেই একদল লোক আছেন যাঁহারা জীবনকে অতিক্রম করিয়া সত্যকে দেখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই দলের জীবনের মধ্যেই যাঁহারা সত্যকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, আপাত-তুচ্ছতা যাঁহাদের নিকট অনন্ত রহস্য পূর্ণ হইয়া ধরা দেয়।

এই জাতীয় লোকের নিকট জীবন দুর্লভ ; বৈরাগ্যপ্রধান ব্যক্তি যখন জীবনটাকে চোখ বুজিয়া পার করিয়া দিবার চেষ্টা করেন—তখন কবি বলিতেছেন—

দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।*

এ জীবনের ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত্তটিও যেমন ব্যর্থ নয়—তেমনি ইহার দীনতম প্রাণটিও অবহেলার নয়—তাই আজ যে লোকটার দিকে চাহিয়াও দেখিতেছি না—একদিন তাহার দিকেই সমস্ত জগৎ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া থাকিবে—

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম,
সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।

এ যেমন ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তটি এবং ব্যক্তিটির কথা বলিলাম—তেমনি পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-রাশি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে—জগতের অন্তঃশায়ী তত্ত্বের প্রতি কবির লোভ নাই, তিনি বলিতেছেন—

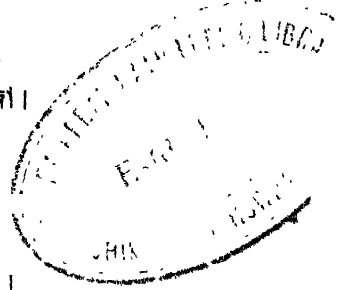
যে আলোক জ্বলিতেছে উপরে তোমার,
যে রহস্য দুলিতেছে তব বক্ষতলে,
* * *
এ জগতে কভু তার অন্ত যদি জানি,
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্তি যদি মানি
তোমার অতল মাঝে ডুবিব তখন,
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ।

যাহার কাছে জীবনের কোন অর্থই তুচ্ছ নহে, তিনি অবশ্যই জীবনেশ্বরকে খুঁজিতে সংসার ত্যাগ করিবেন না। ভক্ত তাঁহাকে খুঁজিতে সংসার ত্যাগ করিলে তিনি বলিয়া থাকেন—

হায়
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।

কিন্তু সংসারে থাকিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। বিশেষ কোনই পন্থা নাই, সংসারের কর্তব্য করিয়া ইহারই প্রেমে, প্রাণে, সৌন্দর্য্যে এমন কি ভ্রমে উদ্বুদ্ধ হইয়া—কারণ জীবনের রহস্য—

বড় শক্ত বুঝা;
যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।



ভগবান্ তো জীবনের মধ্যেই আছেন—

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।

কিন্তু এ কথা তো সকলে বোঝে না—সেই পণ্ডিতম্মন্য বিজ্ঞের দল জীবনটাকে মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া সমস্ত মনোযোগ ঐ মৃত্যুটার দিকেই আকর্ষণ করেন—এবং অন্তিমের ভয় দেখাইয়া মানুষের মন ভগবানের দিকে টানিতে চেষ্টা করেন। কবি ঐ শ্রেণীর লোককে মৃদু তিরস্কার করিয়া দুঃখের দিক্ হইতে আনন্দের প্রতি চক্ষু ফিরাইতে বলিতেছেন—

আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

চৈতালির বিশেষত্ব ইহাতে পূর্ব্বের ভাবগুলি অনেকটা পরিমাণে দানা বাঁধিয়াছে। পূর্ব্বে যে মানব-প্রীতি দেখিয়াছি—এখানে আসিয়া তাহা বিশেষ একটি দেশরূপ গ্রহণ করিয়াছে—সে দেশ তাঁহার স্বদেশ। এই স্বদেশ আবার প্রাচীন ও বর্ত্তমান দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ভারতের প্রতি মমত্ব-বোধ এমন প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহার কাব্যে ইতিপূর্ব্বে দেখা দেয় নাই। বর্ত্তমান ভারতের প্রতি মমত্ব-বোধ নানা আকারে তাঁহার গদ্যে ও পদ্যে আছে। তাঁহার মানব-প্রীতি যেমন ব্যাপ্ততর হইয়া ইতর প্রাণীর প্রতি ধাবিত হইয়াছে—তাঁহার দেশের বর্ত্তমান কালের প্রতি আগ্রহ হইতেই প্রাচীন কালকে জানিবার ঔৎসুক্য জাগিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের স্বভাবতই দুইটি জিনিষ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কালিদাস ও তাঁহার কাব্য এবং তৎকালীন সরল সৌম্য জীবন-যাত্রা। একটি অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত অপরটি আধ্যাত্মিকতার সরলতায় সংযত। পরবর্ত্তী কাব্যে দেখিতে পাইব—প্রথম ধারাটি বিস্তৃত হইয়া কল্পনার কল্পরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং শেষোক্তটি গভীরতর হইয়া নৈবেদ্যে পরিণত। কালিদাসের প্রতি যে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই—বাল্য হইতেই কালিদাসের কাব্য তিনি জানিতেন। ভারতীয় সাহিত্য-সভ্যতার দিগন্তরে যে সমস্ত মহাশিখর জাগ্রত—কালিদাস তাহাদের উচ্চতম। বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি যে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিকে অভিবাদন জানাইবেন ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

ঋতুসংহারে কালিদাস যে চরম ভোগের চিত্র আঁকিয়াছেন—তাহা যেন দীর্ঘ কাল তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই—বিশ্ব-বিস্মৃত ভোগের যে দারুণ পরিণাম তাহাই স্মরণ করিয়া যেন তিনি মেঘদূতের বিরহ-গাথা লিখিয়াছেন। কালিদাস একদিন বসিয়াছিলেন—

প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্য সিংহাসন পরে।

কিন্তু এই চরম সম্ভোগের মধ্যেই যে পরম অতৃপ্তি আছে তাহাই একদিন—

ঊর্দ্ধ হ'তে একদিন দেবতার শাপ
পশিল সে সুখরাজ্যে, বিচ্ছেদের শিখা
করিয়া বহন ;

একদিন যে—

ছয় সেবাদাসী
ছয় ঋতু ফিরে ফিরে নৃত্য করে আসি ;

তাহারা সেদিন—

ফেলিয়া চামরছত্র, সভাভঙ্গ করি
সহসা তুলিয়া দিল রঙ্গ যবনিকা—

মিলনের আনন্দের দিনে—সমস্ত বিশ্ব সঙ্কুচিত হইয়া একখানি বাসর-ভবনে পরিণত হইয়াছিল—সেখানে

নাই দুঃখ, নাই দৈন্য, নাই জন প্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রাণী।

কিন্তু যেমনি বিরহকালে ভোগীর দৃষ্টি নিজের দিক্ হইতে পৃথিবীর দিকে ফিরিল অমনি—

দেখা দিল চারি দিকে পর্ব্বত কানন
নগর নগরী গ্রাম ; বিশ্বসভা মাঝে
তোমার বিরহ-বীণা সকরুণ বাজে।

কালিদাসের কাব্য-সম্বন্ধে কবি পরবর্ত্তী কালে যে সমস্ত অনুপম রচনা লিখিয়াছেন, এই দুটি কবিতা সংক্ষেপে তাহার বীজ বহন করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের মতে—ঋতু-সংহার ও মেঘদূতে যে মিলন ও বিরহের বার্ত্তা আছে শকুন্তলায় যেন তাহা একত্র গ্রথিত।

দেশী বিদেশী সকল কবিদের মধ্যে কালিদাসের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া রবীন্দ্রনাথ উজ্জয়িনীর কবির নিকট নানা ভাবে ঋণী। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতকে উপলব্ধি করিয়াছেন সাধারণত দুইটি উৎস হইতে—উপনিষদ্ ও কালিদাসের কাব্য। কালিদাসও কবি, রবীন্দ্রনাথও কবি ; কালিদাসের কাব্য যেমন তাঁহাকে রস দান করিয়াছে—এমন আর কিছুতেই দেয় নাই এবং এই মহাকবির কাব্য হইতেই প্রাচীন কালের সভ্যতার, জীবনযাত্রার প্রকৃত আভাস লাভ করিয়াছেন।

প্রথমত ধরা যাক্—প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার, জনপদ ও নগরের, রাজসভা প্রভৃতির রূপটি কালিদাসের অমর কাব্য হইতে রবীন্দ্রনাথ সত্যভাবে দেখিয়াছেন। মন্দাক্রান্তা-স্রোত-বিধৌত মেঘদূতের সেই ভারতখণ্ডটির প্রতি কবির কি ঔৎসুক্য!

আবার সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী গিরি নগরীর নামগুলিই-বা কি সুন্দর! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, রেবা, সিপ্রা, বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে শোভা সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে। * * * মনে হয়, ঐ রেবা, সিপ্রা, নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর

তীরে অবন্তী-বিদিশার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত। [প্রাচীন সাহিত্য—মেঘদূত]

সেই পরিণতশ্যামজম্বুকাননগুলির জন্য, সেই যেখানে বর্ষারম্ভে বলিভুক্ পাখিরা কুলায় বাঁধিতে সুরু করে, সেই দশার্ণের জন্য, আর সেই শিপ্রাতটবর্ত্তিনী উজ্জয়িনীর জন্য কবির কি গভীর আসক্তি! প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রার মধ্যে যে সৌন্দর্য্যের অংশ রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আন্দোলিত করিয়াছে—কল্পনার আলোচনা-কালে তাহা দেখিতে পাইব।

কালিদাস রঘুবংশে আদর্শ রাজচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—এবং অবশেষে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজবংশ অগ্নিবর্ণের মত অচরিতার্থ নৃপতির হাতে কেমন করিয়া বিনষ্ট হইল—তাহাও দেখাইয়াছেন। কালিদাসের আদর্শ রাজা রাজ্যকে তপস্যার মত গ্রহণ করেন—এবং গৃহস্থাশ্রম পালন করিয়া অবশেষে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে উপনীত হইয়া—বনে প্রবেশ করেন—

ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ক কেশজালে
ত্যাগের মহিমা জ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ রাজ-চরিত্র তপস্বিরাজ। যেখানে ইহার অন্যথা ঘটিয়াছে—সেখানেই রাজ-চরিত্র আদর্শভাবে অঙ্কিত হয় নাই—বিশেষ তাঁহার ছোট রাজাগুলি প্রায়ই অত্যাচারী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা কবির কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করিতেছি—সুতরাং বিশদভাবে তাঁহার নাট্যসমূহে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রাচীন ভারতের তপোবনের ভাবটি রবীন্দ্রনাথের উপর অত্যন্ত বেশি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই তপোবনের প্রতি শ্রদ্ধা—বর্ত্তমান-কবি কালিদাসের নিকট শিখিয়াছেন। কালিদাস, রাজসভার কবি হইলেও তিনি যেমন রাজসভাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, শ্লেষাঘাত করিয়াছেন এমন কোন মুনি ঋষিও করেন নাই।

কালিদাস যেমন তপোবনকে অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছেন, শ্রদ্ধা করিয়াছেন—এমন অনেক মুনি ঋষিই করেন নাই। তাঁহার সকল নাট্য ও কাব্যের পটভূমি অরণ্য, একথা রামায়ণ-মহাভারত-সম্বন্ধেও খাটে। সত্যকথা বলিতে কি প্রাচীন ভারতের সভ্যতারই পটভূমি হইতেছে মহারণ্য ও তাহার মহাচ্ছায়া।

কালিদাসের রাজারা একটু অবসর পাইলেই বনে ঘুরিয়া আসেন। শকুন্তলায় তপোবন একজন নটের স্থান অধিকার করিয়াছে। বিক্রমোর্ব্বশীতে কবি যতক্ষণ না কোন একটা উপলক্ষে পুরূরবাকে বনে আনিতে পারিয়াছেন ততক্ষণ তাঁহার শান্তি নাই। কুমারসম্ভবে তপোবনই ঘটনাস্থল—শুধু একবার রাজসভা মদনের রূপে সেখানে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল—কবি তাহাকে দগ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন। চৈতালির এই শ্রেণীর কবিতাগুলির প্রত্যেকটি ছবি কালিদাসের কোন না কোন কাব্যের আভাসে পূর্ণ।

যখন পড়ি—

> রাজা রাজ্য-অভিমান রাখি লোকালয়ে
> অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নতশিরে
> গুরুর মন্ত্রণা লাগি।

দিলীপের সন্তানকামনায় গুরুর তপোবন-যাত্রার ছবি মনে পড়ে।

আবার—

> শিষ্যগণ
> বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
> প্রশান্ত প্রভাত বায়ে, ঋষি-কন্যাদলে
> পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
> আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।

এই ছবিখানিতে কণ্বাশ্রমের সেই প্রভাতটির কথা কার না মনে পড়ে যে দিন সম্রাট্ দুষ্মন্ত অতিথিরূপে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ভারত কবিতায় নগর ও তপোবনের দুইখানি ছবিতে তিনি তৎকালীন সভ্যতাকে উক্ত দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক—এই দুই অংশের মধ্যে কোথাও বিরোধ নাই—নগরের পরিণাম তপোবন। যে রাজা একদিন প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করেন—যথা সময়ে তিনিই ভোগস্পৃহাকে ত্যাগে পরিণত করিয়া শান্ত তৃপ্ত মনে তপোবনে প্রবেশ করেন।

একদিকে গৃহধর্ম্মের কল্যাণ-বন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধন-মোচন এই দুই-ই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসার-মধ্যে ভারতবর্ষ বহুলোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না, তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ

একাকী। দুয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই—দুয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ—আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায়—কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন।" [প্রাচীন সাহিত্য, কুমার সম্ভব-শকুন্তলা]

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা যে কয়টি উপাদানে সৃষ্ট—তপোবন তন্মধ্যে অন্যতম। কালিদাসের কাব্যে এই তপোবন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের চক্ষু ইহা এড়াইতে পারে নাই। শকুন্তলা-সমালোচনা উপলক্ষে কবি এই ভাবটির উপরে জোর দিয়াছেন।

"অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান—এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই।" [প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা]

কালিদাসের নিকটে সচেতনভাবে কোন সমস্যা ছিল কি না জানি না। আমাদের সমস্যা-সন্দিগ্ধ বিংশ শতাব্দীর চক্ষে অনাবিল কাব্যের মধ্যেও জটিল সমস্যা বাহির হইয়া পড়ে। কালিদাসের সকল কাব্যেই নর-নারীর মিলনকে নানা ভাবে যাচাই করিয়া লওয়া হইয়াছে। কালিদাস যে তপোবনের মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রচার করিতেছিলেন—তাহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে তৎকালীন সভ্যতা ক্রমে প্রাচীন তপোবনের আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া অত্যন্ত নাগরিক হইয়া উঠিতেছিল। নর-নারীর মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটি কি রকম হওয়া বাঞ্ছনীয় এমন কোনো একটি আদর্শ হয়তো তাহার ছিল। বিক্রমোর্ব্বশীতে দেখি উর্ব্বশী লতা হইয়া গিয়াছেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—পুরূরবা যে ভাবে, যে দেহৈকরসভাবে উর্ব্বশীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, নারীর আত্মাকে বাদ দিয়া কেবল তাহার জড়ত্বকে স্বীকার করিয়াছিলেন—যথার্থভাবে দেখিতে গেলে—ইহা উর্ব্বশীর লতাতে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কি? দেহস্তরে উর্ব্বশী লতাপাতার সমান বই কি! বিরহের তপস্যার মধ্য দিয়াই অবশেষে পুরূরবা উর্ব্বশীকে সত্যভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শকুন্তলা ও কুমারসম্ভবে এই সমস্যাটিকে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

ঋতুসংহার কবির অল্পবয়সের রচনা—সে বয়সে তিনি প্রেমের যথার্থ রূপটি ধরিতে পারেন নাই।

"যে উন্মত্ত প্রেম প্রিয়জনকে ছাড়া আর সমস্তই বিস্মৃত হয়, তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে, সেই জন্যই প্রেম অল্পদিনের

মধ্যেই দুর্লভ হইয়া উঠে, সকলের বিরুদ্ধে আপনাকে আপনি আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।" [প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা]

এই ভাবটি চৈতালির ঋতুসংহার কবিতায় আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে কালিদাস সম্ভোগের কবি নহেন, তিনি প্রাক্‌-বিবাহ অনুরাগকে স্বীকার করিয়াও তদপেক্ষা মহত্তর সার্থকতা, যাহা বিরহ এবং তপস্যার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া দেখা দেয়-- কাব্যকে সেই প্রশান্ত বিরল-বর্ণপরিণামের দিকে লইয়া গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা। কালিদাস অনাবশ্যক সম্ভোগের চিত্র আঁকেন নাই। কুমারসম্ভবের সপ্তম সার্গে সেই বিশ্বব্যাপী উৎসব। এই বিরহ-উৎসবেই কুমারসম্ভবের উপসংহার। চৈতালিতে দেখি—

যবে অবশেষে
ব্যাকুল সরমখানি নয়ন নিমেষে
নামিল নীরবে, কবি চাহি দেবী পানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ অবধি মাত্র যে কালিদাসের লেখা---ইহার অপেক্ষা ভালো কারণ আর তাহার কি থাকিতে পারে! প্রাচীন সাহিত্যের দুইটি প্রবন্ধ আমরা অখণ্ড ভাবে সকলকে পড়িয়া দেখিতে বলি—অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে অতৃপ্ত রাখিতে চাহি না।

"কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায় কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ, মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত; দেখাইয়াছেন ধর্ম্ম যে সৌন্দর্য্যকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহার ধ্রুব এবং শান্ত সংযত কল্যাণ রূপই শ্রেষ্ঠ রূপ; বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্য্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন না, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে নর-নারীর প্রেম সুন্দর নহে—স্থায়ী নহে, যদি তাহা বন্ধ্যা হয়, যদি তাহা আপনার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে, যদি তাহা কল্যাণকে জন্মদান না করে এবং সংসারে পুত্র-কন্যা অতিথি-প্রতিবেশীর মধ্যে বিচিত্র সৌভাগ্যরূপে ব্যাপ্ত হইয়া না যায়।" [প্রাচীন সাহিত্য—কুমারসম্ভব-শকুন্তলা]

ভারতবর্ষের পুরাতন কবিকে ভারতবর্ষের আধুনিক কবি যথার্থ ভাবে যে শুধু বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা নহে, পুরাতন কবি নিগূঢ় প্রভাবের মত আধুনিক কবির

সমস্ত সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র রসের উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সনাতন যে আদর্শ, যাহা প্রাচীনও নয়, নূতনও নয়, সেই বিরাট্ আদর্শ হইতে রসসংগ্রহ করিয়া দুই বনস্পতিরাজের মত ভারতবর্ষের আলোকোদ্ভাসিত অনন্ত আকাশে উভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একদিকে ভাবের দিকে যেমন ঐক্য, রচনা-কৌশলের দিকে তেমনি গভীর অনৈক্য। কালিদাস ছবির কবি, রবীন্দ্রনাথ সুরের; কিন্তু ইহাতেও আমার বক্তব্য স্পষ্ট হইল না—তবে কি রবীন্দ্রনাথে ছবি নাই—কালিদাসের ধ্বনিসামঞ্জস্য সুরের স্তরে পৌঁছায় না? তাহা নহে; রবীন্দ্রনাথেও ছবি আছে, কালিদাসেও সুরের অনুরণন আছে। কালিদাস ছবি আঁকিয়াছেন সংস্কৃত ভাষার নিরেট পাথরের খণ্ডগুলি সাজাইয়া সাজাইয়া—তাহা ছবি অপেক্ষা ভাস্কর্য্যের নিকটতর আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিয়াছেন—প্রাকৃত ভাষার লঘু শব্দসমন্বয়ে—তাহা ছবির অপেক্ষা গানের নিকটতর আত্মীয়; কালিদাসের ছবিগুলির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা আছে—রবীন্দ্রনাথে বড় জোর আছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ। কালিদাস কীট্‌স সগোত্র—রবীন্দ্রনাথ শেলীর। কালিদাসের বিশেষত্ব তাঁহার ভাষার সংহতি, রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব—তাঁহার ভাষার ব্যাপ্তি বা চলতা। সঙ্গীত ও কবিতা প্রধানতঃ সময়কে অধিকার করিয়া থাকে—সুরের পর্দ্দাগুলি ধীরে ধীরে খুলিয়া গিয়া আমাদের চিত্তকে স্বভাবতঃই—অনতিদূরবর্ত্তী পরিণামের মুখে সঞ্চালিত করিয়া দেয়—চলতাই তাহার ধর্ম্ম। রবীন্দ্রনাথের আর্টের ধর্ম্ম ইহাই।

ছবি বিরাজ করে প্রধানতঃ স্থানকে অধিকার করিয়া—একটি মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপে—ছবির একদিক্ হইতে অন্যদিকে—ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরাবর্ত্তন করিয়া আমরা সে ছবি দেখিতে পারি—আমাদের চিত্তকে তাহা বর্ত্তমানের কেন্দ্রেই ধরিয়া রাখে তাহার ধর্ম্ম স্থিতি—কালিদাসের আর্টের ধর্ম্ম এই স্থিতি বা শান্তি!

সঙ্গীত একটি ভাবের আভাস মাত্র দিতে সমর্থ; তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিতে পারে না, ইহা আমাদের চিত্তে এক অনমুভূত রসকে জাগাইয়া দেয়—কিন্তু সে রসের পরিণাম ও পারিপার্শ্বিক পরিষ্কারভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারে না—রবীন্দ্রনাথের কাব্যও এই দুই লক্ষণ-দ্বারা আক্রান্ত। উহা আভাসধর্ম্মী; উহা রসবোধকে জাগাইয়া দেয়—তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে চিত্র অস্পষ্ট রেখামাত্রে অঙ্কিত, দুই-একটি টানে, ঘটনায়, কথায়, বৃহত্তের ইঙ্গিত মাত্র করে—রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য অতিদূর রহস্যের প্রতি একটি একনিষ্ঠ ব্যঞ্জনা—একটি সুবৃহৎ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ মাত্র।

উভয় কবিতে যদি এতই পার্থক্য—তবে কালিদাসের নিকটে এই হিসাবে

রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে ঋণী ? কালিদাসের নিকটে ঠিক নহে, সংস্কৃত কাব্যের নিকটে, আর সংস্কৃত কাব্য বলিতে প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের নিকট কালিদাসই বুঝায়—তিনি ভাষার এই সংহতি গুণ পাইয়াছেন। বাংলাসাহিত্য বা বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে পাইয়াছেন—ভাষার জড়ত্ব হইতে মুক্তি, ব্যাপ্তি বা চলতা—এক কথায় সেই সুরপ্রধান সাহিত্য হইতে পাইয়াছেন—সুরের ধর্ম্ম, আর কালিদাস হইতে লাভ করিয়াছেন—ভাষার সংহতি, নিরেটত্ব। সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে মানসীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রধানতঃ—এই ভাষার জড়ত্ব মুক্তির, বৈষ্ণবকবিগণের প্রভাব—মানসী হইতে কালিদাসের প্রভাব লক্ষিত হয়।

এই দুইটি বিপরীত প্রভাবের পরিণতি ক্ষণিকার ভাষায়। ক্ষণিকার ভাষা একান্ত ভাবে দেশজ— কিন্তু না তাহা সন্ধ্যা সঙ্গীতের, না তাহা সোনার তরীর। সংস্কৃত শব্দ এবং দেশজ ক্রিয়াপদ প্রভৃতি এমন কৌশলে গাঁথা হইয়াছে—যে কোনো ব্যক্তি এই উভয় সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ না করিলে এমনটি সৃষ্টি করিতে পারিত না। আরো একটি উদাহরণ—বলাকার ছন্দ ও ভাষা,—তাহাতেও এই দুই সাহিত্যের প্রভাব পরম সুন্দর পরিণতি লাভ করিয়া আশ্চর্য্য কাব্যকলার সৃষ্টি করিয়াছে।

চৈতালিতে বর্ত্তমান ভারত অথবা বঙ্গদেশ সম্বন্ধে চারিটি কবিতা আছে। দুইটি বঙ্গমাতার প্রতি, দুইটি বঙ্গবাসীর অনুকরণ-লালসা ও মানসিক জড়ত্বকে ব্যঙ্গ করিয়া। প্রথম দুইটিতে বাঙালী যে নিতান্তই নাবালক থাকিয়া গৃহকোণে জীবনযাপন করিতেছে এবং স্নেহশীলা বঙ্গমাতা তাহাতে প্রশ্রয় দিয়া সাতকোটি প্রাণীকে মানুষ করিয়া না তুলিয়া একান্তভাবে বাঙালী করিয়া রাখিতেছেন - এই বিষয়ে বঙ্গমাতার প্রতি কবির সাভিমান অনুযোগ! অপর দুইটিতে এক দিকে এই সাতকোটি বাঙালী কেমন ভাবে আপন জড়ত্বে ও তন্ত্রমন্ত্রসংহিতায় আবদ্ধ—অন্য দিকে পরবেশে নিজের সেই আভ্যন্তরিক দৈন্য কি রকম করিয়া ঢাকিতে চাহিতেছে—এই বিষয়ে কবি তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়াছেন।

সব শেষের জন্য যে কবিতাগুলি রাখিয়া দিয়াছি—তাহাতে অবসাদ ও বিষাদের সুর। চৈতালিতে কবি জীবনের একটি পর্ব্ব যে অবসানের অভিমুখে আসিতেছিল—এই কবিতাগুলিতে তাহারই আভাস। এতদিন কবি পদ্মার বক্ষে থাকিয়াও পদ্মাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে পান নাই—চৈতালিতে আসিয়াই পদ্মা বিশিষ্ট একটি মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হইয়াছে।

হে পদ্মা আমার
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।

পদ্মা যেমন বিশিষ্ট, ব্যক্তিগত হইয়া উঠিল—অমনি—

তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ।

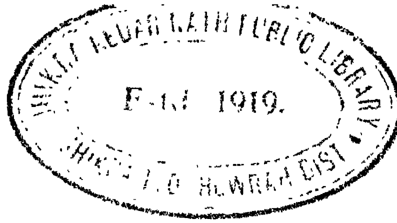
কবি ও পদ্মার নিভৃত সম্বন্ধটি প্রণয়ী যুগলের—সে নির্জ্জনতায় আর কাহারো প্রবেশের সাধ্য নাই। তার পরেই কবির প্রিয় বিবর্ত্তনবাদের কথা। যদি তিনি পরজন্মে এই পৃথিবীতে, এই পদ্মাতীরে ফিরিয়া আসেন—তখন কি জন্ম-পূর্ব্বের এই স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিবে না। এই বিবর্ত্তনের স্মৃতি মধ্যাহ্ন কবিতাটিতেও আছে—মধ্যাহ্নের নদীতীরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্ব্ব জন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে—মাতৃস্তনে শিশুর মতন
আদিম আনন্দ রস করিয়া শোষণ।

এই মধ্যাহ্ন কবিতাটির বিশেষত্ব—ইহাতে এমন নিখুঁৎ খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে—যাহা চৈতালির বিশেষত্ব, হয়তো সংস্কৃতসাহিত্যের—কালিদাসের প্রভাবেও বটে, কিন্তু এমন নিখুঁৎ বর্ণনা করা কবির স্বভাব নহে—তিনি আভাসে ইঙ্গিতে ছবি আঁকিতেই ভালবাসেন।

এই যে নদীর ব্যক্তিত্বের কথা বলিলাম—এই নদী প্রকৃতির শান্তিময়ী প্রেয়সী ও শ্রেয়সী মূর্ত্তির নিকট হইতে কবি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। চৈতালিতে আসিয়া কবির জীবনের নদী-মাতৃক পর্ব্ব শেষ হইয়াছে।

যেমন সহজে সোনারতরী হইতে চিত্রা ও চিত্রা হইতে চৈতালিতে আসিয়াছি কোথাও বড় রকম ছেদ নাই—চৈতালি হইতে বিদায় তেমন সহজ নহে। চৈতালিতে কবির নিভৃত অন্তরের মানসসুন্দরী পর্ব্ব সমাপ্ত। ইহার পরবর্ত্তী গ্রন্থে কবি ভারতবর্ষের বৃহত্তর এবং প্রাচীন জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এই সত্যটি, এই পরিবর্ত্তনটি আভাসের মত কবির নিকটেও অনুভূত হইতেছিল—তাই এত বিদায়ের কাতরতা—তাই এই নির্জ্জন লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে প্রবেশের বেদনা—এ লোকালয় ঠিক কলিকাতা বা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ নহে, ক্ষুদ্র নির্জ্জন-নিবাস ও বর্ত্তমানকে পশ্চাতে ফেলিয়া এইবার কবির প্রবেশ মহৎ কর্ম্মের দ্বারা, মহান্ ভাবের দ্বারা উদ্বোধিত বিরাট্ ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন সভ্যতার ধ্যানসৌম্য জীবন-যাত্রার মধ্যে।



ক্ষণিকা

রবীন্দ্রকাব্য লিরিক-প্রধান—ক্ষণিকা আবার সেই লিরিকের চূড়ান্ত। হিন্দু পঞ্জিকায় এক এক বৎসরের অধিপতি এক এক গ্রহ। ক্ষণিকার অধিদেবতা প্রধানতঃ শরৎকাল, কিংবা অন্যান্য ঋতুর কোমল রূপ। আমাদের ঋতু পর্য্যায়ে শরৎ সর্ব্বাপেক্ষা সুকুমার। বর্ষা বসন্ত গ্রীষ্ম ক্ষণিকায় অত্যন্ত সঙ্কোচে সম্ভ্রমে প্রবেশ করিয়াছে; অনধিকার-প্রবেশের ভয়ে তাহাদের উগ্রতা অনেকটা পরিমাণে পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছে। আবহাওয়ার এই শারদীয় সৌকুমার্য্যের জন্য কবির একটি বিশেষ মনোভাব দায়ী। কি এই মনোভাবটি যাহা অন্যান্য কাব্য হইতে ইহাকে পৃথগাসন দিয়াছে, একবার দেখা যাক। ক্ষণিকার ভাব, ভাষা ও ছন্দের ত্রিস্রোতার মূলে এই অখণ্ড একটি মনোভাব বর্ত্তমান।

ক্ষণিকায় কবি একেবারে লোকালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা জীবনদেবতার আদর্শলোক নহে, দুঃখের খাদ নিঃশেষে গলিয়া গিয়া জীবন যেখানে নিকষিত সুবর্ণের দিব্যমূর্ত্তি গ্রহণ করে। ইহা প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যলোকও নহে, বর্ত্তমানের দিক্‌চক্রের কালো মেঘখানা যেখানে অস্তমিত তপনের সুধাসেচনে অতীতের নন্দনচ্ছায়া বিস্তার করে। না আছে ইহাতে জীবনরূপকে অতীতের সৌন্দর্য্যলোক হইতে দেখিবার চেষ্টা, না আছে ইহাতে জীবনদেবতাধিষ্ঠিত ভাবীকালের আদর্শ রূপের মধ্যে তাহাকে সঞ্চারিত করিয়া দিবার প্রয়াস। বর্ত্তমানের বাতায়ন হইতে কিয়ৎ পরিমাণে নিরাসক্তভাবে জীবনের মুহূর্ত্তগুলিকে দেখা হইয়াছে, এবং অবশেষে শেষ যৌবনের সন্ধ্যাপ্রহরে সেগুলি একটি মালিকায় পরিণত হইয়াছে। জীবনের বিচিত্র ক্ষণের এই মালিকাই ক্ষণিকা। ইহার কোনটি বা সুখে উজ্জ্বল, দুঃখে ম্লান; কোনটি বা আনন্দের ভারে ছিন্নপ্রায়, কোনটি বেদনায় টন্‌টন্ করিতেছে; সুখ দুঃখ আশা নৈরাশ্য, গভীর নিষ্ফলতা ও পরম পরিতৃপ্তি, দীর্ঘ বিরহ, ক্ষণিক মিলন একত্র বিরাজিত, একই শাখায় নীড় রচনা করিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহে এমন অভিজ্ঞতা বিস্ময়জনক! কিন্তু পথের বাঁকে বাঁকে শক্তির নব নব বিস্ময়ের দ্বারা মুগ্ধ করাতেই তো প্রতিভার অভ্রান্ত পরিচয়।

(৩)

জীবনকে সহজভাবে দেখিবার এই দৃষ্টি, বলা বাহুল্য, কবি একদিনে লাভ করেন নাই; চৈতালিতে ইহার পূর্ব্বাভাস। ক্ষণিকায় কবির প্রতিভা ও জীবন একবারের জন্য নিকটতম সংস্পর্শে আসিয়াছে—ব্যোমপথবিহারী অনেক ধূমকেতু যেমন একবার মাত্র পৃথিবীর কাছে আসিয়া আবার অনন্ত আকাশে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়—পুনরায় স্বাভাবিক অন্তরীক্ষ-মণ্ডলে ফিরিয়া গিয়াছে।

জীবনের ঘটনা যতক্ষণ ভাবরূপ না পায় ততক্ষণ তাহা কবিকে কাব্য প্রেরণা দেয় না—এই ভাবরূপাশ্রয়ী জীবনই রবীন্দ্র-কাব্যের প্রধান উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে "বস্তুতন্ত্র" নাই বলিয়া যে অনেকে মনে করেন—তাহার কারণ ইহাই। বস্তুতন্ত্র কি জিনিষ এবং কাব্যে তাহা কেমন ভাবে থাকে—ঠিক সে ধারণা আমার নাই। তবে মাটি একটা বস্তু—কিন্তু তৎনির্ম্মিত পুতুল দেখিয়াও যদি দর্শকের কেবল মাটির কথাই মনে জাগে তবে বুঝিতে হইবে বস্তুতন্ত্রতা আছে, কিন্তু তাহা দর্শকের মনে কারণ শিল্পীর সকল চেষ্টাই এখানে মাটি। যাহা হোক, এই বস্তুতন্ত্রবাদী পাঠক, আশা করা যায়, ক্ষণিকাতে অবিকৃত জীবনের গন্ধ কিছু কিছু পাইবেন—কারণ কবি জীবনকে যতদূর সম্ভব অবিকৃত রাখিয়া কাব্য বস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। 'যেমন আছ তেমনি এস' ইহাই ক্ষণিকার শিল্প-রহস্যের মূলমন্ত্র। ইহার মূলে নিরাসক্ত যৌবনের প্রৌঢ় কবি-চিত্ত। সোনার তরী ও চিত্রার কবি দৃষ্টি সম্পূর্ণ নয়, কাজেই সহজও নয়। সেখানে কবি জীবনকে আদর্শায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, আর আদর্শায়িত করা মানেই জীবনের উপর ছাঁট-কাট করা। দুঃখ-ছাঁটা জীবন আনন্দে আদর্শায়িত; মলিনতা-ছাঁটা জীবন সৌন্দর্য্যে আদর্শায়িত: ইহারা আর যাহাই হোক সম্পূর্ণ নয়, কাজেই সহজ নয়। পূর্ব্বোক্ত দুই কাব্যে জীবনকে আদর্শায়িত করিয়া কবির সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা—কিন্তু ক্ষণিকায় সুরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—"সত্যেরে লও সহজে।" এই সহজভাবে সত্য অর্থাৎ জীবনকে গ্রহণ করিবার চেষ্টায় ক্ষণিকার বিকাশ। তত্ত্ব হিসাবে ইহার কি মূল্য জানি না, এবং বস্তুতন্ত্র হিসাবে কি পরিমাণে বাস্তবতা লাভ করিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না, কিন্তু এই দৃষ্টিতে জীবনের দিকে তাকাইয়া কবি তাহার একটা নূতন রূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছেন—অন্যান্য কাব্য হইতে ইহাতেই ক্ষণিকার বিশেষত্ব।

(৪)

ইহা ক্ষণিকার মূল কথা। মূল তো মাটির মধ্যে গুপ্ত থাকে· তাহার বিকাশ দেখিতে পাই ফুলে ফলে লতায় পাতায়, যাহা চোখের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত। ক্ষণিকার

এই মৌলিক তত্ত্ব প্রধান কি রূপ গ্রহণ করিয়া পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত। প্রথমেই লক্ষ্য হয় ইহার ভাষা ও স্মিতরস। স্মিতরস বলিয়া কোন রস অলঙ্কার শাস্ত্রে নাই—কিন্তু জীবনে আছে। হাসি ওষ্ঠাধরে বিকশিত হইয়া আপনার পরিচয় দেয়—কিন্তু এই বাহ্য কায়িক লক্ষণের তলে মনের একটি প্রসন্ন ভাব আছে। এই প্রসন্ন ভাবের প্রবলতা যখন এই পরিমাণে হয় যে তাহা ওষ্ঠাধরের কূল ছাপাইয়া যায়, আলঙ্কারিকদের কাছে তাহাই হাস্যরস। কিন্তু এই প্রসন্নতার বেগ যদি অপেক্ষাকৃত মন্দ হয়, যাহাতে মনটা শুধু কৌতুকের আবেগে ভিজিয়া উঠিল মাত্র, কিংবা ওষ্ঠাধরের প্রান্তে একটি শুভ্র রেখা টানিয়া গেল, তাহাকে কি বলিব? ইহাই আমাদের স্মিতরস। জীবন শাস্ত্রের আলঙ্কারিকেরা ইহার সহিত সুপরিচিত, জীবনের ইহা শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। দুষ্মন্ত যখন মারীচের তপোবনে ক্ষুদ্র একটি মানবককে বলপূর্ব্বক পশুরাজের মুখব্যাদান করিয়া দাঁত গুণিতে দেখিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার অধরপ্রান্তে বিস্ময়কর কৌতুকে একটি শুভ্ররেখা তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল—ইহাই স্মিতরস। ইহাকে হাস্যরস বলিলে ভুল হইবে। আবার যেদিন কবি কালিদাস জোর করিয়া সিংহের মুখ খুলিয়া দন্ত-গণনারত শিশুর ছবিখানি কল্পনায় দেখিতে পাইলেন—সেদিন তাঁহারও অধরপ্রান্তে একটি রজত-রেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিকে—একটা বৃহৎ পশুর মুখ খুলিয়া বিশেষ করিয়া দাঁত গুণিতে শিশুর কৌতুহল, অন্যদিকে এই চিত্র কল্পনায় দেখিয়া কবির কৌতুক। এই কৌতুহল ও কৌতুকের সমমনোভাবে দুইজনের একাত্মকতার বোধ। স্মিতরসের মূলে পরস্পরের সহিত এই একাত্মকতার অনুভূতি।

ক্ষণিকায় এই স্মিতরসের মূলে কবির একাত্মকতার বোধ;—একাত্মকতার বোধ, ভাল মন্দ, ছোট বড়, সত্য মিথ্যা, এক কথায় অবিকৃত সমস্ত জীবনের সঙ্গে। ইহা ঘটিয়াছে বলিয়াই কথায় কথায় যেখানে সেখানে যে কোনো প্রসঙ্গে, এমন কি দুঃখের আবেগেও কবির ওষ্ঠাধরে ক্ষণে ক্ষণে কৌতুক-কণার বিস্ফুরণ হইয়াছে।

তারপরে ইহার ভাষা। ইহাও এই সহজ দৃষ্টির ফল। ইহাতে কবি প্রথম ধারাবাহিকভাবে বাঙলা দেশজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এতদিন যে সব শব্দ সাহিত্যের নিম্নস্তরে অন্ত্যজের মত দিনপাত করিত তাহারা প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত যথাস্থান অধিকার করিয়া লইল। এই দেশজ অসংস্কৃত ভাষা সহজ প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-নৃত্যের তালে তালে এমন বাজাইয়া তুলিল যে, কোন সংস্কৃত ভাষার দ্বারা তেমনটি ঘটিত না। ক্ষণিকাতে শুধু যে আমরা দেশের পল্লীগুলির ঘনিষ্ট পরিচয় পাই, তাহা নয়, দেশী শব্দগুলিরও বিশেষত্ব বুঝিতে

পারি। 'মলিয়ারের' সেই হঠাৎ নবাবের মত বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে, কি আশ্চর্য্য, এই শব্দগুলি এত দিন ব্যবহার করিতেছি, ইহাদের মধ্যে এত সঙ্গীত ছিল তাহা কে জানিত। দেশী শব্দ ব্যবহারের মস্ত একটা সুবিধা তাহাতে যথেচ্ছ হসন্ত ব্যবহার করা চলে—এই হসন্তের প্রাচুর্য্যে ছন্দের ক্ষিপ্রতা ও লঘুতা বাড়ে! আমরা যখন সাধারণ ভাবে হাঁটিয়া চলি. তখন পা সমতল ভাবে মাটিতে পড়ে কিন্তু নাচের সময়ে পা কখনো পুরা পড়ে, কখনো অৰ্দ্ধ, কখনো সিকি, কখনো বা একেবারে তাল ফাঁক পড়িয়া যায়। হসন্ত এই নাচের সময়ে হাল্কা ভাবে পা ফেলা।

সংস্কৃত শব্দগুলি গম্ভীর—তাহারা নাচিতে জানে—কিন্তু সে এমন যেমন তেমন খুসির অকারণে অসময়ে অত্যন্ত সহজ নৃত্য নয়; তাহাদের সাজসরঞ্জাম আসর আসবাব অনেক।

এই সহজ দৃষ্টির প্রেরণায় কবি জীবনের ভঙ্গুর ক্ষণগুলির যে পুতুল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার উপকরণ সংস্কৃত বহুল বাংলাও নয়, আর সোনার তরী চিত্রার মেঘ-নির্ঘোষ ছন্দও নয়। ইহার স্বাভাবিক উপকরণ ক্ষণিকার ভাষা ও ছন্দ। কবির যে সহজ দৃষ্টি লাভ ঘটিয়াছে তাহার আর যদি কোনো প্রমাণ না-ও থাকে, ইহার ভাষা ও ছন্দই যথেষ্ট; কারণ ভাব ও ভাষার মধ্যে যে শুধু সঙ্গতি থাকে—তাহা নয়; ভাষা-ই ভাব।

যে সহজ দৃষ্টির ফলে ক্ষণিকায় স্মিতরস ও ভাষার এই নবমূর্ত্তির আবির্ভাব, তাহাই জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। কাজের সুবিধার জন্য আমরা তিনটি ভাগ করিতে পারি, প্রকৃতি, নরনারী ও কাল। এই তিন ক্ষেত্রেই দেখিতে পাইব কবির দৃষ্টি পূর্ব্বোক্ত কাব্য হইতে স্বতন্ত্র, এবং সে স্বাতন্ত্র্যের মূলে কবির এই সহজ দৃষ্টি।

ক

পূর্ব্ববর্ত্তী কাব্যে কবি প্রকৃতিকে বৃহৎ পটের উপর মোটা তুলিতে উজ্জ্বল রঙে আঁকিয়াছেন—ইহা শিল্পীর মনের আবেগ ও ভাবাতিশয্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু এখানে কি দেখি, ছবিগুলি ছোট, দৃশ্যগুলি অতি পরিচিত, আর রঙের মধ্যে উগ্রতা মোটেই নাই। অন্যান্য দৃশ্যের মধ্যে সন্ধ্যা-আকাশটি কবির বড়ই প্রিয় দেখিতেছি, তাহাও আবার শরৎকালের। অনেকগুলি ফুলের উল্লেখ আছে, কিন্তু দু-একটি স্থান ব্যতীত কোথাও রক্তবর্ণের ফুলের উল্লেখ নাই—সমস্তই চাঁপা, যূথী, বকুল, শিরিষ, হেনা, কদম, কাশ, এবং শস্যশূন্য মাঠ। প্রকৃতির সভায় ইহারা নিতান্ত নরমপন্থী।

খ

মানুষকে এখানে বৃহৎপটে অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির সহিত একাঙ্গ করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই; মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে, অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন করিয়া ছোট করিয়া অঙ্কিত, এবং সে ব্যক্তিও এমন, কোনো ইতিহাসে যাহার উল্লেখের কোনো সম্ভাবনাই নাই। ইহা প্রেমের ক্ষেত্রে আরো স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। চিত্রায় কবি প্রিয়ার প্রেমে প্রেমের সম্রাট্ হইয়া চিরন্তন প্রেমিকযুগ্ম সমূহের স্বর্গ সুখের অমরাবতীতে বিচরণে রত। কিন্তু ক্ষণিকায় নাকি, "তোমার আমার এই যে মিলন, নিতান্তই এ সোজাসুজি।" ছোটখাটো সুখ-দুঃখ ও সহজ সরল প্রেমের কাহিনীর কাব্য এই ক্ষণিকা।

গ

ক্ষণিকা পলায়নপর বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের কাব্য। অতীত ও ভবিষ্যৎ এখানে কবির চিন্তার বাহিরে। বাস্তবিক পক্ষে বর্ত্তমান কাল প্রত্যক্ষ সত্য, অন্য দুইটা কল্পনার ও যুক্তির সার্থকতাস্বরূপ। যাহা প্রত্যক্ষ সত্য, তাহাই সহজ,—এই সহজ রসের বলেই কবি বর্ত্তমান কালটিকে প্রধান উপজীব্য করিয়াছেন। 'সেকাল' কবিতাটিতে বর্ণনা অংশ সেকালের, কিন্তু সান্ত্বনার অংশ একালের,—কাজেই এখানেও বর্ত্তমানের জয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্ষণিকার কালাধিপতি শরৎ। ইহার মূলেও এই একই সহজ রস। ঋতুর মধ্যে শরৎ শিশু,—শিশুর সরলতা, নির্ম্মলতা, বন্ধন-বিমুক্তি, আসক্তি-হীনতা, লঘুতা ও যথেচ্ছকারিতা শরতেরও বিশেষত্ব। যেখানে অন্যান্য ঋতুর উল্লেখ, সেখানেও তাহাদের মূর্ত্তি তেমন উগ্র নয়। বর্ষা-বসন্তও শরতের স্বচ্ছ উত্তরীয়খানা পরিয়া আসিয়াছে। 'নববর্ষা'তে ইহার ব্যতিক্রম, ভাবে ভাষায় কিছুতেই ইহাকে ক্ষণিকা-পর্য্যায়ে ফেলা চলে না—ইহা কবির অন্য মনোভাবের প্রক্ষেপ। উদাহরণের ব্যত্যয় নিয়মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা জ্ঞাপন করে মাত্র।

ক্ষণিকার মনোভাব সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যাহা বলিলাম, কবিতাগুলি সম্বন্ধে বিশিষ্ট ভাবে তাহা প্রযোজ্য। কবিতাগুলিকে মোটামুটি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা চলে —মানুষ-প্রধান, প্রকৃতি-প্রধান, ক্ষণিকার ব্যতিক্রম ও জীবনদেবতা।

মানুষ-প্রধান ভাগে কবির নিজের কথাও আছে। ইহা ছাড়া প্রথম কবিতাটি—উদ্বোধন, ইহাতে ক্ষণিকার মূল সুরটি ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব কথিত সহজ রস সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,

আজিকার মত যাক্‌ যাক্‌ চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি।
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্‌ থাক্‌ কাঁদনি!

এই ক্ষণিক সুখের উৎসবে সকলের প্রতি কবির আহ্বান, সকলেই আসিয়াছে; তবে জীবন উত্তরীয়ের যে দিক্‌টাতে সহজ মনের স্বচ্ছতা সকলের গায়েই সেই দিক্‌টা দৃশ্যমান। মানুষের সঙ্গে মানুষের সকল সম্বন্ধকেই কবি স্মিতরসের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন; প্রথমে কবির নিজের কথাই দেখা যাক।

ক্ষণিকার কবি বারো আনা মানুষ, তাঁহাকে কবি হিসাবে বুঝিতে গেলে সিকিও বোঝা যাইবে না, মানুষ হিসাবে দেখিলে কবি ও কাব্য একসঙ্গে ধরা দিবে।

কাব্য পড়ে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো।
আঁধার করে' রাখেনি মুখ,
দিবা রাত্র ভাঙছে না বুক—
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
হাস্য মুখেই বয় গো।

আর দশ জনের সহিত, তাঁহার বিশেষ অমিল নাই, ভক্ত পাঠক ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হইতে পারে, কিন্তু কবিই নিজে সাবধান করিয়া দিতেছেন—

কাব্য দেখে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো

সে—

চাঁদের পানে চক্ষু তুলে
রয়না পড়ে' নদীর কূলে

এবং কবির প্রার্থনা বোধ হয় কবির প্রতিই—

কাব্য যেমন, কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে।

সহজ লোকের মতই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

কবি অন্যত্র কবির যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে কবিকে বাহিরে খুঁজিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেখানে কবি-অংশের প্রতিই জোর। কিন্তু এখানে মানুষ-অংশটাই প্রধান—যে-মানুষ আর দশজনের মত গদ্য-মানুষ। এই মানুষ-অংশ-প্রধান কবির মোটেই খেয়াল নাই যে তাহার চুলে পাক ধরিয়াছে, এবং শাস্ত্র-অনুসারে এটা পরকালের ডাক শুনিবার বয়স্। তিনি পরকালের ডাক শুনিতে বসিলে ইহকালের সুখ দুঃখ আশা ভরসার সঙ্গীতের রসদ যোগাইবে কে?

কবির চেয়ে তাঁহার কাব্যও কম যান না, কবিরই কাব্য তো! তিনি যে যথাস্থানটি বাছিয়া লইয়াছেন, তাহাতে কবির অসন্তোষের কোনো লক্ষণ নাই, এবং বোধ করি ক্ষণিকার পাঠকেরাও সেই স্থানে অনধিকার-প্রবেশে দ্বিধা না করিতে পারেন। মানুষ-অংশটা আজ কবির মধ্যে এত উগ্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, কবিতার প্রতি আসক্তিও আজ একান্ত মন্দ! আজ কবিতা লেখার লগ্ন নয়। কবিতা সেই দিনের— শাস্তা খুঁজিবেন না।
ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে,

তখন যেন হতভাগ্য কবি ঘরের খিল আঁটিয়া মিল খুঁজিয়া মরে। কিন্তু আজ যখন সৌভাগ্যক্রমে—

অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,
কাজল চোখে করুণ আঁখিজল

তখন যেন ক্যাপা কবি খাতা পুড়াইয়া হঠাৎ-পাওয়া জীবনটাকে উপভোগ করিয়া লয়।

কাব্যের সিংহদ্বারে কবির সঙ্গে পরিচয় হইল—ভালই, নতুবা অনেক কথাই ভুল বুঝিবার আশঙ্কা ছিল।

সোনার তরীতে কবি মানসসুন্দরীর অনুসন্ধানে জীবনের এবং পূর্ব্বজীবনের কোন্ রহস্য-গভীর অতলতার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছেন; চিত্রায় প্রেমের অমরাবতীতে দময়ন্তী মহাশ্বেতা উমা সুভদ্রার সান্নিধ্যে আপনাকে সম্রাট্ অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু ক্ষণিকায় তাহার কোন চিহ্ন নাই। এখানে ভালবাসার সময়ও যেমন অল্প, স্থানও তেমনি সঙ্কীর্ণ।

আজকে শুধু একবেলারই তরে,
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর

* * *

ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী
আমরা দুটী অমর, দুটী অমর।

ইহাতে কোনো ক্ষোভ নাই—সামান্য একটু বিরলতা পাইলেই তিনি খুসী। আর সে বিরলতা যদি সংসারে না জোটে, কাহারো সহিত দ্বন্দ্ব নাই, তিনি নীরবে বিনা অভিযোগে যৌবনের বানপ্রস্থে বনে প্রস্থান করিতে রাজী।

হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? ইতিপূর্ব্বে প্রেমকে পুরাপুরি কবির দৃষ্টিতে দেখিতেন; সে প্রেম এতই অপার্থিব, যে সমস্ত জীবন এবং ধরিত্রী তাহার পাদপীঠের পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ মনে হইত। আজ মানুষ-অংশ-প্রধান কবির দৃষ্টিতে প্রেমকে জীবনের মধ্যে নিহিত দেখিলেন, শুধু তাহাই নহে, জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ রূপে দৃষ্ট হইয়া বিশ্বব্যাপী প্রেম আর দশটা জিনিষের সহিত সমানাসন লাভ করিয়া অনেকটা সুস্থ ও সহজ।

হৃদয় পানে হৃদয় টানে,
নয়ন পানে নয়ন ছোটে
দুটী প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বই নয়কো মোটে।

* * *

তোমায় আমায় এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজা সুজি।

এ প্রেমের দৃষ্টি সোনার তরী-চিত্রার কাবর নয়।

মধুমাসের মিলন মাঝে
মহান্ কোনো রহস্য নেই

* * *

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজিনে ভাই ভাবাতীত,
আকাশপানে বাহু তুলে
চাহিনে ভাই আশাতীত,
যেটুকু দিই, যে টুকু পাই,
তাহার বেশী আর কিছু নাই,

সুখের বক্ষ চেপে ধরে,
করি নে ভাই যোঝাযুঝি।

এ কথা কবির মুখে নূতন বটে, নূতন কিন্তু একান্ত ভাবে স্বাভাবিক, প্রেম যতই মহান্ হোক, জীবনে তাহারও একটা সীমা আছে, তাহাকে একাধিপতিত্ব দিলে চলে না, অন্যান্য কাজকেও কিছু স্থান ছড়িয়া দিতে হয়—এ সেই পরিণত প্রেমের বর্ণনা!

প্রেমে যেমন আর অগস্ত্যতৃষ্ণা নাই, বিরহও তেমনি বুক-ফাটা ক্রন্দনহীন। মিলন যেমন স্বভাবিক—বিরহও তেমনি। বিচ্ছেদের দীর্ঘদিনে প্রিয়তমের জন্য শোক করিতে ইচ্ছা যে না করে এমন নয়, কিন্তু মস্ত এক অসুবিধা—অবসর নাই, জীবনে আর দশটা কাজ আছে, আর পাঁচজন লোক আছে, আবার পথের বাঁকে বাঁকে, নব নব দিগন্তের ধারে নূতন নূতন মুখচ্ছবি জাগিয়া উঠিয়া চিত্তাকাশে নবতর ছায়া সঞ্চার করে।

এমন সময় নতুন আঁখি
তাকায় আমার গৃহদ্বারে—
চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি
তারেই শুধু আপন জেনেই ;—
কখন্ তবে বিলাপ করি ?
সময় যে নেই, সময় যে নেই!

জীবন এমনই অদ্ভুত, যে বিরহের সময়েও দীর্ঘকালব্যাপী শোকের উপায় নাই, তবে কি আছে ? না একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিবার মত সময়! (বিরহ দ্রষ্টব্য)

জীবনে বারো-আনা দুঃখের মূলে ভুল-বোঝা ; আবার বারো-আনা ভুল বোঝার মূলে মনের ভুল পরিচয়। এই মন পদার্থটা মনুবংশীয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, কিন্তু এটা আবার তাহার শ্রেষ্ঠ বিপদেরও হেতু বটে। সারাজীবন ইহার সহিত ঘর করিয়া গেলাম, কিন্তু কখনও দেখা মিলিল না, যখন দেখা মিলিল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত, তখন কি ঘটিয়াছে, না, শিশু-কাহিনীর সেই কুমীরটার মত শিয়ালের পাখানা মনে করিয়া বটগাছের শিকড়টা ধরিয়া বসিয়া আছি। এই অন্তঃশায়ী গোপন পদার্থটার প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নাই ; ভাবে ভঙ্গীতে, আকারে ইঙ্গিতে, কথা বার্ত্তায়, অর্থাৎ বাহ্য প্রকাশে তাহাকে বুঝিয়া লইতে হইবে। অথচ বহু যুগ একত্র বাস করিয়াও মন ও দেহে সম্পূর্ণরূপে বোঝাপড়া হয় নাই, একে অন্যের ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ইহাতেও যে কাজ চলে তাহাই আশ্চর্য্য। কাজ চলে কিন্তু

জীবনের বারো-আনা দুঃখ-কষ্টেরও সৃষ্টি করে। মন বলিয়া আমরা যাহাকে নিশ্চিন্ত জানিয়া রাখি, একদা কোন্ বিপদের মুহূর্তে বুঝিতে পারি, মোটেই তাহা মন নয়—অকস্মাৎ অসময়ে মেকি বাহির হইয়া পড়ে।

মন নিয়ে কেউ বাঁচে না ক
　　মন বলে যা পায় রে
কোন জন্মে মন সেটা নয়
　　জানে না কেউ হায়রে।
ওটা কেবল কথার কথা,
　　মন কি কেহ চিনিস্?
আছে কারো আপন হাতে
　　মন বলে এক জিনিব?
চলেন তিনি গোপন চালে
　　স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই বা তারে দিচ্ছে, এবং
　　কেই বা তারে নিচ্ছে।
চাই নে রে, মন চাইনে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই—
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
　　তাই নেরে, মন, তাই নে।

মন তো এই জাতীয় পদার্থ; তাহাকে উপেক্ষা করিয়াও সংসারের স্থূল কাজগুলি একরকম চলিয়া যায় বটে, কিন্তু আবশ্যক হইলেই যে তাহাকে মিলিবে—এমন কথা নাই। আর যদিই বা মেলে হয়তো দেখিব কীটের সন্ধানে হৃদয়-গহ্বরে হাত দিয়া কেউটা সাপ টানিয়া বাহির করিতে হইল, অতএব গভীরভাবে তল্লাস না করিয়া

মুখের মধ্যে যে টুকু পাই—ইত্যাদি।

আরো মজা সংসারের রাজপথে বুদ্ধি যে পথে চলে, মনের চাল, অনেক সময়েই তাহার বিপরীত। গভীর কথা বলিলে যে ঠাট্টা মনে করে, ঠাট্টাকে অকাট্য সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়—ঠাট্টা ও সত্যের 'কমেডি অব্ এররস্' তো সংসার-রঙ্গমঞ্চে এ জন্য লাগিয়াই আছে। কাজেই হৃদয়ে যখন গভীর ব্যথা, তাহাকে লঘু করিয়া কথা কহিতে

হয়। আর বিদ্রূপের উচ্চহাস্যকে অশ্রুজলের উজান ঠেলিয়া ছাড়া পাঠাইবার উপায় নাই। সুখের দিনে ব্যথা দেওয়া, ব্যথার দিনে সুখের ভান—করিতেই হয়, কারণ মন মহাশয়ের চাল যে উল্টা। অশ্রুজলের সরোবরে নভঃশায়ী মাছটা দেখিতেছি অধোবদনে, কিন্তু তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বানটা নিক্ষেপ করিতে হয় ঊর্দ্ধ দিকে।

[ভীরুতা, দ্রষ্টব্য]

এমন অদ্ভুত যাহার স্বভাব, তাহার উপর জুলুম চলে না। দৈবাৎ যদি মন পাওয়া যায় ভালো, আবার দৈবাৎ যদি মন দিয়া ফেলি ভালো; ইহার অধিক আর মানুষে কি করিতে পারে, কারণ—

চলেন তিনি গোপন চালে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেহ্-বা তাঁরে দিচ্ছে এবং
কেহ-বা তাঁরে নিচ্ছে :

এই হাস্যকর ও প্রাণান্তকর সত্যটা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মন-দেওয়া-নেওয়া সম্বন্ধে কবির এই প্রকার অনির্দ্দিষ্ট শৈথিল্য। তুমি যদি মন না দাও তবু দুঃখ নাই—

তুমি যদি আমায় ভালো না বাসো
রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই ;

আসল কারণ তোমার মনের মালিক তুমি নিজেও নও। আবার, আমাকে মন দিলেও ভাবনার অন্ত নাই—

আমায় যদি মনটি দেবে,
দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।

ইহার সরল টীকা এই যে—মনের বদলে মন না পাইলে দুঃখ করিও না, কারণ আমার মনের মালিক আমি নিজে নই।

এমন অবস্থায় বুদ্ধিমানের লক্ষণ হাতে হাতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করা। ইহাতে অল্প হইলেও কিছু পাওয়া যাইবে, নতুবা, এমন অদ্ভুত জিনিসের বাজারে পাইকারী কারবার করিতে গেলে ঠকিবার আশঙ্কাই ষোল আনা। হাতে হাতে পাইয়াও বেহাৎ হইয়াছে এমন নজীরের অভাব নাই। মরু-পাহাড়ের দেশে পথ

চলিতে একটী আঙুর ফল পাইয়াছিলাম। দারুণ তৃষ্ণাতেও তাহা ব্যবহার করি নাই; মুঠার মধ্যে চাপিয়া পথ চলিয়াছি। [একটি মাত্র, দ্রষ্টব্য]

তৃষ্ণা-দীর্ঘ সংসার-পথে এমনি করিয়া কত না দুর্লভ আঙুর ফল আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি; কেন-না, বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের কাছে বাঁধা দিয়া 'আরো-চাইর' ভাণ্ডার দ্বারে মাথা ঠুকিয়া মরার লোভ সংবরণ করিতে পারি না। মনের এই যে নূতন পরিচয় ইহাও কবির সহজ-রসজাত।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী এই সহজরসের প্রকাশ কবির জীবনের যৌবন-বিদায়-প্রসঙ্গে। ক্ষণিকা কাব্য যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সীমান্ত; কিন্তু দুই রাজ্যের সীমান্তে শত্রুতার চিহ্ন বড় বড় দুর্গে কণ্টকিত হইয়া বিরোধ প্রচার করিতেছে না। দুই মিত্ররাজ্যের সন্ধিস্থল অমনোযোগী দর্শকের চোখেই পড়ে না, কেবল সুক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে একটা পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে। এ যৌবন-বিদায় অনিচ্ছুক যযাতির ক্ষুব্ধ ক্রন্দনে ধ্বনিত নহে; দিবস-সন্ধ্যায় যেমন, নদী-সমুদ্রে যেমন, ফুল-ফলে যেমন, অতি অনায়াসে, অতি অলক্ষ্যে, একটীর আর একটীতে পরিণতি।

তাহারে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধ'রে বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব সর্ব্বনেশে।

যে শান্তি ও নির্ব্বেদে কবি যৌবনকে বিদায় দিলেন, তাহা কবির জীবনের শেষ কথা নয়; পরবর্ত্তী জীবনে নানা প্রবলতর স্রোতে শান্ত এই নদীকে পুনরায় স্ফীত করিয়া তুলিবে। [পরামর্শ, দ্রষ্টব্য]

যাহা হোক, এই রকম বিষাদপূর্ণ বিরতির সহিত কবি চল্লিশের ঘাট হইতে যৌবন-তরীকে বিদায় দিয়াছেন। এই তরীর বাণিজ্যে তাঁহার কত লাভ হইয়াছে, সে হিসাব তিনি করিলেন না, শুধু মনে একটা ক্ষীণ আশার মত রহিল যে, এত বারের আনাগোনায় যদি কোনো সোনা-করা চরণ ইহাতে পড়িয়া থাকে, তবে ইহার অস্তিত্ব সার্থক!

একে একে আমরা কবির ব্যক্তিত্বকে নানা দিক্ হইতে দেখিলাম, এখন সেই ব্যক্তি আমাদিগকে কি ভাবে দেখিয়াছে, তাহার আলোচনা আবশ্যক। সংসারের প্রতিও কবির এই রকম একটা নিরভিমান বিরতির সুর।

সংসারের সুদীর্ঘ যাত্রায় অনেক সুখ ও ব্যথা কবি পাইয়াছেন, কিন্তু আজ পথের শেষে কি বাকি রহিল! সংসারের গোলাপ ঝরিয়া গেল, কাঁটার আঘাত শুধু রহিল। ভবিষ্যতের শাখায় সংসারের আরো অনেক ফুল ফুটিবে, কিন্তু তাহা সম্ভোগের সুযোগ কবির হইবে না! কিন্তু তবু কবির ইহাতে ক্ষোভ নাই, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস মাত্র। এই কবিতাটিতে যে সুর, সংসারের প্রতি মনোভাবের তাহা প্রতীক। [স্থায়ী-অস্থায়ী, দ্রষ্টব্য]

কোথায় দুই বোন জল আনিতে গিয়া তাঁহার দিকে একবার সকৌতুক হাস্য বিনিময় করিল। বাস্ এইটুকু, তাহাতেই কবির সন্তোষ! আর সেই যে মেয়েটি খেয়া নৌকায় ধানের আঁটি বহিয়া পার হইয়া গেল, কিন্তু ঠিকানা বলিয়া গেল না! চিত্তপটে কবি তাহাকে বারবার আঁকিতে ও মুছিতে লাগিলেন, কিন্তু বস্তুজগৎ-গত ঐ মেয়েটিকে একবারও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন না। [দুই বোন, যাত্রী, দ্রষ্টব্য]

তাঁহারা দুইজন এক গাঁয়ে থাকেন এই তো যথেষ্ট। তাঁহার নাম তো গাঁয়ের পাঁচ জনে জানে। ইহাতেই কবির সন্তোষ! বাস্তবিক জীবনে কি এতদধিক আর কিছু সত্যই পাওয়া যায়! আর সেই যে ময়নাপাড়ার মাঠে আসন্ন বাদলের আনতচ্ছায়ায় বালিকাটি! গাঁয়ের লোক যাহাকে কালো বলে, কবি যাহাকে নাম দিয়াছেন কৃষ্ণকলি! আষাঢ়ের অঞ্জনাভ কালো মেঘের সহিত মিলিয়া গিয়া তাহার কালো দৃষ্টি কবির প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল কি না আজ তাহা কেবল অনুমানের বিষয়। [এক গাঁয়ে, কৃষ্ণকলি, দ্রষ্টব্য]

আজ সব জিনিসকেই, শুধু সেই অজ্ঞাতনাম্নী নারীটিকে নয়, তিনি বলিতে পারেন,

> যেমন আছ তেমনি এস
> আর কোরো না সাজ।
>
> *　　*　　*
>
> এসো হেসে সহজ বেশে
> নাই বা হ'ল সাজ।



সুখ-দুঃখ কিছুই সংসারের একান্ত নয়। সুখটাই তো একক নয়! রথের মেলায় তালপাতার বাঁশী হাতে মেয়েটির পাশেই, সেই রোরুদ্যমান বালকটি, একখানি রঙীন লাঠি কিনিতে যাহার একটি পয়সা নাই। দুই-ই আছে, দুই-ই সমান সত্য! সুখ-দুঃখের সাম্যে সংসারের তুলাদণ্ডে ভার-সাম্য ঘটিয়াছে। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দুর্দিনের ঝাপ্টায় যখন মন উদ্‌ব্যস্ত, তখন ছেলেবেলার তুফানে নালার জলে নৌকা-ডুবির কথা মনে পড়িয়া যায়। তোমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোনোটাই

আসে নাই। তাহার নিয়মে সে আসিল, নৌকার নিয়মে নৌকা ডুবিল। অনেক সুখ তো পাইয়াছ, দুঃখ ও কিছু পাইবে, এই তো সত্য। [সুখদুঃখ, খেলা, দ্রষ্টব্য]

তোমার মাপে হয়নি সবাই,
তুমিও হওনি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়,
কেউ বা মরে তোমার চাপে ;—
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি ?
তেমন করে' হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।

*   *   *

মান্ধাতারি আমল থেকে
চলে আস্‌ছে এমনি রকম ;
তোমারি কি এমন ভাগ্য
বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম ?

সংসারে-হাটে বেচা-কেনায় কবি অনেক ঠকিয়াছেন, তবু নিরবচ্ছিন্ন ফাঁক তাঁহার ভাগ্যে নয়। ক্ষতি যতই হোক না কেন, প্রহরার পণ, পারানীর কড়ি, দোকানীর মূল্য, ভিক্ষার দান, এমন কি দস্যুর লোভ মিটাইয়াও গৃহের জন্য সর্ব্বদাই কিছু থাকে। তবে ইহা নির্ভর করে নিজের দৃষ্টির প্রতি। [কৃতার্থ, দ্রষ্টব্য]

তেমন করে' হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।

'উদাসীন' ও 'শেষ' নামে কবিতা দুইটিতে কবি এই ভাবটিকে বিশদ ও গভীরতর ভাবে পরিণতির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্ব-লিখিত অংশের সহিত এ দুইটি জুড়িয়া পড়িলে কবির বক্তব্য ও তৎপ্রসঙ্গে এই আলোচনা সর্ব্বাঙ্গীণতা লাভ করিবে।
এতক্ষণ যে সংসারের কথা বলিলাম, কবির ব্যক্তিত্ব হইতে তাহা স্বতন্ত্র। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ নয়। আরো দুই পর্য্যায়ের কবিতা আছে, প্রকৃতি- ও কাল-বিষয়ক, যাহার আলোচনা এই প্রসঙ্গে কর্ত্তব্য।

মানব- ও প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় বস্তুতঃ ভাগ করা চলে না, তবে যাহাতে প্রকৃতির সহিত একাত্মকতা অধিকতর, তাহাকে আলোচনার সুবিধা জন্য স্বতন্ত্র

ধরিয়া লইয়াছি। কবি-চিত্তের সহজরসবোধ প্রকৃতির সরল ও আপাততুচ্ছ দৃশ্যগুলিতে প্রতীক খুঁজিয়া লইয়াছে। পল্লীগ্রামের পথ, বর্ষার গত-উদ্বেলতা-শূন্য নদীর পার; শারদীয় স্বচ্ছ-আনন্দের মধ্যে শুভ্র কাশহিল্লোলিত নদীর চর; মেঘমুক্ত বর্ষা-প্রভাত; আসন্ন আষাঢ়ের ছায়া-গভীর অপরাহ্ণে দুইটী করুণ চক্ষু—ইহাই প্রধানতঃ কবির উপজীব্য। বর্ষার দুইটি কবিতা আছে, 'আষাঢ়' ও 'নববর্ষা'। আষাঢ় কবিতাটিতে বর্ষার গম্ভীররূপের প্রতি তত লক্ষ্য নাই—যতটা তাহার মানুষ-ঘেঁসা মূর্ত্তিটিতে। নববর্ষাতে মনুষ্য লোকাতীত বর্ষার নিজস্ব গম্ভীর মূর্ত্তি। নানা কারণে ইহা ক্ষণিকা পর্য্যায়ের নহে।

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে;
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে!

কোকিল-ডাকা পথ দিয়া কবি নিজ মনে চলিয়াছেন। মানুষের কথা প্রত্যক্ষতঃ তাঁহার মনে নাই, কেবল আভাসতঃবার দুই গৃহকর্ম্মরত কলস ও কিঙ্কিণী ধ্বনিত হইয়া সরল এই পল্লীদৃশ্যের অন্তরালে ব্যস্ত যে মানব জীবন আছে—তাহা কবির কল্পনায় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতিরস এখানে লক্ষ্য, মানবরস উপলক্ষ মাত্র।

এখানে অভাসতঃ যে মানবরসের পরিচয় পাইলাম, 'কূলে' কবিতায় সে রস আরো সুদূর। যদিও নদীর ঘাটটি স্নানের, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, তারপরে কেবল

ভাঙা পাড়ির গায়ে শুধু
শালিখ লাখে লাখে
খোপের মধ্যে থাকে।

এবং এ ভাঙা পাড়ে ধেনু জলপানে আসে না, শুধু দূর গ্রামের দু-চারিটি ছাগ চরিয়া বেড়ায় আর থাকিয়া থাকিয়া

জলের পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর শাখা হ'তে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।

রবীন্দ্র-কাব্যে "বস্তুতন্ত্রতা" নাই যাঁহারা বলেন, তাঁহারাও বাঙলাদেশকে এমন সহৃদয়তা ও নিপুণতার সহিত দেখিয়াছেন কি না জানি না! তবে বাস্তু-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথে

নাই, কিন্তু বস্তি ছাড়া আর কিছু বস্ত নয় এমন অসার মতে বোধহয় বস্তুতন্ত্রতা প্রকাশ পায় না।

'দুই তীরে' যাঁহারা আছেন, তাঁহারা মানুষ হইলেও উপলক্ষ; লক্ষ্য এ-পারের শরৎকালের চর, ও-পারের ঘনচ্ছায়া বন, আর মাঝখানকার অর্থবহুল নদীর কলধ্বনি। দু-পারের মানুষ দুটির অস্তিত্বের মূল্যবান্ ফ্রেমে বাঁধানো প্রকৃতির এই চিত্রটিই প্রধান উপভোগ্য। 'আষাঢ়' ও 'অবিনয়' বর্ষার কবিতা। কিন্তু এ বর্ষা আত্মসম্পূর্ণ মনুষ্যলোক হইতে স্বতন্ত্র, চিরন্তন কালের বর্ষা নহে। ইহা মানুষের বর্ষা; মানুষের দিগ্‌বলয়ে আপনার বৃহৎ রূপকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া ইহা প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। বস্তুতঃ 'অবিনয়ে' বর্ষা ও নিরুপমার মধ্যে কে যে লক্ষ্য তাহার নির্ণয় দুরূহ। বর্ষার প্রত্যেকটি চিত্রের সহিত নিরুপমাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়া উভয়কে সমান আসন দেওয়া হইয়াছে। আর 'আষাঢ়' কবিতায় বিশাল আকাশ গৃহ-প্রাঙ্গণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে দিক্‌বলয়িত।

প্রথম শ্লোকে, পাঠকের চিত্তকে গোড়াতেই প্রকৃতির উদ্বেলতা হইতে গৃহে আনিবার চেষ্টা। গৃহে থাকিয়াও যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহা মানুষের হাতের কাজ

বাদলের ধারা ঝরে ঝর-ঝর
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর,

দ্বিতীয় শ্লোকে প্রকৃতির কোনো সঙ্গীত নাই।

ওই ডাকে শোন ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আন গোহালে।

ইহা সংসারাতীত সঙ্গীত নয়।

তারপরে—

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্‌দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরেছে কি?
রাখাল বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে।

তৃতীয় শ্লোকে বর্ষানদীর তরল কলধ্বনি সুন্দর ফুটিয়াছে, কিন্তু সে নদী, সে ঘাট একান্তভাবে প্রকৃতির নয় তাহা খেয়া-পারাপারের ঘাট, এবং বর্ষার সঙ্গীতে যে-ধ্বনি মিশ্রিত তাহা মানুষের খেয়া-মাঝিকে আহ্বানের কণ্ঠস্বর। চতুর্থ শ্লোকে

আবার সেই পূর্ব্বোক্ত নিষেধ। এ প্রকৃতি বিশেষ করিয়া ক্ষণিকার প্রকৃতি, মানুষ-ঘেঁসা এবং স্বল্প; আপনার বৃহৎ গম্ভীর রূপ ক্ষণিকার সহজ মনের স্বচ্ছ চাদরে আবৃত করিয়া আসিয়াছে। নববর্ষা হইতে ইহার পার্থক্য কোথায়, তাহা যথাসময়ে আলোচনা করিলে, আমার বক্তব্য আশা করি আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কবি 'সেকাল' কবিতাটিতে কালিদাসের কালে জন্মগ্রহণ করিলে কি করিয়া জীবনযাপন করিতেন—তাহার একখানি চিত্র দিয়াছেন। কাব্য ও জীবন তখন শিশুর মত একই দোলায় দিনযাপন করিত; সেই মানসলোকের ছবিখানি আমাদের মত নীরস পাঠকেরও চিত্ত আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহা চিরদিনের জন্য আয়ত্তাতীত বলিয়া কবির বিশেষ দুঃখ নাই। তাঁহার এই সান্ত্বনার মূলে বর্ত্তমান কালের প্রতি গভীর আসক্তি। তিনটা কালের মধ্যে বর্ত্তমানটাই সহজ ও প্রত্যক্ষ ও সত্য। অন্য দুইটা কালকে বর্ত্তমানের কঙ্কাল দিয়া রচনা করিয়া কল্পনায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। যদিও কালিদাসের কালের বরাঙ্গনাগণ অন্তর্হিত, জীবনের সেই অংশের অভিনেতৃগণ অনুপস্থিত, কিন্তু সেই রঙ্গমঞ্চ তো পড়িয়াই আছে। বকুল তেমনি করিয়াই ফুটিতেছে, এবং ফাল্গুনে অশোক তরুচ্ছায়ায় দক্ষিণ সমীরণ তেমনি করিয়াই প্রাণে অহৈতুক আনন্দ জাগাইয়া দেয়।

কিন্তু কালিদাসের কালের তাঁহারা কি সত্যই নাই! বর্ত্তমানের ইহাদের মধ্যেই অতীতের তাঁহারা বিরাজ করিতেছেন।

> মরব না ভাই নিপুনিকা
> চতুরিকার শোকে,
> তাঁরা সবাই অন্য নামে
> আছেন মর্ত্ত্যলোকে।

কাল-মাহাত্ম্যে অবশ্য কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহারা এখন—

> পরেন বটে জুতা মোজা,
> চলেন বটে সোজা সোজা,
> বলেন বটে কথাবার্ত্তা
> অন্য দেশীর চালে;

কিন্তু তাঁহাদের চক্ষের চাহনি প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে, ইহারাই নামান্তরে সেকালেও ছিলেন। ক্ষণিকা ব্যতীত অন্য কোন কাব্যে এমন ক্লাসিকাল চিত্রময় কবিতায় জুতা-মোজার আমদানী নিশ্চয়ই হাস্যকর হইত। স্মিতরসোজ্জ্বল ক্ষণিকার

পারিপার্শ্বিকে জুতা-মোজাও দিব্য মানাইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত একরকম হইল। কিন্তু এবারে বর্ত্তমানের কবি কালিদাসের উপরেও একহাত লইয়াছেন।

আপাতত এই আনন্দে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস তো নামেই আছেন
আমিই আছি বেঁচে।

নামে থাকার চেয়ে বাঁচিয়া থাকা অনেক বেশী মূল্যবান্; এখানে বর্ত্তমানকে পূরা দাম দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানের স্বাদ গন্ধ উজান বহিয়া অতীতে আর যাইবে না, কিন্তু অতীতের আস্বাদ কবি বাঁচিয়া থাকিয়াই পাইবেন। আর কালিদাসের নারীদের আভাস তো বর্ত্তমানে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু···

আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।

অত্যন্ত কৌশলে বর্ত্তমানের বিনোদিনীকে কালিদাসের রমণীগণের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করা হইয়াছে; ইহাতে অতীতের উপরে বর্ত্তমানেরই জয়! কাব্যের উপরে জীবনের জয়!

এ যেমন অতীতের কথা, 'কর্ম্মফলে' ভবিষ্যতের কাহিনী। পরজন্ম সত্য হইলে কবিকে আবার বাংলা দেশের রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে জীবন একদিন যাপন করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। অতীত ভবিষ্যতের দুই পাখা গুটাইয়া কবি বর্ত্তমানের আকাশে মুগ্ধ ও নিস্তব্ধ হইয়া আছেন। প্রাক্‌বর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কাব্য হইতে ক্ষণিকার ইহাও একটা বিশেষত্ব। এই বর্ত্তমানের প্রতি আসক্তিতে বোঝা যায়, কাব্য ও জীবনকে ক্ষণিকার কবি একবৃন্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

'আবির্ভাব', 'কল্যাণী', 'অন্তরতম', 'সমাপ্তি': এই চারিটি কবিতা ক্ষণিকা পর্য্যায় হইতে একটু স্বতন্ত্র। ইহাদের মধ্যে জীবন-দেবতা ছাড়া অন্য সুরও লাগিয়াছে। 'আবির্ভাবে' জীবন-দেবতার সহিত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর মিলন; এই দুইটিতে মিলিয়া সমস্ত কবিতাটির রসোদ্বোধন করিয়াছে। 'কল্যাণী'তে জীবন-দেবতার ও আদর্শায়িত গৃহলক্ষ্মীর মিলন। শেষের দুটিতে জীবন-দেবতা, কাব্যলক্ষ্মী, গৃহলক্ষ্মী মিলিয়া বিচিত্র রসের প্রেরণা দিয়াছে। 'সমাপ্তি' কবিতাটির নামে মনে হয় গ্রন্থ শেষের জন্য হয়তো বিশেষ করিয়া ইহা লিখিত। 'আবির্ভাব' ছাড়া, অন্য তিনটিতে ক্ষণিকার সুর যে একেবারে নাই, তাহা বলা চলে না। সহজ-সরলতা ও ক্ষোভহীন

অবসানের মাধুর্য্যে ইহারা পূর্ণ। এমন কি 'আবির্ভাবের' ছন্দ ও ভাষার পূর্ণতা, যদিচ, ঠিক ক্ষণিকার সর্ব্বাঙ্গীণ সরলতাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে না, তবু এই বিচিত্র লক্ষ্মীকে কবি যে গৃহে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা ক্ষণিকার পাতার কুটীর এবং যে বাঁশীতে তাহার প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সেই বেতসের, যাহাতে ক্ষণিকার সরল গানগুলি এতক্ষণ ধ্বনিত হইয়াছে।

'নববর্ষা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু ইহা ক্ষণিকা পর্য্যায়ের নহে। সোনার তরী চিত্রায় ইহার যথার্থ স্থান, এমন কি কল্পনাতেও ইহাকে বেমানান হইত না। কেন যে ইহা ক্ষণিকা পর্য্যায়ের নহে সেই প্রসঙ্গে কবিতাটি আলোচনা করা যাক্। আরো দুইটি বর্ষার কবিতা লওয়া যাক্, 'আষাঢ়' ও 'মেঘমুক্ত'। পরবর্ত্তী দুইটিতে যে রসপ্রবাহ স্বচ্ছ সরল স্রোতে হৃদয়ের উপরিতলে আঘাতমাত্র করিয়া লঘুভাবে প্রবহমাণ, নববর্ষায় আসিয়া তাহা যেন গভীর ও উদ্বেল হইয়া হৃদয়ের তীর ছাপাইয়া উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সঙ্গীত ক্ষণিকার স্মিতরসকে উপেক্ষা করিয়া, জীবনের লঘুভাবটিকে অস্বীকার করিয়া, যে-রাগিণী ধ্বনিত করিয়াছে, তাহা বর্ত্তমানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ত্রিকালব্যাপী সমগ্র অস্তিত্বের ভিত্তি কাঁপাইয়া তোলে। পরবর্ত্তী কবিতা দুটিতে হৃদয়ের সেই লঘু ভাব; ইহারা বর্ত্তমানের বৃন্তে মানুষ-ঘেঁষা বর্ষা। নববর্ষার বর্ষা কালের দিক্‌চক্রের দ্বারা আবদ্ধ নয়; মানবজীবনের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই এমন হইতে পারে না, তাহা হইলে ইহা কবিতাই হইত না; যে মানব-জীবনের সহিত ইহার সম্পর্ক তাহা আদর্শায়িত মানব-জীবন; প্রত্যক্ষ সংসারের সহিত ইহার কোনো যোগ নাই। ইহার পটভূমিতে কালিদাসের কাব্য ও বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী। কালিদাসের নায়িকাদের ও বৈষ্ণবের রাধিকার নানা আভাসে ইঙ্গিতে ইহার আকাশ পরিপূর্ণ। এক কথায় জীবনকে এখানে কাব্যের অন্তর্বর্ত্তী করিয়া দেখা হইয়াছে। আষাঢ় কবিতার আলোচনা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

আবার 'মেঘমুক্ত' কবিতায় ক্ষান্তবর্ষণ যে বর্ষাদিনের বর্ণনা, তাহা বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের একখানি ছবি। যে ছবি কোনো আদর্শায়িত চিত্র নহে,

তোমাদের সেই ছায়া-ঘেরা দীঘি,

ইহা বিশিষ্ট একখানি ছবি, 'তোমাদের' বলিয়া তাহাকে একেবারে আঙিনার গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। ঘাটে ঘাটে তাহার স্নানরত মানুষ; তাহাদের সুখ-দুঃখের কথায় জলতল শঙ্কিত। আবার 'আষাঢ়ে' যেমন—

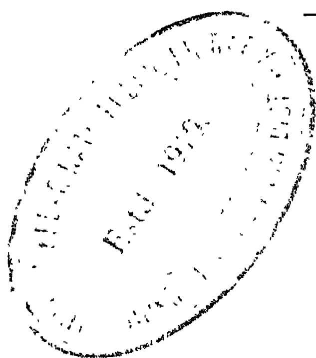
ওরে আজ তোরা যাস্‌নে, ঘরের
বাহিরে!

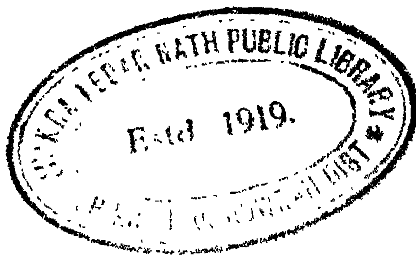
বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন, এখানে তেমনি—সকলকে আহ্বান করিয়াছেন—

মেঘ ছুটে গেল নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।

বলিয়া সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। উভয় স্থানেই বর্ষার সহিত সংসারের যোগ স্থাপিত হইয়াছে। 'নববর্ষায়' এ রকম কোনো আহ্বান বা উল্লেখের দ্বারা বর্ষার সহিত সংসারের অর্থাৎ বর্ত্তমানের যোগ স্থাপন করিয়া দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমানের যোগ বিরহিত এই বর্ষা অনাদিকালের মেঘরাশি হইতে চিরন্তনকালের ধরণীতলে ঝরিয়া পড়িতেছে। যাহারা এই উৎসবে যোগ দিয়াছে, তাহারা কাব্যরাজ্যের ব্যক্তি, আদর্শায়িত তাহাদের জীবন ; তাহারা চিরন্তনের অধিবাসী।

কল্পনার 'বর্ষামঙ্গলের' সহিত ইহা তুলনীয়। তবে প্রভেদ এই যে, 'নববর্ষা'র প্রারম্ভে ও অন্তে কবির ব্যক্তিগত ভাবরসের উল্লেখ করিয়া চিরন্তন কালের এই বর্ষাকে বর্ত্তমান কালের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছেন : তাহাতে ইহা আরো বেশী করিয়া চিরন্তনের সঙ্গীত হইয়া উঠিয়াছে, কারণ—বর্ত্তমানও চিরন্তের অন্তর্গত। এই আলোচনার উদ্দেশ্য—কবিতাটিকে ক্ষণিকা পর্য্যায় হইতে পৃথক্ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করা—ইহার উৎকর্ষতা বিচার নহে। ইহা আপন মাহাত্ম্যে বঙ্গসাহিত্যের একটি অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা।





কল্পনা

চৈতালির প্রসঙ্গে দেখিয়াছি কবি কি ভাবে সোনার তরী হইতে সুরু করিয়া পদ্মার প্রবাহে দেশের নাড়িটিকে এবং অবশেষে শাখা-উপশাখা নদ-নদীর মধ্যে দেশের শিরা-উপশিরাকে অনুধাবন করিয়া আসিতেছিলেন। সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালি, এই তিনখানি কাব্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের সহিত দেশের লোকজীবন, পল্লীজীবনের মিলনের পরিচয় আছে। আবার অন্যপক্ষে, সাধনা ও অন্যান্য গদ্যপ্রবন্ধে দেশের কর্ম্মময় জীবনের প্রচেষ্টার ইতিহাস নিবদ্ধ। কিন্তু উভয়ত্র কবির দৃষ্টি বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষতায় সঙ্কীর্ণ। এখন যে কাব্যগুলির কথা বলিব তাহাদের মধ্যে কবি বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া গেলেন।

কল্পনা, নৈবেদ্য, কথা ও কাহিনী ১৩০৪ হইতে ১৩০৮এর মধ্যে অর্থাৎ কবির ছত্রিশ হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সে লিখিত।

এই কাব্যগুলিতে প্রত্যক্ষতঃ কোথাও পদ্মার চিহ্ন বা প্রভাব নাই বলিয়া মনে হয়; মনে হয়, কবির পূর্ব্বজীবনের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহারা স্বতন্ত্র এক পদার্থ। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে। পদ্মা ও তাহার শাখানদী কবিকে বর্ত্তমানের সহিত মুখোমুখী পরিচয় করাইয়া দিয়াছে। এখানে তাঁহার বিচিত্র জীবনের সুরু—শেষ নহে। স্বভাবতঃই এই বর্ত্তমান হইতে তাঁহার দৃষ্টি অতীতের দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। এই অতীতকে, অতীত ভারতবর্ষকে জানিবার ইচ্ছা হইতেই কল্পনা, নৈবেদ্য, কথা ও কাহিনীর জন্ম। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রত্যক্ষতঃ পদ্মার প্রভাব না থাকিলেও কবির চিত্তকে অতীতের দিকে প্রসারিত করিয়া দিবার পক্ষে পদ্মার প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে।

উপরি উক্ত তিনখানি কাব্যকে এক পর্য্যায়ে ফেলা যায়;—ইহাতে কবির অতীত ভারতে মানস ভ্রমণের ইতিহাস লিখিত।

কল্পনাতে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্য-বিচিত্র কাব্য, পুরাণ ও জীবনের কথা। কথা ও কাহিনীতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে কর্ম্মময় জীবনের ও নৈবেদ্যে প্রাচীন ভারতের ধ্যানস্তম্ভিত গভীর অধ্যাত্ম-জীবনের কথা।

চৈতালিতে আসিয়া কবির জীবনের একটা পর্ব্ব যে সমাপ্ত হইয়াছে তাহা এই কারণেই। পূর্ব্ব পর্য্যায়ের তিনখানি কাব্য প্রধানতঃ বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ ভিত্তি ও

ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরের উপর স্থাপিত। কল্পনা প্রভৃতি কাব্য তিনখানি পরোক্ষ কল্পনার অসীম ও বৃহত্তর অতীত জীবনের বিরাট্ পাদপীঠের উপরে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাই বলিয়া বিচ্ছেদ আছে বলা চলে না; বর্ত্তমান ও অতীতে যেটুকু প্রভেদ—অর্থাৎ সাধারণ লোকের চক্ষে—সেইটুকু মাত্র। কবির চক্ষে কালপ্রবাহ অখণ্ড; তাঁহার নিকটে ভারতের অতীত ও বর্ত্তমানে যেমন বিচ্ছেদ নাই—তেমনি অবিচ্ছেন্ত সম্পর্কে গ্রথিত এই দুই কাব্য-পর্য্যায়—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। মানুষ বিশ্বলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় শক্তিদ্বারা এই বিশ্বলোকের পার্শ্বে আর একটি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে—শিল্পলোক। এই শিল্পলোকের অন্তর্গত সাহিত্যলোক। ইহা তাহার কাছে বিশ্বের অপেক্ষা খাটো নহে,—অনেক সময়েই বিরাট্তর ব্যঞ্জনায় পূর্ণ। শিল্পিগণ নূতন সৃষ্টির সময়ে কখনো এই বিশ্বলোক হইতে, কখনো এই শিল্পলোক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকে। সাহিত্য রচনায় যেমন প্রকৃতির বর্ণ, গন্ধ, শব্দ গ্রহণ করিলে তাহাকে চুরি বলা চলে না -তেমনি কালিদাস, ব্যাস, বাল্মীকির শিল্পজগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিলে তাহা চুরি বলিয়া না ধরাই কর্ত্তব্য। 'কল্পনা' এই শিল্পলোকের উপাদানে বহুল পরিমাণে গঠিত।

সোনার তরী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবি বর্ত্তমানের কথা, ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলিয়াছেন—তিনি একেবারে জীবনের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া বিশ্বলোক হইতে হাতে হাতে মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার চক্ষু অতীতের দিকে—দূরবর্ত্তী দেশ ও কালের দিকে—যে জীবন, আজিকার ভারতবর্ষ হইতে নিঃশেষে অপসৃত হইয়াছে—সেই জীবনের ইতিকথা কবির বক্তব্য। কাজেই কবিকে সেই পুরাতন জীবনের সৌন্দর্য্য-জিজ্ঞাসু হইয়া এই শিল্প-জগতের সাহায্য লইতে হইয়াছে। এই সৌন্দর্য্য-ব্রতে কালিদাস তাঁহার প্রধান সহায়। 'কল্পনা'র বহু কবিতায় এই শিল্পজগতের পরিচয় আছে; বর্ত্তমানের মহাকবি প্রাচীন কবিদের শিল্পজগতের চশমা চোখে দিয়া অতীত জীবনকে দেখিয়াছেন, কাজেই তাহার রংটা শিল্পলোকের, কিন্তু এই দৃষ্টি তো পুরাতন নহে, অপরের নহে, তাহা আধুনিক এবং রবীন্দ্রনাথের একান্তভাবে নিজস্ব।

আরো দুই একটি আবশ্যক কথা মনে রাখিয়া 'কল্পনা' পাঠ করা উচিত। আধুনিক মানবমন অত্যন্ত উৎকটভাবে তত্ত্বপরায়ণ, কেবলমাত্র নিছক সৌন্দর্য্য, গল্প তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। সে বলিয়া ওঠে,—সৌন্দর্য্য, চিত্র, গল্প, এ সবই উত্তম; কিন্তু এই যে সুন্দর বস্তু, চিত্র, গল্প, এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি সেইটাই আমার লক্ষ্য; সৌন্দর্য্য ও গল্পটা উপরি-পাওনা। এই আধুনিক মন যতক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তুর সহিত নিজের আপেক্ষিক সম্বন্ধটি উপলব্ধি করিতে না পারে ততক্ষণ যেন

তাহার স্বস্তি নাই। কিন্তু প্রাচীন কালের মন এমন একান্তভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিল না, তাহার একটি অতি সরল বিবিক্ত, নিরাসক্ত ভাব ছিল। সুন্দর বস্তু দেখিয়া, সুন্দর গল্প শুনিয়াই সে খুসী, তত্ত্বের কথা তাহাকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিত না।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বের কাব্যগুলি আধুনিক মনের সৃষ্টি। তাহাতে কেবল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিয়া তৃপ্তি নাই, সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্বটিও মন্তব্য আকারে সৃষ্টিকে অনুধাবন করিয়াছে। কিন্তু কবি যখন প্রাচীন জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন যেন তিনি তাঁহার এই আধুনিক মুখর মনটাকে কথঞ্চিৎ শান্ত সংযত বিবিক্ত করিয়া নিছক শিল্পীর মত সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। প্রাচীন জীবনের মর্ম্মের সহিত এমন নিবিড়ভাবে তিনি একাত্মকতা অনুভব করিয়াছেন যে, দৃষ্টিকে পর্য্যন্ত সেই অতীত জীবনের অবিমিশ্র সৌন্দর্য্য-দর্শনের উপযোগী করিয়া ফেলিয়াছেন প্রাচীন ভারতের বিচিত্র জীবনের, অভিনব শিল্প-জগতের, যে খণ্ড ছিন্ন অংশগুলি ইতস্ততঃ কাব্যে পুরাণে পড়িয়া আছে, তাহা কবির চিত্তে যে সুর, যে চিত্র জাগ্রৎ করিয়া দিয়াছে 'কল্পনা'র কবিতাগুলি তাহারই সহিত কবির মানব-ভাষায় উত্তর-প্রত্যুত্তর। লক্ষ্যকে উপলক্ষে পরিণত করিয়া ইহাতে তত্ত্বের কোঠায় পৌঁছিবার প্রয়াস নাই।

ভাষা ও ভঙ্গীর প্রসাধন-কলা 'কল্পনার' বৈশিষ্ট্য। পূর্ব্ব পর্য্যায়ে কাব্যের মূলে ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা; ইহা সজীব, প্রতিনিয়ত নব নব অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে আহত হইতে হইতে চলন্ত জীবনের সঙ্গে তাল রাখিয়া ইহা বর্দ্ধমান, ইহার প্রধান লক্ষণ গতিবেগ। এই চলমান অভিজ্ঞতাকে সার্থকভাবে রূপ দিতে গেলে কাব্য স্বভাবতঃই গতিপরায়ণ হইয়া ওঠে; তাই পূর্ব্ব পর্য্যায়ের কাব্যলক্ষণ—'সাধনবেগ'।

'কল্পনা'র ভিত্তি প্রধানত অপরের অভিজ্ঞতা, তাহা পূর্ব্ব পর্য্যায়ের কাব্যের অভিজ্ঞতার ন্যায় সজীব, ক্রিয়াশীল, গতিবান্ নহে। চলন্ত নদীতে কমল-বন সম্ভব নহে, কিন্তু সেই নদী যদি কালক্রমে মজিয়া গিয়া বদ্ধস্রোত সরোবর সৃষ্টি করে, তখন তাহার চতুর্দ্দিকে শৈবাল ও কমলে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়, তাহা উহার প্রসাধন-কলা। 'কল্পনা'র অভিজ্ঞতা সেই অতীত জীবনের স্রোতশ্চ্যুত বদ্ধ জলাশয়, স্থিতি ইহার বিশেষত্ব, গতি নহে। এই জাতীয় অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে গেলে, ভাষা, ছন্দ ও বাগ্‌ভঙ্গীর কারু-সুললিত প্রসাধন-কলার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। পূর্ব্ব পর্য্যায়ের কবিতার গতি বা সাধনবেগ স্বাভাবিক বলিয়াই তাহার পরিণাম কাব্যের বহিরঙ্গের সৌন্দর্য্যকে উত্তীর্ণ হইয়া তত্ত্বে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু কল্পনায় এই বেগ না থাকায় কাব্যের সৌন্দর্য্যে আরম্ভ, সৌন্দর্য্যেই অবসান

যেখানে পূর্ব্বের সাধনবেগ আসিয়া পড়িয়াছে, যেমন 'বর্ষশেষ' কবিতায়, সেখানে তাহা প্রচুর প্রসাধনের উপকরণে আপনার তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়া খানিকটা মন্দ-বেগ হইয়া পড়িয়াছে।

আরও একটা কথা। মানুষের চিত্ত-বৃত্তিকে যদি দুই ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব হয়, এক দিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, অপর দিকে মন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব কাব্যে দেখিতে পাই কাব্যের আরম্ভ ইন্দ্রিয়ের দৌত্যে, রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে; তাহার পরিণাম তত্ত্বরূপে। কল্পনার কাব্য ইন্দ্রিয়ের দৌত্যেই আরব্ধ ও সমাপ্ত। ইহার কবিতাগুলি রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে, শব্দে একেবারে নিটোল, নিখুঁৎ; মন ইহাতে খোদার উপরে খোদকারি করিবার অবকাশ একেবারেই পায় নাই। এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস-কীট্‌সের সগোত্র।

স্বতোবিরুদ্ধতা কবিদের ধর্ম্ম। মানুষের চৈতন্যপ্রবাহ অখণ্ড ও একাভিমুখী হইলেও, তাহার যোগানা সাত সমুদ্রের নাড়ির সঙ্গে। সেই সাত সমুদ্রের কখন্ কোন্‌টা হইতে যে কোটালের বান উচ্ছ্বসিত হইয়া আসে, দশ দিকের কখন্ কোনটা হইতে যে কি বাতাস জাগিয়া ওঠে, এই অখণ্ড চৈতন্যপ্রবাহে অমনি জোয়ারের জল ছুটিতে থাকে, বাত্যাতাড়িত তরঙ্গমালা পূর্ব্বতন গতিপথকে মুহূর্ত্তে অস্বীকার করিয়া অকস্মাৎ অভাবিত, অপ্রত্যাশিত, অননুভূত, অভূতপূর্ব্ব পথের সন্ধানে কল্লোলিত হইয়া ওঠে। মানুষের সকলেরই আভ্যন্তরিক দশা এই রকম; কবিরা বিধাতা পুরুষের অতিসূক্ষ্ম তুলাদণ্ড; তাহাদের নিক্তিতে এই পরিবর্ত্তন যেমন অনায়াসে ও অল্পে ধরা পড়ে, এমন অন্যদের মধ্যে হয় না।

এই স্বতোবিরুদ্ধতা কবিদের মধ্যে সর্ব্বাধিক, আবার কবিদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, চিত্তবৃত্তি যাঁহাদের সূক্ষ্মতর, এই স্বতোবিরুদ্ধতাও তাঁহাদের মধ্যে প্রবলতর। রবীন্দ্রনাথে স্বভাবতঃই এমনতর অনেক স্বতোবিরুদ্ধতার আভাস আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে একটি অখণ্ড প্রবাহ তাঁহার সমগ্র কাব্যে বর্ত্তমান, তাহাই আমাদের অনুধাবনের বিষয়। এই স্বতোবিরুদ্ধতা তাঁহার আন্তরিকতার ও হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম ছায়াময় ভাবগ্রহণের শক্তির পরিচায়ক; আর এই অখণ্ডতা মহান্ এক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার ও ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতার নিদর্শন।

'কল্পনা'য় বর্ত্তমানের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ লোকে যাত্রা; 'কল্পনা'য় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া প্রধানতঃ পরোক্ষ অভিজ্ঞতার রাজ্যে যাত্রা। এতদুভয়ের সন্ধিক্ষণের সন্ধ্যার সংশয়ের সুরে 'কল্পনা'র আরম্ভ। 'দুঃসময়' ও 'অসময়' কবিতা দুটি সন্ধ্যার শঙ্কা-সঙ্কুল বিষাদে পূর্ণ। সন্ধ্যার লগ্নটি সন্দেহের মুহূর্ত্ত। একদিকে দিবসের স্পষ্ট প্রখর আলো নিভিয়া আসিতেছে,

অন্যদিকে নক্ষত্র-ভাস্বর শান্ত নিবিড়তা এখনো প্রকটিত হয় নাই, এমন একটি দ্বিধার ক্ষণ সন্ধ্যা। যে দুইটি ভাবের কথা বলিলাম, তাহার সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কবি কেমন যেন উদ্বিগ্ন, সন্দিগ্ধ, অন্যমনস্ক।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া

এবং

যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া
*　　*　　*　　*
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি, অন্ধ, বন্ধ করোনা পাখা।

এই দ্বিধার মুহূর্তে কবির অপেক্ষাকৃত জড় অংশ ভীত ও সন্দিগ্ধ, কিন্তু তবু তাঁহার অগাধ বিশ্বাস নিজের অন্তরতম কবি প্রকৃতির প্রতি।

সম্মুখে অজগর-সদৃশ সাগর এবং সুদীর্ঘ রাত্রি, বিশ্বজগৎও ধ্যানে মগ্ন, তবু উহারই মধ্যে একটুখানি আশার আভাস বাহিরা দেখা দিল "দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।" কবির যেন মনে হইল, সূর্য্যের প্রত্যক্ষ আলো না পাইলেও, সেই আলোতে উদ্ভাসিত চন্দ্রের কিরণে অন্ধকার রাত্রিতে পথ চিনিয়া লওয়া অসম্ভব হইবে না। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন—

বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এস এস সুরে করুণ মিনতি মাখা;

যে তীরে এতদিন তাঁহার তরী নানা সুখদুঃখে, নানা পরিচিত অভিজ্ঞতার মধ্যে আসক্ত ছিল, আজ যে তীর দিগন্তে অপস্রিয়মাণ, সেই তীরের, সেই পরিচিত কণ্ঠের এই কাতর আহ্বান। কিন্তু যেখান হইতে একবার তাঁহার তরী সরিয়া আসিয়াছে, সেখানে আর নহে। এখন—

আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন

এবং তাঁহার অন্তরস্থ সেই বিহঙ্গের প্রতি বিশ্বাস।

'দুঃসময়' কবিতাটি 'কল্পনা'র প্রথম কবিতা, 'অসময়' প্রায় শেষের দিকের। দুটিই সন্দেহ-রস-প্রধান; তবু একটু পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে কবি সবে মাত্র

পথে বাহির হইয়াছেন, সম্মুখে দীর্ঘ রাত্রি ও দীর্ঘতর সমুদ্র, অজ্ঞাত ভবিষ্যতের প্রতীক। শেষের দিকের কবিতাটিতে, তিনি প্রায় গন্তব্য স্থানের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, শরীর ক্লান্ত, এবং চন্দ্রতারাহীন বন্ধ্যা সন্ধ্যা অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়া বাকি পথ অন্ধকারে ও আশঙ্কায় আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

দূরে কলরব ধ্বনিছে মন্দ মন্দ রে
ফুরাল কি পথ, এসেছি পুরীর কাছে কি?
মনে হয় সেই সুদূর মধুর গন্ধ রে
রহি রহি যেন ভাসিয়া আসিছে বাতাসে।

এত নিকটে আসিয়া শেষে যদি—
'হয়েছে কি তবে সিংহ-দুয়ার বন্ধরে!

মাঝে মাঝে প্রদীপের আলো ও নূপুর-নিক্কণ তাহা কি ঐ পুরীর—না শুধু সন্ধ্যার তারা ও ঝিল্লির ধ্বনি! সেই পুরীর বিচিত্র জীবনের নানা সুখ-দুঃখের ছবি তাঁহার কল্পনায় জাগিতেছে, সেখানে এতক্ষণ—

নব বসন্তে এসেছে নবীন ভূপতি,
* * * *
নব আনন্দে ফিরিছে যুবক যুবতী
* * * *
আজিকে সবাই সাজিয়াছে ফুলচন্দনে,
* * * *
এবং দলে দলে চলে বাঁধাবাঁধি বাহু-বন্ধনে,

একদিন এই পুরীতে প্রবেশ তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল কিন্তু—

এখন কি আর পারিব প্রাচীর লঙ্ঘিতে,
দাঁড়ায়ে বাহিরে ডাকিব কাহারে বৃথা সে।

কবির আশা আছে, এই সৌন্দর্যময় রহস্যপুরীর অভ্যন্তরে যদি-বা তাঁহার প্রবেশ অসম্ভব হয়—তবে—

দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।

প্রাচীন জীবনের বিচিত্র কারুকার্য্যময় সৌন্দর্য্যের রহস্যপুরীতে প্রবেশের জন্য তিনি প্রত্যক্ষ জীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। যদি এমন হয় যে, যে-জীবন তাঁহার আয়ত্ত ছিল তাহাও গেল, এবং অনধিগম্য জীবনটাও পরিচিত হইল না, তবে তাঁহার মত হতভাগ্য আর কে? আরও অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইব, তিনি অপরিচিতের মত বাহিরে দাঁড়াইয়া ভেরী বাজাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই পুরীতে প্রবেশ করিয়া বহু-জন-বাঞ্ছিত পৌর-অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সন্ধ্যার দ্বিধা ও আশঙ্কা কাটিয়া গিয়া রাত্রির নক্ষত্র-ভাস্বর ধ্যানলভ্য আলোকে কবির অন্তর পরিপূর্ণ। কবি নির্ভয়ে রহস্যময়ী মহীয়সী রাত্রি-রাণীর সিংহাসন-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সভাকবি হইবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

মোরে কর সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়
হে শর্ব্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা!
তোমায় আকাশ জুড়ি যুগে যুগে জপিছে যাহারা
বিরচিব তাহাদের গীতা।

এই রাত্রি বিস্মৃতির, অতীত কালের; কবি রহস্য-গভীর এই অতল অন্ধকারের বৈতরণী পার হইয়া প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে যে অনধিগম্য দূরত্ব তাহা অতিক্রম করিতে না পারিলে যে সব

* নিদ্রাহীন চক্ষু যুগে যুগে তোমার আঁধারে
খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর

যাহারা—

তোমার নির্ব্বাক্ মুখে এক দৃষ্টে চেয়েছিল বসি
* জুড়ি দুই কর—

তাহাদের সহিত কবির পরিচয় হইবে কেমন করিয়া? আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য' ও 'কথা ও কাহিনী'তে কবি সেই সব মহাপ্রাণদের ইতিহাস-রচনায় ব্যস্ত, যাঁহারা সারাজীবন সৌন্দর্য্যের ধ্যানের ও কর্ম্মের আদর্শে নিযুক্ত ছিলেন এবং অবশেষে 'মহান্ মৃত্যুর সাথে' বজ্রের আলোতে মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছিলেন।

ধরাতল হইতে সেই সব মহাপ্রাণ আজ অপসারিত, কিন্তু তাহারা সম্রাজ্ঞী রাত্রির সিংহাসন-ছায়ায়

আপনার স্বতন্ত্র আসনে
আসীন স্বাধীন স্তব্ধছবি

কবির একান্ত অনুরোধ

হে শর্ব্বরী, সেই তব বাক্যহীন জাগ্রৎ সভায়
মোরে করি দাও সভাকবি।

কবি এই সম্রাজ্ঞীর সভাকবিরূপে যে-সমস্ত গান করিয়াছেন—তাহার কয়েকটি 'কল্পনা'য় আছে, এক্ষণে আমরা তাহাদের বিষয়ে আলোচনা করিব।

২

কবিকে অনুসরণ করিয়া আমরা প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যের চিররহস্যময় পুরীতে প্রবেশ করি। এ পুরী সামান্যতঃ সমস্ত ভারতবর্ষ হইলেও বিশিষ্টভাবে ইহা উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবির রাজধানী; উজ্জয়িনী কালিদাসের কল্পনায় অত্যুজ্জ্বল হইয়া তাঁহার কাব্যে এবং তৎপরে সমগ্র কাব্যামোদীর কল্পলোকে অমর হইয়া আছে। প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু ধারণা, তাহার অধিকাংশই উজ্জয়িনীকে আশ্রয় করিয়া প্রস্ফুটিত। রবীন্দ্রনাথের নিকটে সংস্কৃত সাহিত্য বলিতে প্রধানতঃ কালিদাসকেই বোঝায়, তাঁহার নিকটে প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা বলিতে প্রধানতঃ উজ্জয়িনীর জীবনযাত্রাকেই বোঝায়।

কবিতাটি 'স্বপ্ন'। স্বপ্ন ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? আজ সেখানে স্বপ্নের গুপ্ত দ্বার ছাড়া প্রবেশের আর পথ কোথায়?

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদী পারে
মোর পূর্ব্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।

এখন দেখা যাক, সেই প্রিয়ার বর্ণনা কেমন?

মুখে তার লোধ্র রেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,

তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।

এ বর্ণনার উপাদান কালিদাসের, ইহার অভিজ্ঞতা কালিদাসের; কালিদাসের উপাদান ও অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব করিয়া, নিজের রসে সিক্ত করিয়া, প্রকাশ করিয়াছেন। দুই মহাকবির হাতের কারুকার্য্য ইহাতে বর্ত্তমান, ইহাই কল্পনার ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের কারণ। আবার দেখি—প্রিয়ার,

দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।

এমন সময়ে "ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।" কবিকে দেখিয়া হাতে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হে বন্ধু আছ তো ভাল?" কিন্তু—

মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি, নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত, চাহি দোঁহা পানে
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

এইখানেই জীবনের ট্রাজেডি। উজ্জয়িনী তো দূরের কথা! জীবনে একদা যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, মৃত্যুর পরপার হইতে আজ তাহারা যদি দু'দশ বছর পরে ফিরিয়া আসে, তবে কি পুনরায় পূর্ব্বের সেই আসনখানি তাহারা ফিরিয়া পাইবে? মৃতদের পক্ষে এ দাবী স্বাভাবিক, তাহারা বৃহৎ জীবনের একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু জীবিতের নিকটে জীবনের আকর্ষণ বেশী, নূতন ব্যক্তি ও ভাব আসিয়া তাহার শূন্য আসন দখল করিয়া বসিতে থাকে। মালবিকা আজও উজ্জয়িনীর সেই জীবনে আবদ্ধ হইয়া আছে. তাহার পক্ষে কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অসম্ভব নয়; কিন্তু যে-কবি তাহার পরে বহু শতাব্দীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার জীবন উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন, তিনি স্বপ্নদ্বার অতিক্রম করিয়া সেখানে পৌঁছিতে পারিলেও—ভাষা মনে রাখিবেন কেমন করিয়া? এই প্রণয়ী-যুগলের বিস্মৃত বাক্-বেদনাতেই কবিতাটির প্রাণ। মালবিকা সেই প্রাচীন জীবনের প্রতীক। আজ

কি আর সেই একদা-প্রিয় জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরিয়া গিয়া তেমন স্বাভাবিকভাবে পুরাতন স্থানটি অধিকার করা স্বাভাবিক! দূর হইতে ইহা অসম্ভব মনে হয় না, কিন্তু কোনোক্রমে একবার সেখানে ফিরিতে পারিলে বুঝিতে পারিতাম—"হায়, স্বর্গ আর স্বর্গ নহে।" এই অতীত স্বর্গের উপভোগ একমাত্র কল্পনার দ্বারাই সম্ভব। কল্পনার সাহায্যে 'কল্পনায়' এই প্রাচীন জীবনকে উপভোগ করিবার চেষ্টা কবির তরফ হইতে হইয়াছে।

কবির উত্তরীয় প্রান্ত অবলম্বন করিয়া বহুযুগ উত্তীর্ণ হইয়া উজ্জয়িনীর নববর্ষা-সমাগম উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারি 'বর্ষামঙ্গল' কবিতাটিতে। সেই যে একদিন আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে অকস্মাৎ শিপ্রা পরপারবর্ত্তী দিগন্তরালের নীল বন-রেখাকে গাঢ়তর করিয়া মেঘ জমিয়া উঠিত এবং স্ফুরিত বিদ্যুতের আভাস দিয়া ধাবমান জল যবনিকা পথঘাট গিরিশিখর, এবং ক্রমে উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-চূড়াগুলি আচ্ছন্ন করিয়া দিত, কবির যাদুমন্ত্রে আমরা সেই জীবনের কেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হই। সেই যে ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞ জনপদ-বধূগণ এবং তাহাদের সিক্ত অঞ্চলের সৌরভ; সেই যে হর্ম্ম্য-বিলাসিনীগণ এবং তাহাদের বীণাধ্বনি-মিশ্র নৃত্য-উত্তাল রশনাদামের ঝঙ্কার; কুটীরাঙ্গনাদের উৎসব-মুখর হুলুধ্বনি এবং কুঞ্জকুটীরে ভাবাকুল-লোচনার মুগ্ধদৃষ্টি; শয্যাসুগন্ধি কদম্ব ও কেতকীর স্নিগ্ধ গন্ধ, এবং সেই যে মালবিকা 'তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকণিয়া, ভবনশিখীরে গণিয়া গণিয়া' নাচাইতেছে, মণিমাণিক্য জড়িত তাহার কঙ্কণ-যুগলের রিণি রিণি যুগপৎ শব্দে স্পর্শে গন্ধে গানে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অধিকার করিয়া, আয়ত্ত করিয়া, মুগ্ধ করিয়া অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও সেই প্রাচীন জীবনের পৌর-অধিকার আমাদিগকে দান করে।

আমাদের সাধ্য কি বহু পুরাতন বর্ষাকে এমন অভিনব ভাবে একাকী সম্ভোগ করিতে পারি!

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে—
শতেক যুগের গীতিকা।

এই কবিতাটিতে নানা কবি-কণ্ঠের মূর্চ্ছনা, বহু মালবিকার অশ্রু-সেঞ্চনের আভাস, বহু অভিসারিকার অবাধ্য নূপুরের রহস্য-ভাষণ এবং বহু বনান্তের আনন্দ মর্ম্মর ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে, মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের কণ্ঠ বিশাল, বিরাট্ বহুতান অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া বিশ্বকণ্ঠে পরিণত হয়!

বসন্তসখা মদন অনুচর পরিচয় লইয়া স্বর্গে যে সব কাণ্ড করিয়া বেড়াইত, একবার শক্ত হাতে পড়িয়া তজ্জন্য চরম দণ্ড লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, তাহাতে দুর্দৈব বাড়িল বই কমিল না। যে একদিন স্বর্গরাজ্যে উৎপাত করিত, সেইদিন হইতে তাহার পরম অরাজকতায় স্বর্গ মর্ত্ত্য সপ্ত ভুবন ভরিয়া উঠিল। মদন-সম্বন্ধীয় কবিতা-যুগলে রবীন্দ্রনাথ মানবের ধরাতলে মানবের কাজে মদনকে নামাইয়া আনিয়াছেন। প্রাচীন কাব্য ও পুরাণ হইতে আমরা মদন-সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানি! কবি নানা মনোহর তথ্যের সমাবেশে পাঠকের কল্পনায় মদনকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন।

কবি মদনকে দেবতার উচ্চ আসনে বসাইয়া না রাখিয়া তাহাকে মানবের সকল কাজের সঙ্গিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। একদিন সে তরুণ-তরুণীর যেমন প্রিয় সঙ্গী ছিল, আজিও তেমনি সে চিরার্জ্জিত স্থানটি অধিকার করুক কবির এই মিনতি—

এস গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে।

এবং

নবীন কর মানবঘর ধরণী কর বিবশা
দেবতা-পদসরস-পরশে।

দেবতা আর দেবতা নহে, স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোনো ছেদ নাই; দেবতা মানব স্বর্গ মর্ত্ত্য অবিমিশ্র হইয়া এক আনন্দ-লোক গড়িয়া উঠিয়াছে।

'মদন ভস্মের পরে' কবিতাটির আলুলায়িত ছন্দ আকুল-মূর্দ্ধজা, ধূসর-স্তনী রতির মত লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে।

ব্যাকুলতার বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে
সকল দিক্ কাঁদিয়া উঠে আপনি।

ভস্মাবশেষ ধূলি-শয্যা ত্যাগ করিয়া মদনের আত্মা বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়া গেল, বাতাসে তাহার নিশ্বাস, আকাশে তাহার অশ্রু, এবং ফাল্গুনের মূর্চ্ছমানা ধরণীতে, তাহারই ইঙ্গিত। আজ বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্যই যে মদনের হাতছানিতে, উন্মাদনায় ভরা, তাহারও বুঝি কারণ ইহাই।

প্রাচীন জীবনকে অতিক্রম করিয়া আমরা আদিম জীবনের মধ্যে চলিয়া যাই, 'বসন্ত' কবিতায়, সেই যখন—

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে,
মত্ত কুতূহলী,
প্রথম যে দিন খুলি নন্দনের দক্ষিণ দুয়ার
মর্ত্ত্যে এলে চলি—

পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি, 'কল্পনায়' কবির মুখ অতীতের দিকে, যে-অতীতের মধ্যে আর কোন ক্রমেই ফিরিবার উপায় নাই, যে মধুময় জীবন—

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে

সেই অতীতের প্রতি ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 'কল্পনায়' কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ।

এত দিন বসন্তের বর্ত্তমান রূপটি তাঁহার চোখে পড়িয়াছে, আজ সহসা অযুত যুগের পরপারবর্ত্তী তাহার আদিমতম প্রথমতম উন্মত্ত অভিসার কবির চোখে পড়িয়া গেল। সেই প্রাচীন দিনের প্রথম পুষ্পই আজ নবীন রূপে আসিয়াছে,

তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা।"

শুধু তাহা নহে, আজ কবি যে-মালা গাঁথিয়াছেন, তাহাতে, না জানি কত,

নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।

বসন্তের যে পুষ্পরাজি প্রাচীন জীবনের সুখদুঃখের ইতিহাস বহন করিতেছে, তাহারা কবির স্বল্পস্থায়ী বসন্তের গুপ্ত সংবাদ বহন করিয়া গেল। এই সূত্রে কবির ব্যক্তিগত জীবন বিচিত্র বৃহৎ জীবনমালার মধ্যে গ্রথিত হইয়াছে। আবার অনাগত বসন্তে যখন এই সনাতন পুষ্পমালা বিকশিত হইয়া উঠিবে, তৎসহ কবিজীবনের এই কয়খানি পরম অধ্যায় কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্পিত, কুহুস্বরে ধ্বনিত, মর্ম্মর-নিশ্বাসে শ্বসিত ও রক্তরৌদ্রে রঞ্জিত হইয়া উঠিতে থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথের বসন্ত বিষয়ের যতগুলি কবিতা আছে, তন্মধ্যে এই কবিতার অতি উচ্চস্থান। ইহাতে অযথা তত্ত্বের বাহুল্য বা অকারণ বর্ণনার আতিশয্য নাই।

বসন্তের তপ্ত অপরাহ্নে উপবনপ্রান্তে যে একটি মধুর ক্লান্তি অনুভূত হইতে থাকে, সেই রকম আতপ্ত মোহময় এই কবিতাটি কবির গভীর মর্ম্মবেদনার একটিমাত্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস; ইহা অতিকথন ও সামান্যকথন উভয় দোষ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত।

প্রথমেই বলিয়াছি, কল্পনা কাব্যে বিশ্বলোক ও শিল্পলোক পাশাপাশি বর্ত্তমান, অনেক স্থলে উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের কারণ হইয়াছে। 'প্রকাশ' কবিতায় বিশ্বলোকের তত্ত্ব শিল্পলোকে প্রকাশ হইয়া পড়িবার ইতিহাস। ভ্রমর ও মাধবীফুলে, তরু ও লতায়, চাঁদে ও চকোরে, তড়িতে ও মেঘে "এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে", সে কথা কেহ তো জানিত না, কিংবা জানিলেও তাহা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া না-জানারই সামিল ছিল। একদিন হঠাৎ বিশ্বাসঘাতক কবি উপযুক্ত সুরে, ছন্দে, ভাষায় সেই অতি গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিয়া ফেলিল, শিল্পীর হাতে পড়িয়া বিশ্বলোকের সত্য শিল্পলোকের সত্য হইয়া উঠিল। এই গুপ্ত সংবাদের প্রকাশে প্রকৃতি সাবধান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মানুষের দুঃসাহস বাড়িয়াছে বই কমে নাই। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দশদিকে যদি মিলনের স্রোত অবিরল, তবে মানুষ কেন লজ্জায় দূরে দূরে থাকিবে!

তাহারা—

> কহিল হাসিয়া মালা হ'তে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
> ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ে গেল, তুমি আমি কোথা আছি।

আজ বিশ্ব ও শিল্প গায়ে গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, এমন কি অনেক সময়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিবার উপায় থাকে না; শিল্পলোক আজ আমাদিগকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া আছে, যে মেঘের দিকে তাকাইলে প্রকৃত মেঘ আর চোখে পড়ে না, কালিদাস একদিন যে সত্য দেখিয়াছিলেন শিল্পের অপূর্ব্ব মায়াকৌশলে সেই সত্য আমরা দেখিতে বাধ্য হই। ইহা প্রকৃতির অনেক দৃশ্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য; মেঘ, পর্ব্বত, ইন্দ্রধনু, নদী, বন ইত্যাদি। কিন্তু একদিন ছিল, যখন এই দুই সত্য, এই দুই জগৎ একান্ত পৃথক্ ছিল, কেহ কাহারো রহস্য জানিত না। 'প্রকাশ' কবিতার আরম্ভ জগতের সেই অবস্থায়, এবং যে দিন যে ভাবে এই দুই জগৎ মুখোমুখী হইয়া পরস্পর-সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পড়িল, জগতের সেই অবস্থায় ইহার শেষ।

অতীতটা যতই মধুময় হউক, অবসর-ক্ষণে সে দিকে ফিরিয়া মানুষ যতই না দীর্ঘশ্বাস ফেলুক, নূতনের ক্ষুধার অন্ন অতীতের ভাণ্ডারে নাই। অতীতের ভাঙা মন্দিরে, একদা-সম্পূজিত জীবনের পরম আদর্শ পূজাহীন পড়িয়া থাকে। 'ভগ্ন-মন্দির'

কবিতাটিতে এই ভাব। আজ সে মন্দিরে শঙ্খ ও বীণা নীরব, আজ তাহা পরিত্যক্ত। তাহা জীর্ণ ও নির্জ্জন বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে যে নবজীবন প্রসারিত, তাহার আভাস রহিয়া রহিয়া সেই মন্দিরে আসিয়া পৌছিতে থাকে,

তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ
নব-বসন্ত-পবনে।

এই দেবতার পূজারী, যে একদিন বহু সম্মানাস্পদ ছিল. আজ সে ভিক্ষুক ও উপবাসী। আজ সে আদর্শচ্যুত হইয়া কোন্ বিদেশে কোন্ অপরিজ্ঞাত জীবনে, কার প্রসাদের ভিখারী। চারিদিকে নব নব জীবনের আদর্শ, সেই আদর্শ-অনুসারে কত প্রতিমা গঠিত, পূজিত ও পুনরায় বিস্মৃত হইতেছে, এই চিরনবায়মান জীবনতরঙ্গ হইতে দূরে সেই প্রাচীন দেবতা পড়িয়া আছে, একদিন যে ভক্তির পাত্র ছিল, আজ সে অবিমিশ্র কৃপাপ্রার্থী।

প্রাচীন জীবনকে যত ভাবে দেখা যায়, কবি দেখিয়াছেন। একদিকে তাহা দুরধিগম্য, আবার সে কল্পনার পরম আশ্রয় এবং বর্ত্তমানের রূঢ়তা হইতে পলায়নের অপরূপ নন্দন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাকে একান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। জীবনের দাবীকে অতীত আর কিছুতেই তৃপ্তি দিতে পারে না, ভাঙা মন্দিরে গান রচনা করিয়া কবির সান্ত্বনা নাই। জীবনের যে নবীন বেদীর উপরে নূতন প্রতিমার পূজা কবির আসন সেখানে; শুধু মাঝে মাঝে তাঁহার সকাতর দৃষ্টিনিক্ষেপ, বিস্মৃত বিগত-পূজা বিভগ্ন সেই ভাঙা দেউলের নির্জ্জন দেবতার প্রতি।

সোনার তরী পর্য্যায়ের ভাবকেন্দ্র জীবনদেবতা, কল্পনাতে বিশ্বদেবতার আভাস। অনেকের ধারণা জীবনদেবতার আইডিয়া হইতে বিশ্বদেবতার বিকাশ; ইহা সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রারম্ভ হইতেই এই দুই ভাব, জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা বর্ত্তমান; তবে সোনার তরীর পূর্ব্বে যেমন জীবনদেবতার আইডিয়া গভীরতা ও বিশিষ্টতা লাভ করে নাই, 'কল্পনার' পূর্ব্বেও বিশ্বদেবতার ভাব অপরিণত। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জীবনদেবতা ও বিশ্বদেবতা-সম্বন্ধে যেমন, দেশাত্মবোধ ও বিশ্ববোধ এই দুইটি ভাবও তাঁহার গদ্যে পদ্যে প্রথম হইতে বর্ত্তমান। দেশাত্মবোধের পরিণাম বিশ্ববোধ নহে। জীবনের পরিণতির সহিত ও অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য্যের সঙ্গে এই দুই আইডিয়া পুষ্ট ও বিকশিত হইয়াছে মাত্র। যদি একটার পরিণাম আর একটা না হয় তবে দুটির

আপেক্ষিক সম্বন্ধ কি রকম? একটি আর একটির পটভূমি। দেশকে কবি বিশ্বের অন্তর্গত করিয়া, তাহাকেই একান্তভাবে নয়, তাহার যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, দেখিতে চাহিয়াছেন; এই দুটির সামঞ্জস্য-বিধানেই রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব, এবং তাঁহার রাষ্ট্রনীতির চিন্তার মধ্যে যদি কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তবে তাহা দেশ ও বিশ্বের আপেক্ষিক সামঞ্জস্য বিধানের এই চিন্তা-প্রয়াসে।

'বর্ষশেষ' কবিতাটিতে বিশ্বদেবতার আভাস। এই কবিতাটি শেলির বর্ষশেষের ঝটিকার (ode to west wind) সহিত তুলনীয়। একটি আর একটির কথা মনে করাইয়া দেয়, কবি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন ইহা লিখিবার সময়ে শেলির কবিতাটির সংস্কার তাঁহার মনে সচেতন ভাবে ছিল। পূর্ব্বের কতকগুলি কবিতা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি তাহাদের অস্তিত্বের প্রাথমিক ভিত্তি কালিদাসের অভিজ্ঞতা, এটিতে তেমনি শেলির।

দুটি কবিতারই উপলক্ষ অনুরূপ, বর্ষশেষ ও অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকা। শেলির কবিতাটিতে দুটি মাত্র ভাব; ('জীর্ণ জীবন ধ্বংস হোক, নবীন উদ্ভূত হোক, আমি সেই সদ্যোজাত নবীনের কবি হইয়া বিশ্বময় তাহার বাণী প্রচার করি।')প্রচুর বর্ণনা ও অনুগত ভাবধারার মধ্য দিয়া এই মূল সুরটি অখণ্ডভাবে প্রবলভাবে ধ্বনিত হইয়া চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে। রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' মূল ভাবের অনুসঙ্গী আরও দু'তিনটি ভাবের চাপে কিঞ্চিৎ শিথিল গতি; শেলির কবিতায় রসানুভূতির যে তীব্রতা, এখানে তাহার কিছু যেন অভাব। আরও একটি কথা; 'কল্পনায়' কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য ইহাদের নিছক চিত্ররসে; চিত্রকে অতিক্রম করিয়া তত্ত্বে পৌঁছিবার প্রয়াস এখানে নাই, কল্পনার প্রধান সৌন্দর্য্য প্রসাধন কলা, সাধন বেগ নহে।

'বর্ষশেষে' ইহার ব্যতিক্রম। ইহা চিত্রকে উত্তীর্ণ হইয়া তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে; ইহার প্রচণ্ড সাধন বেগ প্রসাধন কলার সূক্ষ্মতাকে দীর্ণ করিয়া বাত্যাতাড়িত তরঙ্গমালার ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। এই কবিতাটির বৈশিষ্ট্য ইহার প্রচণ্ড বুক-ফাটা ক্রন্দনের ধ্বনি। এ রকম উদাত্ত হাহাকার অন্য কোন্ সাহিত্যে আছে জানি না, বেদে এ রকম উদাত্ত ধ্বনি থাকিতে পারে, ইহাকে বৈদিকক্রন্দন বলা চলিতে পারে।

কালবৈশাখী ঝড় যেমন অকস্মাৎ এক নিশ্বাসে একান্ত প্রবলভাবে আসিয়া পড়ে, সেই সুরটি ধরা পড়ে কবিতাটির প্রথম চারি ছত্রের ছন্দঃস্পন্দের আকস্মিকতায় —

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি দীর্ঘধারা।

যাঁহারা বৃষ্টিসনাথ ধাবমান আসন্ন কালবৈশাখী ঝড় দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন 'নীলাঞ্জন ছায়া' ও 'হানি দীর্ঘধারা' ছবি দুইটি কত সত্য! কালবৈশাখীর প্রথম একটা ঝাপট চলিয়া গেলে, বায়ুমণ্ডল যেমন মৌন, নির্জ্জীব ও বায়ুলেশরিক্ত মনে হয়, ঠিক সেই ক্লান্ত নির্জীবতা বাকি চারিটি ছত্রের সহজ, সরল, ছোট ছোট কয়েকটি বাক্যে,

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হ'য়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান ;
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্ব্ব শেষ গান।

প্রথমোক্ত চারি ছত্রের প্রচণ্ড ঝাপটের সময় নিজের মনের কথা আর ভাবিবার অবকাশ ছিল না, এবার নিজের দিকে চোখ পড়িল; বর্ষশেষের ঝড়ের অর্থ বুঝিতে পারিয়াই যেন কবি বলিতেছেন, 'গাহিতে চাহিছে হিয়া', ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্লোকে দেখি, আবার ধীরে ধীরে আসন্ন আর একটা বাত্যাতরঙ্গের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতেছে। সংযুক্ত বর্ণের বাহুল্যে এবং ছন্দঃস্পন্দের স্থানবৈচিত্র্যে ইহা করা সম্ভব হইয়াছে। 'ধূসর-পাংশুল মাঠ', 'ধেনুগণ ধায় ঊর্দ্ধমুখে' ও 'ছুটে চলে চাষী'। তৃতীয়, চতুর্থ ছত্রে কোনো ছেদ নাই—হু হু করিয়া একটা দীর্ঘ ঝাপট আসিয়া পড়িয়াছে—

ত্বরিতে নামায় পাল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রে ছেদ নাই; শেষ দুইটি ছত্রে এতক্ষণ যে-আভাস ও আয়োজন স্তরে স্তরে জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা পুনরায় দ্বিগুণিত বেগে একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—

বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়
উৎকণ্ঠিত পাখী।

শুধু ঝড় নয়, এবারে তীক্ষ্ণ কর্কশ একটা মেঘের গর্জ্জনও আছে। বর্ষার মেঘের ন্যায় গম্ভীর নয়, বৈশাখী মেঘের সুতীক্ষ্ণ বজ্রোদ্গারী ধ্বনি 'বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ' শব্দটিতে শ্রুত হয়। তারপরে ছয়টি শব্দ, ছোট ছোট দুটি দুটি অক্ষরের। প্রথমে বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জনে আলো; চোখে পড়িল, দলে দলে হাঁস পাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কম্পন তুলিয়া

ছুটিয়া চলিয়াছে; পাখার ক্ষুদ্র কম্পন ঐ ছোট ছোট শব্দগুলিতে; অবশেষে আবার একটা কর্কশ মেঘগর্জ্জন 'উৎকণ্ঠিত পাখী', তারপরে সব অন্ধকার। বৈশাখী ঝঞ্ঝার এমন সত্য ও আশ্চর্য্য চিত্র বাংলা ভাষায় আর নাই। এই সফলতার কারণ ঝঞ্ঝার রসকে ভাষা, চিত্র ও প্রাকৃতিক তথ্য-দ্বারা কবিকে প্রকাশ করিতে হয় নাই, তিনি ছন্দঃসঙ্গীতের দ্বারা তাহা সাধন করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি ভাষা অপেক্ষা সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অধিকতর অনুকূল।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের মূলভাব—

উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে ভাব-কেন্দ্র—'আমার মনে এমন কঠিন সন্তোষ জাগ্রৎ হোক, যাহা পুরাতনের লজ্জাভয় বিমুক্ত, কেবল নূতনের জয়ধ্বনিতে পূর্ণ।' সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্লোকে নূতনের আগমনা ও অভ্যর্থনা। একাদশ শ্লোকে বলা হইতেছে 'হে সদ্যোজাত মহাবীর, তুমি কি বাণী যে আনিয়াছ, তাহা তুমিও সম্পূর্ণভাবে জান না, আমিও তাহা না বুঝিতে পারিয়া মুগ্ধভাবে চাহিয়া আছি।' এতক্ষণ কবি কেবল নিজের কথাই বলিতেছিলেন—দ্বাদশ শ্লোকে সমগ্র মানবজাতির কথা আসিয়াছে—হে কিশোর তোমার উদার জয়-ভেরীর আহ্বানে—

আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শ্লোকে ক্ষুদ্র জীবনের দুঃসহ পঙ্কিলতাকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চদশ শ্লোকে, মানবজাতি হইতে কবি পুনরায় নিজের মধ্যে ফিরিয়া বলিতেছেন, একবার তাঁহাকে জীবনের বিরাট্ স্বরূপ ও মহান্ মৃত্যুকে স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেওয়া হোক। ষোড়শ শ্লোকে কবি কতকটা অকর্ম্মক হইয়া পড়িয়াছেন। এতক্ষণ তাঁহার যে ক্রিয়াশীলতা, সজীবতা ছিল, তৎপরিবর্ত্তে তিনি কেবল এই বিরাট্ সত্তার ক্ষণিক খেলনা মাত্র হইয়া পড়িলেন; একবার উত্তমরূপে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত হইয়া চিরবিস্মৃতির গর্ভে কবি ডুবিয়া যাইতে রাজি আছেন। সপ্তদশ শ্লোকে অন্তরের তুমুল দ্বন্দ্ব হইতে বাহিরের দিকে চক্ষু ফিরাইতেই কবি দেখিলেন—

নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনো ঝরিছে বৃষ্টি-ধারা
বিশ্রামবিহীন;

কাল-বৈশাখীর তীব্রতা, আবেগ আর নাই; নবাঙ্কুর শব্দটি নূতন জীবনের বাণী বহন করিতেছে; এই প্রলয় ঝড়ে অনেক কিছুই ঝরিয়া পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে, তবু যাহা রহিল তাহাই সত্য, তাহাই রহিবার মত।

এই দীর্ঘ কবিতাটিতে অনেকগুলি ভাবের সমাবেশ হইয়াছে; অবশ্য ইহার মধ্যে কোনটিই অপ্রাসঙ্গিক নহে, তবু এই সুদীর্ঘ ভাব-শৃঙ্খল-পরম্পরার গ্রন্থিগুলি কতকটা শিথিল বলিয়া মনে হয়; ইহাতে ঝড়ের কবিতার প্রধান লক্ষণ তীব্রতা ও আবেগের অভাব কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে।

'বর্ষশেষ' কবিতাটিকে প্রধানতঃ দুই ভাগ করা চলে, পুরাতনের বিদায় ও নূতনের আগমন। 'বৈশাখ' কবিতায় কেবল ইহার অর্দ্ধেক মাত্র। 'বর্ষশেষ' সন্ধ্যার কবিতা; 'বৈশাখ' মধ্যাহ্নের—আকাশ যখন তাম্রাভ, বাতাস যখন নিস্পন্দ এবং বনে যখন পাতাটিও কাঁপিতেছে না। বৈশাখের মধ্যাহ্নে রৌদ্রমুগ্ধ নির্জ্জন আকাশ ও প্রান্তর ভাল করিয়া দেখিয়া না লইলে ইহার ভীষণ-মাধুর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে না। ইহাতে নিরাসক্ত চিত্ররস, সচেতন ভাবে কোনো তত্ত্ব দিবার চেষ্টা নাই।

বৈশাখের ধ্বংস-করাল মূর্ত্তি, বাহিরের রূপ; কিন্তু তাহার অন্তরে আর একটা রূপ আছে তাহা শান্তির—

> হে বৈরাগী কর শান্তি পাঠ।
> উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,

এবং সেই

> সকরুণ তব মন্ত্রসাথে
> মর্ম্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্বপরে,
> ক্লান্ত কপোতের কণ্ঠে ক্ষীণ জাহ্নবীর শ্রান্ত স্বরে,
> অশ্বত্থ-ছায়াতে

অবশেষে, হে সন্ন্যাসী, জরামৃত্যু, ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং চিন্তায় বিকল লক্ষ কোটি নরনারীকে বিশাল বৈরাগ্যময় গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দাও।

তাপস বৈশাখের বাহিরের ও অন্তরের দুটি রূপকেই কবি দেখাইয়াছেন; বাহিরে পুরাতনকে সে দগ্ধ করিয়া ফেলে, অন্তরে তাহার পরম সন্তোষ বিরাজমান। ইহাতে স্পষ্টতঃ নূতনের আগমনী না থাকিলেও, এই সন্তোষ তাহার সূচনা করে। কবির পরবর্ত্তী বহু কবিতায় বৈশাখের এই যুগলরূপকে আরো স্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে।

বৈশাখের ঝড়ে যাঁহার প্রচণ্ড প্রকাশ, বৈশাখের মধ্যাহ্নে যাঁহার রুদ্র প্রকাশ,

সেই মূল সত্তাই বিশ্বদেবতা। 'ভ্রষ্টলগ্ন' কবিতায় এই সত্তা মধুরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এতক্ষণ দেখিলাম কবি আগ্রহের সহিত সেই সত্তার নিকটে নিজেকে সমর্পণ করিতে উৎসুক। কিন্তু সেই সত্তাও মানুষের নিকটে নিজেকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হায়, উভয় পক্ষের ইচ্ছার শুভলগ্ন এক মুহূর্ত্তে আসে না, তাহাতে আবার অপরিচয়ের অর্দ্ধ অজ্ঞতা এবং অর্দ্ধ পরিচয়ের লজ্জা! সকালবেলা যখন তরুণ পথিক আমার দুয়ারে আসিয়া আমার সন্ধান করে, তখন কেন যে—

সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
নবীন পথিক সে যে আমি, সেই আমি।

আবার সন্ধ্যাবেলা সেই ক্লান্ত পথিক যখন আমাকে সন্ধান করে, তখনো—

সরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
শ্রান্ত পথিক সে যে আমি, সেই আমি।

লজ্জা যখন ভাঙিল, বিলাসিনী প্রস্তুত হইয়া যখন বসিয়া, তখন আর তাহার দেখা পাই না, তখন হতাশ হইয়া কেবল—

ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি
হতাশ পথিক সে যে আমি, সেই আমি।

'সোনার তরীতে' কয়েকটি রূপকথা-জাতীয় কবিতা আছে, এটিও মূলতঃ সেই শ্রেণীর; তবে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের জন্য ইহার রস নিবিড়তর।

'অশেষ' কবিতায় কবিকে অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে আহ্বান। কবির বিশ্বাস ছিল জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য তাঁহার শেষ হইয়াছে, এখন তাঁহার বিশ্রামের অবকাশ। কিন্তু জীবনদেবতার লীলা বুঝিয়া উঠিবার উপায় নাই; কবি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে থাকেন,

কেন আসে মর্ম্মছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ?

এই মোহিনী, নিষ্ঠুরা, কঠোর স্বামিনী আর কেহই নহেন, কবির জীবনদেবতা। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার শক্তি কবির নাই, কাজেই,

আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নতশিরে
তোমার আহ্বান।

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচলখসা
হাতে দীপশিখা

বাংলাদেশের সন্ধ্যাকে এমন একটিমাত্র রেখায় বন্দী করিতে আর কে পারিয়াছে জানি না। কাজের বিরাম, নিদ্রার আরাম, এবং গৃহের অভ্যন্তরে সমস্ত দিনের পরিণাম. এই তিনটি ছত্রে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'বিদায়' নামে দুটি কবিতা আছে। একটিতে কবি পূর্ব্বতন আরামদায়ক জীবন হইতে বৃহৎ কর্ত্তব্যকঠিন জীবনে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, বর্ত্তমানের সহিত বন্ধন ছেদনের বেদনায় ইহার প্রাণ। 'অশেষ' কবিতার আহ্বানই হয়তো তাঁহাকে সেই কর্ত্তব্যের পথে টানিয়াছে, কে বলিতে পারে!

দ্বিতীয় 'বিদায়' কবিতাটিতে মৃত্যুর বিচ্ছেদ। চিত্রার 'মৃত্যুর পরে' কবিতার সহিত ইহার বিষয়-বস্তু সমান। তবু দুটিতে কত প্রভেদ! 'বিদায়' কবিতার অভিজ্ঞতা পূর্ব্বেরটি হইতে গভীরতর পরিণাম লাভ করিয়াছে এবং যে অতিকথন-দোষে 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটির রস জমে নাই, সেই অতিকথন-দোষ-শূন্য এই কবিতাটিতে কেমন এক প্রকার কোমল মধুরতা অনুভূত হয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম।

'কল্পনার' দেশাত্মবোধক কবিতাগুলির মূল প্রাচীন ভারতের জীবনে। ইহাতে যে-ভারত কবির লক্ষ্য তাহা ঐতিহাসিক ধারাবিচ্যুত বর্ত্তমান ভারতবর্ষ নহে, তাহা প্রধানতঃ

জনক-জননী জননী।

কবি ভারতবর্ষকে প্রাচীনকালের জীবনের ভিতর দিয়া, কাব্যপুরাণের ইতিহাসের মহিমার ভিতর দিয়া দেখিতেছেন; ভারতবর্ষ জন্মভূমি বলিয়াই প্রিয়, কিন্তু তাহা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে ইতিহাসের এই সমস্ত মণিমাণিক্যের অঙ্গভূষণের উজ্জ্বলতায়। এই ভারতবর্ষ যেমন "জনক-জননী জননী" তেমনি ইহা "ভুবন-মনোমোহিনী"; রবীন্দ্রনাথের দেশ-প্রীতির প্রথম উৎস, দেশের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতে উৎসারিত দেশপ্রেম অগ্রসর হইতে হইতে দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও কাব্যপুরাণ-দ্বারা বৰ্দ্ধিতস্রোত হইয়া পূর্ণতর হইয়াছে। দেশপ্রীতির এই মৌলিক দৃষ্টি প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া 'কল্পনার' দেশাত্মবোধক কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে, 'ভারতলক্ষ্মী' ইহার চরম।

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্ম্মলসূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী জননী।

দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ঐতিহাসিক সত্যের দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে।

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।

দেশের সৌন্দর্য্যপ্রধান রূপের বর্ণনা তিনি অনেক কবিতায় করিয়াছেন; 'শরৎ' কবিতাটি তাহাদের অন্যতম। 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায় এই সৌন্দর্য্যের সহিত রাজনীতির ও অর্থনীতির সত্যকে কেমন কৌশলে কেমন অনায়াসে তিনি মিলাইয়া দিয়াছেন।

তোমার শ্রীঅঙ্গ হ'তে একে একে খুলি'
সৌভাগ্যভূষণ তব—হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমান্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহু দূর বিদেশের বণিকের কাছে।

এই দেশাত্মবোধক কবিতাগুলিতে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, ইহাতে দেশের বর্ত্তমান মূর্ত্তি অত্যন্ত দীনা, হীনা, কাতরা। 'মাতার আহ্বান' ও 'সে আমার জননীরে' কবিতায় ইহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

'উন্নতিলক্ষণ' ও 'জুতা আবিষ্কার' নামে দুটি শ্লেষাত্মক কবিতা আছে। এ দুটি কবির ব্যক্তিত্বের আর একদিক প্রকাশ করিতেছে, কবি যে বলিয়াছেন একদিকে দেশের প্রতি প্রীতি, অন্যদিকে দেশ-হিতৈষিতার প্রতি উপহাস; এ দুটিতে সেই উপহাসের ভাব।

এই কাব্যে অনেকগুলি প্রেমের সঙ্গীত আছে। এগুলির ভাষার সংহতি, কল্পনার ঐশ্বর্য্য ও সকরুণ মিনতির ভাব লক্ষণীয়।

এক্ষণে দুটি কবিতা রহিল, 'পিয়াসী' ও 'পসারিণী'। ভাবের দিক্ দিয়া ইহারা ক্ষণিকার আত্মীয়, ক্ষণিকার অগ্রদূত। কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গীর দিক্ হইতে ইহাদিগকে কল্পনার পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। 'পিয়াসী' প্রভাতবেলার কবিতা। প্রভাতের শান্তি ও স্নিগ্ধতা ইহার ছন্দে ও ভাবে।

'পসারিণী' কবিতাটি মধ্যাহ্নের। দুপুরের ক্লান্তি ইহার ভাবে ও ছন্দে; ছন্দ যেন অবসন্ন হইয়া আর পা তুলিতে পারিতেছে না। নিরন্তর নব নব রচনাক্লান্ত কবির

চিত্তে বিরামের ঘণ্টা বাজিতেছে। এই কবিতা দুটি পাঠককে ক্ষণিকার সেই বিশ্রাম-নিভৃত অন্তঃপুরের জন্য প্রস্তুত করিতে থাকে।

কবিতাটির মূলে একটি অখ্যাত বৈষ্ণব পদের অভিজ্ঞতা। খুব সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত পদটি হইতে কবি 'পসারিণী'র মূল ভাবটি পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হাতে ঋণ, ধন হইয়া উঠিয়াছে, পঙ্ক হইতে পঙ্কজের সম্ভব হইয়াছে।

"হেদে লো বিনোদিনি এ পথে কেমতে যাবে তুমি।
শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি ॥ ধ্রু ॥
এ ভর দুপর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভরে আউলাল কবরী ॥"

[পদকল্পতরু, ২য় খণ্ড, ৩য় শাখা, ২৫শ পল্লব।]

* * * *

[পদটির সন্ধানের জন্য, এবং দুটি কবিতার তুলনামূলক সমালোচনার আইডিয়ার জন্য আমি শ্রীসুকুমার সেন, এম. এ.; পি-এচ. ডি মহাশয়ের নিকটে ঋণী।]



নৈবেদ্য

নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থখানি ১৩০৮ সালে কবির চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত হয়। ইহার কবিতাগুলি আকৃতিভেদে দুই ভাগে বিভাজ্য; এই আকৃতিভেদের সহিত প্রকৃতির বিভিন্নতাও ঘটিয়াছে। প্রথম হইতে একুশটি এবং শেষতম—এই বাইশটি কবিতা সঙ্গীতের আকার লাভ করিয়াছে—বাকি—আটাত্তরটি সনেট।

নৈবেদ্য 'আইডিয়া'-প্রধান কাব্য; ধী ইহাতে কল্পনার বল্গা ধারণ করিয়া সাঙ্গীতিক উদ্দামকে পদে পদে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নৃত্যচারী ছন্দকে পদচারী তীর্থযাত্রীর মত ধীর স্থির সংযত করিয়া তুলিয়াছে। স্বভাবতঃই সনেট ইহার ভাবের বাহন—কাজেই অন্য আকারে লিখিত কবিতাগুলি নৈবেদ্যের বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত। বিশেষ এই বাইশটি কবিতায় এমন কোন ভাব নাই যাহা সনেটগুলিতে অধিকতর নিপুণতায় প্রকাশিত হয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নৈবেদ্যের মূল সুরটি প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্য কবির ঔৎসুক্য। কবি এখানে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই ভিত্তি হইতে বর্ত্তমান ভারতকে—ভারতীয় সমাজকে—পাশ্চাত্ত্য আদর্শকে, মনুষ্যত্বের আদর্শকে—দেখিয়াছেন। এখন বোঝা আবশ্যক—প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলটি কি, অন্ততঃ কবির নিকট তাহা কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের সাধনা, বিশ্বের এই খণ্ডতা বৈচিত্র্য ও বহুত্বের মধ্যে একটি পরম সমন্বয় দেখিতে পাইয়াছিল এবং সেই ঐক্যের উপর ধর্ম্মকে স্থাপন করিয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিবার সময়ে এই তত্ত্বটি মনে রাখা আবশ্যক এবং এই তত্ত্বের উপরে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিলে ইহার সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আধ্যাত্মিক সকল সমস্যার জটিলতার মূলে গিয়া পৌছানো যায়। প্রাচীন ভারতের সুদুর্গম দেবমন্দিরের পথে তীর্থযাত্রী কবির চিত্ত, এই মূলকে, এই নিগূঢ়তম চরমতত্ত্বকে আয়ত্ত করিয়াছে—তাই তাঁহার নিকট প্রাচীন কাল তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। এই ভাবটি তিনি নৈবেদ্যের অধিকাংশ কবিতায় এবং সমসাময়িক অনেক গদ্য-নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সময়কার একই ভাবধারা বহন করিয়া কবির গদ্য ও পদ্য দুইটি সমান্তরাল তটরেখার মত পাশাপাশি চলিয়াছে; ফলতঃ কবির জীবনের অন্য কোন পর্ব্বে তাঁহার গদ্যে ও

পদ্যে এত বেশী ঐক্য নাই। এখন আমরা তাঁহার "প্রাচীনভারতের একঃ" প্রবন্ধ হইতে অংশবিশেষ তুলিয়া দিয়া কবির ভাষাতেই তাঁহার বক্তব্য বলার চেষ্টা করিব।

"মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলি এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহপ্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যু-বিদ্বেষের দ্বারা পীড়িত হইয়া অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল?

* * * * *

"সেই যে এক, তিনি সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। মুহূর্তেই বিশ্বের বহুত্ববিরোধের মধ্যে একের ধ্রুবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল—একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্য্যে গাঁথিয়া তুলিল।"

[প্রাচীন ভারতের একঃ; ধর্ম্ম; ৪৩-৪৪-৪৫]

এই একই ভাবটি কবিতায় আকার ধারণ করিয়াছে।

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবনে-তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্র স্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে একদেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

এই অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য ভারতের সেই ঋষি পিতামহেরা দেখিয়াছেন বলিয়াই—এই

বিশ্ব চরাচর
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দ নির্ঝর;
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্ম্মরিয়া করে যাতায়াত।

এই সত্যটি না বুঝিতে পারিলে জীবন কি দুর্ব্বিষহ!

"নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কি ভয়ঙ্কর! বৈচিত্র্য যদি এক বিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তিসকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত না হইয়া থাকে, তবে তাহা কি করাল, তবে বিশ্বসংসার কি অনির্ব্বচনীয় বিভীষিকা।"

[প্রাচীন ভারতের একঃ; ধর্ম্ম; ৪৬-৪৭]

এখন প্রশ্ন এই বহুত্বের মধ্যে এই পরম এককে কেমন করিয়া লাভ করা হইল।

"মন আপনার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতই কখনো জানিয়া কখনো না জানিয়া—কখনো বক্রপথে কখনো সরল পথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায় তখন এক মুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠে—আমি অমৃতকে পাইয়াছি—বলিয়া উঠে

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অন্ধকারের পারে আমি এই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হন। [প্রাচীন ভারতের একঃ; ধর্ম্ম; ৫০]

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান্ প্রাণ, কী আনন্দ-বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে—"শোন বিশ্বজন
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।

* * * *

রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

প্রাচীন ভারত সভ্যতা ও সম্পদের উচ্চতম শিখরে উঠিয়াও—উপকরণ-বিরলতার জন্য জগৎ-প্রসিদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য-সভ্যতামুগ্ধ আমাদের নিকট সম্পদ্ ও উপকরণ-বিরলতা

স্বতোবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষ কি সত্যই ইহার সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছিল—পারিলে কোন্ সত্যের বলে ?

"খণ্ডতার মধ্যে কদর্য্যতা, সৌন্দর্য্য একের মধ্যে ; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে ; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে ;—তেমনই খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই এককে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধন জন মান বড় আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্ব রথ ইষ্টক কাষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ করে, দ্রব্য-সামগ্রী-সংগ্রহ-চেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে,

* * * * *

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব ? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে, তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্

যাহার দ্বারা আমি অমৃত না হইব তাহার দ্বারা আমি কি করিব ?

যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।" [প্রাচীন ভারতের একঃ ; ধর্ম্ম ; ৪৯-৫০-৫১]

ভারতবর্ষ অন্তর্লোকের সন্ধান অখণ্ডত্বের সন্ধান লাভ করিয়াছিল বলিয়াই বাহিরের বহুত্বে উপকরণের বাহুল্যে তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই—সে সমস্তকেই অতি অনায়াসে অতিক্রম করা তাহার পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছিল।

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য যত।

কিন্তু সে জন্য আমাদের লজ্জার কিছু আছে কি ?

"আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণ-সামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই, কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্য্যাদা সকল মর্য্যাদার উর্দ্ধে থাকে, তোমারি দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিষ্মৎ হইয়া উঠে।

[প্রাচীন ভারতের এক: ; ধর্ম্ম ; ৫৪]

ভারতবর্ষের এই যে আদর্শ ইহা জীবনের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারি আশ্রম, রাজার রাজত্ব, তপস্বীর তপস্যা সকলি এক সমন্বয়-সূত্রে গ্রথিত ছিল—এক কথায় সমগ্র জীবনকেই—কোনো এক বিশেষ অবস্থামাত্রকে নয়—ভারতবর্ষ তপস্যার মত গ্রহণ করিয়াছিল

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন. ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে

* * * *

কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।

ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছো মঙ্গল,

জীবনযাত্রা-সম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল, এবং মূলগামী ভারতবর্ষ বলে—

"সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন। * * একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে, তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্ম্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান।" [ধর্ম্মের আদর্শ ; ধর্ম্ম ; ৩৯]

শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

"নদীর তটবন্ধনের ন্যায় সমাজবন্ধন তাহাকে বেগবান্ করিবে, বন্দী করিবে না, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মের মধ্যে, সুখ শান্তি সন্তোষের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে—আত্মাকে ভূমানন্দে ব্রহ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই সে সমাজের মধ্যে আপন শিকড় বাঁধিয়াছিল।"

[স্বদেশ ; ব্রাহ্মণ—৯৭]

এই তো দেখিলাম, প্রাচীন ভারতের সনাতন আদর্শ কবির চিত্তে আবির্ভূত হইয়াছে কিন্তু ইহা তো অতীতের কথা। বর্ত্তমান ভারতে কি সেই উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হইতেছে ? কবি বর্ত্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নৈরাশ্যে ও ক্ষুব্ধ অভিমানে বারংবার ভারতবর্ষকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

এখন, ভারত কেন সেই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইল! ইতিহাসের গতিই এইরূপ। কোন একটা সুবৃহৎ সমাজ অত্যুচ্চ আদর্শে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না—মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাসের জড়ত্ব কিছুকাল পরেই শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলে এবং আন্তরিকতাকে সংস্কারে পরিণত করিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের আর একটা নিদারুণ অভিশাপের কারণ হইয়াছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ব্যর্থ মোহ।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে পরম ঐক্য ভারতীয় সভ্যতার প্রাণধারা—ভারতবর্ষ সেইখানে আঘাত করিয়া একেবারে নিজের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে।

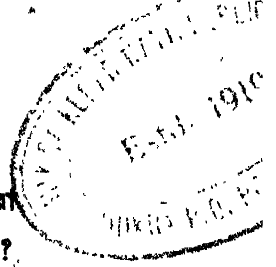
তব আদর্শ মহান্
আপনার পরিমাপে করি খান খান
রেখেছে ধূলিতে।
* * * *
যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর ?

আবার দেখিতে পাই

তোমারে শতধা করি ক্ষুদ্র করি দিয়া
মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া
সমস্ত ধরণী আজি অবহেলা ভরে
পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।

যাহারা তোমাকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিয়াছে—তাহারা আজ জগতের খেলার

পুতুলে পরিণত। যাহারা তোমাকে নিজেদের সমান কল্পনা করে তাহারা অন্যের নিকট কি সম্মান পাইবে!



নিজ মন্ত্র স্বরে
তোমারেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্দ্ধা করে
কে তাদের দিবে প্রাণ? তোমারেও যারা
ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্য-ধারা?

কবির মতে ভারতবর্ষের দুর্গতির ইহাই মূল কারণ। এই পরম ঐক্যকে খণ্ডিত করায় কি হইয়াছে?—মানুষের যাহা মেরুদণ্ডস্বরূপ সেই ধর্ম্ম আহত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম কি?

"সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য—সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভুক্ত—তাহাই মনুষ্যত্বের ছোট বড়, অন্তরবাহির সর্ব্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।" [ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্ম; ৬৫]

কিন্তু ধর্ম্মে আঘাত পড়িলে সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত কেন হইবে? অন্য দেশে তো ধর্ম্মই যুদ্ধবিগ্রহের লক্ষ্য হইয়া আছে—কিন্তু তাহারা তো দিব্য টিঁকিয়া আছে। কবির উত্তর এইরূপ--

"প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে 'রিলিজন' নহে—সামাজিক কর্ত্তব্যতন্ত্র—তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে 'রিলিজন', 'পলিটিক্স' সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে—কারণ সমাজেই তাহার মর্ম্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোন আশ্রয় স্থান নাই।" [সমাজভেদ; স্বদেশ; ১০৩]

এই ধর্ম্ম ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই সমস্ত সমাজ কলুষিত অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে—তাই ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ নহে, ক্ষত্রিয় আর ত্রাণকর্ত্তা নহে, বৈশ্য নিজের ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট নহে—সকলেই রিক্ত কাঠামোটার চারিপাশে ভূতের মতো ঘুরিয়া মরিতেছে।

আমাদের এই সমাজপ্রধান দেশে ব্রাহ্মণের আবশ্যক আছে।

"যদি প্রাচ্য ভাবেই আমাদের দেশে সমাজ রক্ষা করিতে হয়, যদি য়ুরোপীয় প্রণালীতে এই বহু দিনের বৃহৎ সমাজকে আমূল পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় না হয়—তবে যথার্থ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন—সর্ব্বপ্রকার আশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ ও আশ্রয়-স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।" [ব্রাহ্মণ ; স্বদেশ—৮৪]

"এই ব্রাহ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন। ইঁহারাই যথার্থ স্বাধীনতার আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত, কাঠিন্যের সহিত সমাজে রক্ষা করেন। সমাজ ইঁহাদিগকে সেই অবসর, সেই সামর্থ্য সেই সম্মান দেয়। ইঁহাদের এই মুক্তি, ইহা সমাজেরই মুক্তি।"
[ব্রাহ্মণ ; স্বদেশ—৮৯-৯০]

কিন্তু ইহা তো হইল অতীতের অবস্থা—এখন তো আর সেই ব্রাহ্মণ নাই—উপবীত মাত্র আছে। এখনকার ব্রাহ্মণ কি রকম :

"কিন্তু যে ব্রাহ্মণ সাহেবের আফিসে নত মস্তকে চাকরী করে—যে ব্রাহ্মণ আপনার অবকাশ বিক্রয় করে, আপনার মহান্ অধিকারকে বিসর্জ্জন দেয়—যে ব্রাহ্মণ বিদ্যালয়ে বিদ্যাবণিক্, বিচারালয়ে বিচার-ব্যবসায়ী, যে ব্রাহ্মণ পয়সার পরিবর্ত্তে আপনার ব্রাহ্মণ্যকে ধিক্কৃত করিয়াছে—সে আপনার আদর্শ রক্ষা করিবে কি করিয়া, সমাজ রক্ষা করিবে কি করিয়া, শ্রদ্ধার সহিত তাহার নিকট ধর্ম্মের বিধান লইতে যাইব কি বলিয়া? সে তো সর্ব্বসাধারণের সহিত সমানভাবে মিশিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কাড়াকাড়ি ঠেলাঠেলির কাজে ভিড়িয়া গিয়াছে। ভক্তি-দ্বারা সে ব্রাহ্মণ তো সমাজকে উর্দ্ধে আকৃষ্ট করে না—নিম্নেই লইয়া যায়।" [ব্রাহ্মণ ; স্বদেশ—৯০]

কাজেই এই ব্রাহ্মণের নিকট আর পুরাতন উচ্চ আদর্শ আশা করা যায় না—সেই মানসিক ঐশ্বর্য্য হারাইয়াছি বলিয়াই আর আমরা বলিতে পারি না—

না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে
হে বরেণ্য, এই বর দেহ মোর চিতে।

বলিতে পারি না

ধনীর সমাজে
না হয় না হোক স্থান, জগতের মাঝে

আমার আসন যেন রহে সর্ব্ব ঠাঁই,
হে দেব একান্ত চিত্তে এই বর চাই।'



তাই আর বলিতে পারি না

বাসনারে খর্ব্ব করি দাও হে প্রাণেশ।
সে শুধু সংগ্রাম করে ল'য়ে এক লেশ,
বৃহতের সাথে।

*　　*　　*　　*

'বাসনার ক্ষুদ্র রাজ্য করি একাকার
দাও মোরে সন্তোষের মহা অধিকার।'

যে সবল সরল সন্তোষমহার্ঘ্য আদর্শ চিত্তে সজীব থাকিলে উপকরণের অভাব অনুভূত হয় না তাহাতো আর নাই, কাজেই এখন প্রাণের দৈন্য উপকরণের বাহুল্যে পূর্ণ করিবার প্রয়াস।

'অন্তরের সে সম্পদ্ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত, তাই সর্ব্ব গায়ে
ক্ষুধার্ত্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন;
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর; নাহি ধ্যানবল
শুধু জপমাত্র আছে; শুচিত্ব কেবল,
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার;

*　　*　　*　　*

'তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য।'

"দীন ভারতবর্ষ যে দিন ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইবে তখন তাহার দৈন্য কি বীভৎস বিজাতীয় মূর্ত্তি ধারণ করিবে! * * আজ যাহা বিরল বসনের সরল নম্রতার দ্বারা সম্বৃত, সে দিন তাহা জীর্ণ কোর্ত্তার ছিদ্রপথে অর্দ্ধ আবরণের ইতরতায় কি নির্লজ্জভাবে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে।" [নকলের নাকাল; সমাজ; ৩৬]

আমরা যে শুধু পশ্চিমের উপকরণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছি তাহা নহে, কেবল তাহাই হইলে ভয় তত ছিল না। পশ্চিমের আদর্শ-দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ সেই মোহের অভিমুখে চলিয়াছি। ইহাই চরম সর্ব্বনাশের কথা। পশ্চিমের আদর্শ পশ্চিমের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে—যদিও সে সম্বন্ধে এখন চারিদিক্ হইতে প্রশ্ন উঠিতেছে। সে যাহাই হউক—আদর্শ—যাহা জীবন-ব্যাপারের মর্ম্মের সহিত অবিচ্ছেদ্য—তাহাকে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া—অপরের আদর্শ, অপরের পক্ষে তাহা যতই ফলপ্রদ হউক—তাহাকে বরণ করিয়া লইলে আত্মহত্যার পথে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হওয়া ব্যতীত আর কি। কর্ণের যে অক্ষয় কবচ সহজ ছিল, তাহার জীবনের সহিত অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া তাহার মর্ম্মদেশকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল—তাহা বিসর্জ্জন করাতেই তাঁহার মৃত্যু।

"আমরা বলি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্ব্বোচ্চ রাখিয়া পলিটিকাল দৃঢ়তাসাধন ভাল কি না, সেও তর্কের বিষয়। দেশের অন্য সমস্ত প্রয়োজনকে উত্তরোত্তর খর্ব্ব করিয়া সৈনিক-গঠনে য়ুরোপ প্রতিদিন পীড়িত হইয়া উঠিতেছে—সৈন্য-সম্প্রদায়ের অতিভারে তাহার সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেছে। ইহার সমাপ্তি কোথায়? নিহিলিষ্টদের অগ্ন্যুৎপাতে, না পরস্পরের প্রলয় সংঘর্ষে? আমরা স্বার্থ ও স্বেচ্ছাচারকে সহস্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া মরিতেছি, ইহাই যদি সত্য হয়, য়ুরোপ স্বার্থ ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া চিরজীবী হইবে কি না তাহারো পরীক্ষা বাকী আছে।"
[সমাজভেদ ; স্বদেশ, ১০৪-০৫]

পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং কবির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি ১৩০৮ সালে লিখিত; গত মহাযুদ্ধে এবং রুষীয় বিপ্লবে কবির দুই আশঙ্কাই সফল হইয়াছে। ইহার পর কবি বহুবার য়ুরোপে এবং একবার রাশিয়া গিয়া স্বচক্ষে তাহার ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য দেখিয়া আসিয়াছেন।

"সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমণ্ডপ হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেই জন্যই বোয়ার পল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।"
[সমাজভেদ ; স্বদেশ, ১০৮-০৯]

য়ুরোপ নেশনতন্ত্রী—এই নেশনত্বের উগ্র সাধনায় সে মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে—কিন্তু ধর্ম্ম তাহার ন্যায়দণ্ড লইয়া ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।

*　　*　　*　　*

একের স্পর্দ্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট্ বিধান।

*　　*　　*　　*

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বহি স্বার্থ-তরী গুপ্ত পর্ব্বতের পানে।

আবার

শতাব্দীর সূর্য্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
অস্ত গেল।

*　　*　　*　　*

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—

*　　*　　*　　*

লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতি-প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের, কবি যখন নিজের সগোত্রকে দেখেন—

কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি,
শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

এক একবার এই পশ্চিমের কোনে রক্তরাগ রেখাকে মনে হয় বুঝিবা ইহা "সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা, তব নব প্রভাতের।" কিন্তু ইহা "সন্ধ্যার প্রলয় দীপ্তি" মাত্র। ইহা কেবল—

চিতার আগুন
পশ্চিম সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার

বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।”

এই সান্ধ্যদীপ্তিকে প্রাতঃকালীন আলোক বলিয়া পাছে ভ্রম হয় তাই কবি সাবধান করিয়া দিতেছেন—

“আমাদের চতুর্দ্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্ব্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শাণিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনই অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্ব্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা, ধনমত্ততা, সেই উপকরণ-বহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে।” [প্রাচীন ভারতের একঃ ; ধর্ম্ম, ৫৪]

কিন্তু ইহাও তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, য়ুরোপ ন্যাশনাল মহত্ত্বের সাধনায় শক্তিমান্ ধনবান্ বিদ্বান্ হইয়াছে তবে আমরাই বা কেন সে পথ অবলম্বন করিব না।

“নেশন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি য়ুরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্ত্বকে আমরা অত্যধিক আদর করিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশন গঠনের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। য়ুরোপ স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আত্মার স্বাধীনতা ছাড়া অন্য স্বাধীনতার মাহাত্ম্য আমরা মানি না। রিপুর বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজা মহারাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করি।” [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ; স্বদেশ ; ৭৮]

তাহা ছাড়া—

“পনেরো ষোল শতাব্দী খুব দীর্ঘকাল নহে। নেশন-ই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি—তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি তাহার চারিত্র আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটী ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে। [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ; স্বদেশ ; ৭৯]

এই ন্যাশনাল মাহাত্ম্যের প্রভাবে—

> শক্তি-দম্ভ স্বার্থ-লোভ মারীর মতন
> দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন।
> দেহ হতে দেহান্তরে স্পর্শবিষ তার
> শান্তিময়-পল্লী যত করে ছারখার।

ইহা তো গেলো সমস্তই অতীতের কথা তবে ভারতবর্ষের জাগরণের আদর্শ কি? সেই প্রাচীন জীবনেই কি ফিরিয়া যাইতে হইবে? কিন্তু তাহা তো অসম্ভব—ইচ্ছা থাকিলেও হইবার নয়। যে আদর্শ পুরাতন হয়, তাহা অনুসরণ করিবার যোগ্য নয়; আবার কোন নূতন আদর্শকেও নানা কারণে গ্রহণ করা চলে না। যাহা সনাতন—অর্থাৎ প্রাচীন হইয়াও পুরাতন হয় না, আবার নবীন হইয়াও চিরস্থায়ী, এক কথায় যাহা চিরন্তন তাহাই জগতে বিশ্বাসযোগ্য। ভারতবর্ষের সেই ঋষিদের তপস্যাকে পুনরায় আমাদের জীবনে লাভ করিতে হইবে; সেই আলোকে পথের অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়া আমাদের সম্মুখে চিরন্তন পথ ফুটিয়া উঠিবে। কোনো প্রোগ্রাম বা স্কীম দেওয়া চলে না, জীবন যদি জাগে, অগ্নি যদি জ্বলে, তবে অন্য কিছুর জন্য ভাবিতে হয় না।

যে পরম ঐক্য বা বিশ্বচৈতন্য ঋষিপিতামহগণ অনুভব করিয়াছিলেন, যে ঐক্য-সূত্র ভারতবর্ষের সমস্ত খণ্ডতাকে, বিচ্ছিন্নতাকে, দৈন্যদুঃখ পরাভবজালকে একটি মাল্যাকারে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই পুনরায় সাধনার দ্বারা লাভ করা ব্যতীত উপায় নাই। এই ঐক্যে উপস্থিত হইতে পারিলে আর সমস্তই সহজ হইয়া যাইবে।

এই পরম ঐক্যের সাধনা ভারতবর্ষের ছিল বলিয়াই কোনো খণ্ড সার্থকতা তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই—না সমাজে, না রাষ্ট্রে, না ব্যবসায়-বাণিজ্যে। সমগ্র জীবনের সাধনাই তাহার। তাই ভারতবর্ষকে কোনো একাঙ্গীন সাফল্য লাভের কথা কবি উপদেশ করেন নাই;

তিনি বলিয়াছেন—

> এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
> দূর করে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,—
> লোকভয়, রাজ্যভয়, মৃত্যুভয়, আর।

তিনি বলিয়াছেন—

'কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার ?
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার।'

আবার—

'চিরদিন
জ্ঞান যেন থাকে মুক্ত, শৃঙ্খলবিহীন ;
ভক্তি যেন ভয়ে নাহি হয় পদানত
পৃথিবীর কারো কাছে; শুভ চেষ্টা যত
কোনো বাধা নাহি মানে কোনো শক্তি হতে ;
আত্মা যেন দিবা রাত্রি অবারিত স্রোতে
সকল উদ্যম লয়ে ধায় তোমা পানে
সর্ব্ব বন্ধ টুটি।'

আবার এই সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বকে জাগ্রৎ করিতে হইবে। এখন আমরা

—সহস্রের ভ্রকুটীর নীচে
কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে ; সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জ্জনী-সঙ্কেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া ; লইয়াছি শিরে পেতে
সহস্রশাসনশাস্ত্র,

ইহা আর চলিবে না ; তখন

এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই পুঞ্জপুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা।

এত বাধা দেখিয়া ভয় স্বাভাবিক। কিন্তু ভরসা এই যে—

"আছ তুমি অন্তর্য্যামী এ লজ্জিত দেশে।" এই পরম ঐক্যের কথঞ্চিৎ অনুভূতি হইলেই বলা সহজ হইবে—

করো না করো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক্ বিলাসী।

ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

তখন বলিতে পারিব—

"হে অক্ষয়পুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয়, ব্রহ্মের আনন্দ যে কি, তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্ব্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্ম্মল নির্ভয় জ্যোতির্ম্ময় দিন তোমার নিকট প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে আর একবার তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ, যন্ত্রতন্ত্র, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্ম্মল সন্তোষ-বলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। [প্রাচীন ভারতের একঃ ; ধর্ম্ম, ৫৩-৫৫]

তখন বলিতে পারা যাইবে—

সে পরম পরিপূর্ণ প্রভাতের লাগি
হে ভারত, সর্ব্বদুঃখে রহ তুমি জাগি
সরল নির্ম্মল চিত্ত ;

কারণ

তোমার নিখিলপ্লাবী আনন্দ-আলোক
হয়তো লুকায়ে আছে পূর্ব্ব সিন্ধু তীরে।

এখানে এমন একটা আভাস আছে যে, ভারতের যে জাগরণ তাহা শুধু তাহাকেই তৃপ্ত করিবে না—তাহা নিখিলপ্লাবী, হয়তো সমগ্র মানবের পক্ষে তাহা আবশ্যক।

তখন নির্ভয়ে বলিতে পারা যাইবে

তুমি থেকো সাজি'
চন্দন-চর্চ্চিত স্নাত নির্ম্মল ব্রাহ্মণ,
উচ্চশির ঊর্দ্ধে তুলি গাহিয়ো বন্দন—

"এস শান্তি, বিধাতার কন্যা ললাটিকা,
নিশাচর পিশাচের রক্তদীপশিখা
করিয়া লজ্জিত। তব বিশাল সন্তোষ
বিশ্বলোক-ঈশ্বরের রত্নরাজকোষ।
তব ধৈর্য্য দৈববীর্য্য ; নম্রতা তোমার
সমুচ্চ মুকুটশ্রেষ্ঠ, তাঁরি পুরস্কার।"

নিম্নের কবিতাটিতে কবি সংক্ষেপে এবং সমগ্রভাবে ভারতের সেই আদর্শস্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন।

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বাসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালিরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি'
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

এই পরম ঐক্যকে ভারতবর্ষ একদিন লাভ করিয়াছিল এবং লাভ করিয়া তাহা দর্শন শাস্ত্রের সুদুর্গম শিখরে রাখিয়া দেয় নাই, তাহা জীবনের বস্তু করিয়া তুলিয়া তাহাকে সমাজে রাষ্ট্রে সভ্যতায় ইতিহাসে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

"ঐক্য-মূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই।" [ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ, ৫৪-৫৫]

"ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে।" [ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ, ৫৬]
"এই ঐক্য বিস্তার ও শৃঙ্খলা স্থাপন কেবল সমাজ ব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি! গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।" [ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ, ৫৬]

"একত্বকে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই একত্বকে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটা অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।" [ভারতবর্ষের ইতিহাস, স্বদেশ, ৫৭]

২

এই পরম ঐক্যকে বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করা এক কথা, জীবনের দ্বারা উপলব্ধি ভিন্ন ব্যাপার। বুদ্ধি আমাদের জীবনের উপরতলার মালিক; কিন্তু নীচেরতলার যে গুপ্ত কক্ষগুলিতে আদিম যুগের গুপ্তধন সঞ্চিত, সেই সংস্কার প্রধান নিভৃত কক্ষগুলির চাবি বুদ্ধির হাতে নাই। যখন বুদ্ধি মানুষের অস্তিত্বের বল্গা ধারণ করে নাই, তখন যে আবেগে মানুষ চালিত হইত আজ তাহা গত—আজ তাহারা নত মস্তকে দিন যাপন করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের জটিল জীবন-ব্যাপারের প্রধান অভিনেতা বুদ্ধি নয়—যতই তাহা আবশ্যক হউক সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তাহার অবশ্যম্ভবতা যতই একান্ত হউক মানুষের পূর্ণ অস্তিত্বের প্রকাশ বুদ্ধিতে নয়।

বুদ্ধির দ্বারা যাহা আয়ত্ত হয় জীবনের চরম মুহূর্তে তাহা কোনো কাজেই আসে না—সে যেন অনেকটা কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা—শেষ মুহূর্তে কোনো কাজেই লাগিল না।

এতক্ষণ ভারতীয় আদর্শের যে কথা বলিলাম তাহা কবির বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত; কাজে তাহা লাগিয়াছে, ভারতবর্ষকে বুঝিতে সাহায্য করিয়াছে, কবির জীবনের পথ তাহা নির্দেশ করিয়াছে, কিন্তু জীবন-গঠনের উপাদান হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবি এই স্থানেই নিরস্ত হইলে ইহার মূল্য এমন কি আর হইত! কিন্তু যাহাকে বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে জীবনের দ্বারা সাধনাও করিয়াছেন—কবির সমগ্র জীবনের সহিত একাত্ম হইয়া উঠিয়া তাহা আর নির্গুণ আদর্শমাত্রে পর্যবসিত নাই—রক্তে মাংসে নূতন যুগের সমীরণে সমীরিত হইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

এই পরম ঐক্য যিনি জীবনের দ্বারা লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট দেশে, কালে, জীবনে, মৃত্যুতে, কোনো ভেদ থাকিতে পারে না—দুঃখ অহরহঃ খণ্ডতার দ্বারা তাঁহার অমিশ্র আনন্দে ছেদ ঘটাইতে পারে না—তিনি আব্রহ্মস্তম্ব একসূত্রে গ্রথিত দেখেন এবং নিজেকেও সেই মহামাল্যে সমন্বিত দেখিয়া বিস্মিত ও নিশ্চিন্ত হন।

তখন নগরের কর্ম্ম বন্যাই কী আর হেমন্তের শান্তিই কী! দিব্যচক্ষে সর্ব্বত্র প্রতিভাত হইতে থাকে—

তখন সহসা হেরি মুদিয়া নয়ন
মহা জনারণ্য মাঝে অনন্ত নির্জ্জন
তোমার আসনখানি—

তখন

জনশূন্য ক্ষেত্রমাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে

*   *   *

শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্য্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণু পরমাণুদের নৃত্য কলরোল
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

যেমন সেই বিশ্ব-আত্মা বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া বিরাজমান, তেমনি আমার এই ব্যক্তিগত আত্মাও আর ক্ষুদ্র নাই—দেশকালের গণ্ডি উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্বময় হইয়া গিয়াছে :

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে

তাহা তৃণে তৃণে সঞ্চারিত, পল্লবে পুষ্পে বিকশিত, বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্রদোলায় দোদুল্যমান।

সেই অনন্ত প্রাণ আমাকে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছে

সেই যুগযুগান্তের বিরাট্ স্পন্দন
আমার নাড়িতে আজি করিছে নর্ত্তন

কখনো বা বিস্ময়ে

দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
এ কী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার ?

কি বিস্ময়—

প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।

একদিকে যেমন সমস্ত দেশ সেই একের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি সমগ্র কাল, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সামা বিরহিত হইয়া সেই একের দ্বারা বিধৃত। তাহা যদি হয় তবে আর কেমন করিয়া মৃত্যুর বিচ্ছেদ থাকিতে পারে ?

মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর

আজ তাহার ভয়ে বিদায় লইতে চক্ষু ছল ছল করিতেছে কিন্তু যে সত্তা জন্মের পূর্ব্ব হইতেই জীবনকে এমন প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিল

মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্ত্তে চেনার মতো। জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিবো নিশ্চয়।



যেটুকু বিচ্ছেদ—সেটুকু কি রকম—না—

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।

ভীতির কারণ ছিল বটে, কারণ এই শক্তিসঙ্কুল আনন্দবিরহিত বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মকতা অনুভব না করিলে, ইহাকে ঐক্যহীন খণ্ডতার দ্বারা ক্ষুব্ধ করিয়া দেখিলে, ইহার মত নির্ম্মম আর কি আছে।

জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে
এ আশ্চর্য্য সংসারের মহা নিকেতনে
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর।

কিন্তু যখনি প্রভাতে নয়ন মেলিলাম

তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষ সম।

এখন প্রশ্ন এই যে "রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি" যাহার সম্বন্ধে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়

এক হতে দুই
কেমনে যে হতে পারে জানি না কিছুই।

সেই বিচিত্র, অজ্ঞেয়, মহা ভয়ঙ্কর কি করিয়া আমাদিগকে তৃপ্তি দিতে পারে?

মানুষের মন রূপের জন্য ক্ষুধিত, আর রূপের লক্ষণ সীমা। এখন এই যে অসীম সত্তা তাহা কেমন করিয়া এইরূপ আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করে?

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারিভিতে।

আবার

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চার ক্ষেত্র,—সেথা শুভ্রভাস
দিন নাই রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী।

তিনি অসীমও বটেন, সসীমও বটেন, তিনি সীমার মধ্যে অসীম। এই বাণীই রবীন্দ্রনাথের সকল বাণীর মূলে—সমগ্র কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া ইহাই তাঁহার বক্তব্য। ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের আভাস, বৃহতের অন্তর্গত করিয়া সমস্ত খণ্ডতাকে দেখা ইহাই ভারতের লক্ষ্য—কবিও নিজের জীবনে ইহা উপলব্ধি করিয়া, সাহিত্যে ইহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি আকাশ—নির্গুণ, "শুভ্রভাস" চৈতন্য মাত্র—বর্ণ-গন্ধ-বাণী-হীন, ইন্দ্রিয়ের অতীত অরূপ। ভক্তির ক্ষেত্রে তিনি নীড়, গুণময়, বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ শব্দে অপরূপ। রবীন্দ্রনাথ যেখানে তাত্ত্বিক সেখানে এই সত্তা 'আকাশ' মাত্র; যেখানে তিনি কবি সেখানে ইহা 'নীড়'; আর যেখানে তিনি তাত্ত্বিক-কবি সেখানে "একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।" উপনিষদে প্রধানতঃ এই সত্তাকে 'আকাশ' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, বৈষ্ণব কবিগণ ইহাকে 'নীড়' বলিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই দ্বিবিধ কল্পনাই আছে; কারণ তিনি শিশুকাল হইতেই যুগপৎ কবিত্ব ও উপনিষদ্ এই দুই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইয়াছেন; এবং

এই দুইয়ের সমন্বয় তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে—ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব। কোনো রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহার সাহিত্যের কি গদ্য—কি পদ্য সর্ব্বত্রই এই মূল বাণী নানা ফলে পুষ্পে পল্লবে বিকশিত হইয়াছে।

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা-অতীত,

* * *

চিত্ত বাতায়ন মম
সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রিদিন
রাখিব উন্মুক্ত করি, হে অন্তবিহীন।

এই অনন্তের প্রতি তাঁহার জীবনের একটি বাতায়ন চিরদিনই উন্মুক্ত।

৩

যিনি এই সত্যকে বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করিয়াছেন, জীবনের দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার সাধনা আর কি রকম হইতে পারে? তাঁহার সাধনা সমগ্র জীবনের পূর্ণতার সাধনা। কেবল মনের দ্বারা জ্ঞানের সাধনা নহে, কেবল হৃদয়ের দ্বারা ভক্তির সাধনা নহে, কেবল ইচ্ছার দ্বারা কর্ম্মের সাধনা নহে; তাহা কামিনীকাঞ্চন-বর্জ্জনের বৈরাগীর সাধনা নহে। তাহা পরিপূর্ণ-অস্তিত্বের দ্বারা অখণ্ড সত্যের সাধনা—এক কথায় তাহা কবির সাধনা।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

* * *

প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন—সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

প্রাকৃতিক জগতে আমরা কি দেখি। এই পৃথিবীর উপরই কত না গ্রহ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ, বিকর্ষণ, প্রত্যাকর্ষণ কাজ করিতেছে, এই সব আকর্ষণজাল যদি দৃষ্টিগম্য

হইত তবে ঠিক একটি জটিল শক্তিজালের মতো দেখাইত। এই জটিল এবং বিশাল শক্তিজাল-দ্বারা পৃথিবী বিধৃত তবু তো তাহার গতি অবাধ, তাহার মুক্তির লেশমাত্র অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না, বরঞ্চ এই শক্তিজালের সামঞ্জস্যেই তাহার মুক্তির মন্ত্র।

যাহা প্রাকৃতিক জগতে দেখিলাম, আত্মিক জগতেও তাহারই অনুবর্ত্তন; বৃহৎ সংসারের মধ্যে বিচিত্র সম্বন্ধের দ্বারা, দাবীর দ্বারা আমরা বিধৃত; কিন্তু তাহাতে প্রকৃতপক্ষে মুক্তির লেশমাত্র বাধা ঘটে না।

আর যে বৈরাগী সংসারকে ত্যাগ করিয়া এই বিচিত্র সম্পর্কজালের মোহ কাটাইয়া সংসারাতীত ব্রহ্মকে পাইতে চলিল সে তো ওই মধ্যরাত্রের পতনশীল উল্কাখণ্ডটি! তাহার মুহূর্ত্তের জ্যোতির্জ্বালা ও চলিষ্ণুতা চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া বাহবা আকর্ষণ করে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইয়া অপার বিস্মৃতির মধ্যে তলাইয়া যায়।

ব্রহ্ম সংসারকে অতিক্রম করিয়া আর কোথাও বসিয়া আছেন এমন নহে; তিনি সংসারকে অধিকার করিয়া আছেন, কাজেই সংসারে রহিয়াই তাঁহার সাধনা চলিতে পারে। এ সেই সীমার মাঝে অসীমের কথা—সংসার সসীম কিন্তু অসীম যিনি তিনি সেখানেও আছেন।

কেবল যে সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মের সাধনা চলিতে পারে তাহা নয়, সংসারই তাঁহার সাধনা,—শ্রেষ্ঠ-সাধনার ক্ষেত্র।

"আমরা বিশ্বের অন্য সর্ব্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদান-প্রদান চলে না—তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্ম্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে কর্ম্মে প্রেমে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতমরূপে জানিয়া বারবার তাহাকে নমস্কার করি।

* * * *

এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়—

* * * *

এই জন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্ম্ম-দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই।

* * * *

এই জন্য মানব-সংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোটবড় সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই, ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক—কেবল জ্ঞানের উপাসনা—কেবল ভাবের উপাসনা—সেই উপাসনা-দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি—কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।"

[ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্ম, ৬৯-৭০-৭১]

সেই জন্য সংসারকে কবি ভয় করেন না

বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায়,
তব নরনারী সবে দিগ্‌দিগে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে,
বাসনার টানে।

কবি আপনার সব দ্বার খোলা রাখেন, তাহা দিয়া সংসারের যত ছায়ালোক যত ভুল দুঃখ শোক ভালো মন্দ গীত গন্ধ প্রবেশ করে।

সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন পথ দিয়ে আমি চিত্তে পশিতাম?

এ সেই কথা

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন—সে নহে আমার।

যে সব মুহূর্ত্ত আমরা সংসারের কাজে-কর্ম্মে ব্যয় করি হঠাৎ এক সময়ে সেইগুলি তুলিয়া দেখিতে পাই—

তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি

তখন বলিতে হয়

হে নাথ, অবজ্ঞা করি যাও নাই ফিরে
আমার সে ধূলাস্তূপ খেলাঘর দেখে,
খেলা মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে

যে চরণধ্বনি—আজি শুনি তাই বাজে
জগৎ-সঙ্গীত সাথে চন্দ্র সূর্য্য মাঝে।

তোমাকে হৃদয়ের স্থান দিবার জন্য কাহাকেও হৃদয় হইতে বহিষ্কার করিতে হয় না—বরঞ্চ

যত করি দান
তোমারে হৃদয়ে মম, তত হয় স্থান
সবারে লইতে প্রাণে।

বন্ধুদের সহিত হাস্য-পরিহাসে অর্দ্ধরাত্রি কাটাইয়া কবি যেই মহা আকাশের তলে দাঁড়াইলেন অমনি বুঝিতে পারিলেন—

খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ-প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

সংসারের প্রতি প্রেমকে অবজ্ঞা করিবার প্রয়োজন নাই—সেই প্রেমের স্বাভাবিক পরিণাম ভক্তিতে। বীজকে অবজ্ঞা করিলে বৃক্ষকেই অবজ্ঞা করা হয়—কবির সাধনার সহজ পরিণামে মোহ মুক্তিতে এবং প্রেম ভক্তিতে সফল হইয়া উঠে:
কবি এই তীর্থে আসিয়াছেন

স্নানে পানে
অপরাহ্ন হয়ে এলো গল্পে হাসি গানে;

তবু তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তীর্থদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হন না। কেবল একবার বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে।

তার পর
নব তীর্থে যেতে হবে, হে বসুধেশ্বর।

এই আপাত আলস্যে তীর্থদেব ব্যস্ত হন না কারণ

হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।

আর যদি তাঁহাকে পূজা করিতে ভুলিয়াই যাই তাহাতেই বা কি—

তব পূজা না আনিলে দণ্ড দিবে তারে
যমদূত লয়ে যাবে নরকের দ্বারে—
ভক্তিহীনে এই বলি যে দেখায় ভয়
তোমার নিন্দুক সে যে, ভক্ত কভু নয়

তিনি তো পূজা চাহেন না

তুমি চাও নাই পূজা সে চাহে পূজিতে ;

তিনি তো ধরা দিতে চাহেন না

আপনারে জানাইতে নাই তব ত্বরা।

তবু ভক্ত তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহে। মর্ত্ত্যবাসীদের তিনি এমন ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন—যাহা প্রথমে মর্ত্ত্যের সকল আশা মিটাইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়—তখন তাহা আপন ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। নৈবেদ্যকে কেবল পূর্ণ দেশাত্মবোধের কাব্য বলিলে ছোট করা হয়—ইহাতে পরিপূর্ণ মানব-সত্তার সর্ব্বাঙ্গীণ উদ্বোধন; তাহার মধ্যে দেশ আছে, রাষ্ট্র আছে, সমাজ আছে, বিশ্ব আছে, বিশ্বনাথ আছেন; মানবসত্তা যখন জাগে তখন পরিপূর্ণভাবেই জাগে; কোনো অংশ বিশেষ জাগে না; এবং একবার তাহা জাগিলে প্রত্যেকটি অঙ্গ আপনার ন্যায্য স্থান লাভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতার প্রকাশ করে।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহাতে আশা করি এই সত্যটিই স্পষ্ট হইয়াছে—ইহাতে কবি পরিপূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার দৃষ্টি একদেশদর্শী না হইয়া সমগ্র দৃষ্টিলাভ করিয়াছে।

যে পূর্ণ দৃষ্টি তিনি "আইডিয়া" ভাবে লাভ করিয়াছেন তাহা কেবল জীবনে স্বীকার না করিয়া কর্ম্মেও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে অধিকাংশ "আইডিয়া" কর্ম্মে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই খোলে-করতালে উত্তাল হইয়া অশ্রুধারায় নির্ব্বাণলাভ করিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

আজি সেই ভাবাবেশ

সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ

তবে দুঃখের কিছুই নাই—এবার

দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল।

এবার—

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।

* * *

ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন

কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।



"নৈবেদ্যের সময় হইতে, অর্থাৎ ১৩০৮ সালে বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতার ভার গ্রহণের

সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক জীবনের আরম্ভ।" [রবীন্দ্রনাথ—অজিত চক্রবর্ত্তী —৭৭]

স্বাদেশিক জীবন বলিলে তাহার মূল ভাবটিকে খাটো করা হয়—তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। আবার এই সময় "বোলপুর আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ। ভারতবর্ষের মূল ভাবটি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনার আবশ্যক—সে সাধনা ভগবানের নির্জ্জন ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা। তপোবনের সাধনা সংসারবিমুখতা নয়—সংসারকে সম্পূর্ণভাবে সম্মুখীন হইবারই সাধনা। জীবনের অন্য তিন আশ্রমের প্রকৃত ভিত্তিপাত এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে।

এই আশ্রমটি কবির জীবনের তাপমান যন্ত্রের মতো; উত্তরকালে কবির জীবনে যে সব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে সমস্ত নবভাবের সমাবেশ হইয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানও সেই অনুসারে উত্তরোত্তর পরিণত হইয়াছে। কবির ভাব কেবল বাষ্পাকারে না থাকিয়া বাস্তবে যে মূর্ত্তিলাভ করিল তাহার বীজ এই নৈবেদ্যের আন্তরিকতার মধ্যেই নিহিত ছিল।

নৈবেদ্য পড়িবার সময় মনে রাখা উচিত, প্রকৃতপক্ষে এইখানে কবির জীবনদেবতা পর্ব্বের সমাপ্তি ও বিশ্বদেবতা পর্ব্বের সূত্রপাত। ইহাতে ভাবের ও প্রকাশের যে সহজ সরল ও সতেজ ভাব আছে তাহা কবির অন্যান্য গ্রন্থে বিরল। এত স্পষ্টভাবে, এত সাদাসিধাভাবে এমন খোলাখুলিভাবে তিনি নিজেকে আর কোথাও প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশ-ভঙ্গীর দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাই নৈবেদ্যের বিশেষত্ব।

পাতা মুড়িবেন না।

শিশু

শিশু কাব্যের কবিতাগুলি তিন ভাগে সাজানো চলে। প্রথমতঃ গোটা কয়েক অনুবাদ; দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি পূর্ব্বতন কাব্যগ্রন্থ হইতে বাছিয়া লওয়া, ইহাদের অধিকাংশই কবির অল্প বয়সের রচনা। তৃতীয়তঃ প্রথম বত্রিশটি কবিতা। এই শেষোক্ত অংশটিকেই প্রকৃত শিশু কাব্য নাম দেওয়া যায়, এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাই প্রধানতঃ আলোচনার বিষয়।

"স্ত্রী বিয়োগের পর একবৎসর যাইতে না যাইতেই মধ্যমা কন্যার মৃত্যু হইল। তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য যখন তিনি আলমোড়া পাহাড়ে ছিলেন, তখন একটি নূতন কাব্য সেখানে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম শিশু। পীড়িতা কন্যা, মাতৃহীন শিশুপুত্র শমী, কবির কাছে মাতার ও পিতার উভয়ের স্নেহলাভ করিয়াছিল। সেই একটি গভীর স্নেহ হইতে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের মধ্যে আপনার কল্পনা-প্রবণ বালক হৃদয়ের সুখ দুঃখ জাগিয়া এই কাব্য শিশু-জীবনের আনন্দলোককে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।"

শিশু কাব্যের এই তৃতীয় বা প্রধান অংশ রচনার ইহাই ইতিহাস। গোড়াতেই একটা প্রশ্ন পাঠককে আন্দোলিত করে, শিশু-মনের রহস্যের প্রতি কবির এই অনুসন্ধিৎসা কেন? যদি এই কাব্যখানির সবটা পূর্ব্ববর্ণিত সময়ে ও অবস্থায় লিখিত হইত, তবে একটা উত্তর মিলিত বটে। কিন্তু ইহার প্রায় অর্দ্ধভাগ কবির পূর্ব্ব রচনা। বস্তুতঃ ছবি ও গান হইতে শিশু বিষয়ক কবিতার সুরু। তখন কবির বয়স্ ২২ বৎসর। অনুবাদের আকারে শিশু বিষয়ক কবিতার প্রথম দেখা পাই প্রভাত সঙ্গীতে, তখন কবির বয়স্ আরও অল্প। সাধারণতঃ দুইটি কারণে কবি চিত্ত শিশু-মনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শিশু-মনের রহস্য, শিশু জীবনের অচিন্তনীয়তা কবিকে কোন একটি তত্ত্বের সন্ধান দেয় এবং সেই তত্ত্বরসে কবি অভিষিক্ত হইয়া কাব্য সৃষ্টি করেন। বৈষ্ণব-পদকারগণ এই তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা কাহারো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় ছিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবন বাল্য হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবন পর্য্যন্ত একটি বিশিষ্ট তত্ত্বের আকারে বিরাজ

করিতেছে। বাৎসল্য, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি রসের দ্বারা ইহাকে নমনীয় করিয়া পদকর্তৃগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে ইহাকে রূপ দিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টিশক্তির সহৃদয়তায় ও প্রবলতায় তত্ত্ব আপন নির্জ্জীব শুষ্কতাকে অতিক্রম করিয়া সরস ও সজীব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত। ধ্যানের সামগ্রী হৃদয়ের ধন হইয়া উঠিত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কোন একটি তত্ত্বের দ্বারা শিশু-মনের প্রতি আকৃষ্ট হন নাই। তিনি শিশু-দ্বারা শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রথমতঃ যে বয়সে তিনি শিশু বিষয়ক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইবার বয়স্ নহে। তাঁহার এই সময়ের কবিতার শিশু বিশিষ্ট বালক বালিকা। পদকর্ত্তাদের বালক শ্রীকৃষ্ণ,—আদর্শ শিশু। বিশেষ, কবির এই বয়সের কবিতাগুলিতে কোনও একটি তত্ত্বের পরিস্ফুট মূর্ত্তি ধরা পড়ে না। ইহার সহিত তাঁহার পরবর্ত্তী কাব্যগ্রন্থ "শিশু-ভোলানাথের" তুলনা করিলে আমাদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইবে। শিশু-ভোলানাথের সৃষ্টির গুপ্তস্তরে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই থাকুক, ইহার মূলে একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব আছে। একটি আদর্শশিশু সৃষ্টি করিয়া তাহার জীবনের রসে নিজ জীবনটা সরস করিয়া 'দ্বিতীয় বাল্যকাল' যাপন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এই শিশুটির স্বরূপ কি? না, শিশু-ভোলানাথ। সাংসারিক ভালো মন্দ, ভুল ভ্রান্তি, লাভ ক্ষতির ঊর্দ্ধে তাহার খেলাঘর এবং একদিনের খেলনা পরদিনে ভাঙাই খেলা। এই আদর্শশিশুর মধ্যে কবি মুক্তির একটি অতি সহজ ও স্বাভাবিক রূপ দেখিতে পাইয়াছেন। বয়ঃশিথিল কবির তাহারই প্রতি একান্ত আসক্তি। শিশু কাব্যখানি বিশিষ্ট শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে একটি তত্ত্বে পৌঁছিয়াছে, আর শিশু-ভোলানাথের মূলেই একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব। শিশু ও শিশু-ভোলানাথের ইহাই মূলতঃ প্রভেদ।

শিশুর জীবনের প্রতি প্রেরণার মূলে যে-রস তাহার অভিব্যক্তি কবির জীবনে কি ভাবে ঘটিয়াছে, তাহা আরও একটু বিশদভাবে দেখা আবশ্যক। নতুবা শিশু কবিতা সম্যগ্‌ভাবে বুঝা যাইবে না। কবি নিজে অল্প বয়সে মাতৃহীন; মাতৃহীন বাল্যজীবনের অনাস্বাদিত মাতৃস্নেহ সুধা, বাস্তবে যাহা লাভ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই, কল্পনায় তাহা পূরণ করিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চিরদিন ছিল। তাঁহার সেই মাতৃহীন জীবনের অনাস্বাদিত সুধা এতদিন মূর্ত্তি লাভের জন্য কবির অগোচরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। এতদিনে তাহারা একটা আশ্রয় পাইল। কবির স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিল। ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে নিজ পুত্রকন্যার মধ্যে কবি নিজের নিঃসঙ্গ বাল্যকালকে যেন প্রত্যক্ষ করিলেন। শিশুর কবিতাগুলির মধ্যে এই দ্বৈত-মাতৃ-বিয়োগের স্মৃতি। এই কাব্যে তিনজন নায়ক।

শিশু, তাহার পিতা ও মাতা। তন্মধ্যে শিশু ও মাতাকেই আমরা প্রত্যক্ষতঃ পাই; পিতা অধিকাংশ স্থলেই নেপথ্যে বিরাজ করিতেছেন। সাংসারিক জীবনে আমরা দেখি যে শিশু ও মাতার সম্পর্কটাই নিবিড়তর ও একান্ত, শিশু মাতার গর্ভগ্রন্থি কাটিয়া বাহির হইয়াও সম্পূর্ণভাবে যেন পৃথক্ সত্তা লাভ করে নাই। সে মাতার অস্তিত্বেরই যেন একটা অংশ। শিশুর যে রাজ্যে বাস মাতা যেন তাহারই সীমান্ত রাজ্যের অধিবাসী। শিশুর সহিত মাতার এমন ভাষায় কথাবার্ত্তা চলে, বাহিরে লোকের নিকটে, পিতার নিকটেও, তাহা দুর্ব্বোধ্য এই ভাষা বুঝিয়া মানব-ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে কবির কাব্যের আবশ্যক। ইহার সহিত কবির বাল্যস্মৃতি যোগ করিয়া লওয়া যা ক। ইহা কবির বাস্তব জীবনের মাতৃহীন নিঃসঙ্গতার কাল্পনিক পরিপূর্ণতা; বাস্তবে যে মাতাকে হারাইয়াছিলেন, কল্পনায় সর্ব্বদা সেই মাতৃসঙ্গ-লাভের আকাঙ্ক্ষা। এই দুইটি কারণ অনুধাবনা করিলে শিশু-কাব্যে শিশু ও মাতার নৈকট্য ও নিবিড়তার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে। আবার শিশুর পিতা সর্ব্বদাই দূরে, ইহাও স্বাভাবিক। এই বাহ্য দূরত্ব আন্তরিক দূরত্বের প্রতীক। শিশু ও তাহার পিতা দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী। শিশু বুদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে বুদ্ধিবৃত্তিতে কম বলিয়া যে ইহা ঘটে তাহা নহে, তৎপূর্ব্বে সে সম্পূর্ণ পৃথক্ জগতের নিয়ম-দ্বারা পরিচালিত। সে জগৎকে রূপকথার জগৎ বলিতে পারি। এইজন্য শিশু কাব্যগ্রন্থে পিতা কদাচিৎ শিশুর জগতে উপস্থিত, তিনি সর্ব্বদাই বিদেশে। ইহার সহিত কবির বাল্যজীবনে বাড়ী হইতে দূরস্থিত পিতৃস্মৃতি যোগ করিয়া লইলেই ব্যাপারটা সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট হইবে। শৈশবটা মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় রহস্য; অল্প বয়সে সেটা এতই কাছে থাকে যে চোখে পড়িয়াও পড়ে না; পরিণত বয়সে সেটা এতই দূরে চলিয়া যায় লক্ষ্য করিয়াও করা যায় না। এ যেন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের নভঃশায়ী সেই লক্ষ্য, স্মৃতি-সরোবরের ছায়াটি মাত্র ছাড়া আর যাহার কোনও চিহ্ন কোথাও নাই।

রবীন্দ্রনাথ স্মৃতির সেই সরোবরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এই দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং শিশুর সহিত তাহার পিতা ও মাতার সম্বন্ধের বৈচিত্র্যে শিশু মনস্তত্ত্বের গভীর পরিচয় দিয়াছেন। শৈশবের এই যে রহস্যের কথা বলিলাম, শিশুর জীবনের এই রহস্য চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই আকর্ষণ করে। কবির ডুবারী হৃদয় ইহার গভীরতার পরিমাপ করিতে গিয়া অনেক মণিমুক্তা উদ্ধার করিয়াছে। প্রত্যক্ষ্য জীবনের পরপারের রহস্যের জন্য মানুষে চিরদিন উদ্‌গ্রীব—শিশু যখন সেই অজ্ঞাত লোক হইতে সংসারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই। নাবিক কলম্বাসের বাহিনী আমেরিকার

দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিলে সেখানকার অধিবাসীরাও বোধ করি এত বিস্মিত হয় নাই। "জন্মকথা" কবিতাটিতে শিশু ও মাতার মধ্যে রহস্যজনক সম্বন্ধটি কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই রহস্য মাতার নিকট যত বিস্ময়ের—শিশুর নিকটে তাহার কম নয়। শিশুর প্রশ্ন: "এলেম আমি কোথা থেকে, কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?"

মাতা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? এই খোকা তাঁহার প্রেমে, তাঁহার মাতা মাতামহীর আকাঙ্ক্ষায়, গৃহদেবীর কোলে, তাঁহার যৌবনের লাবণ্যে এতকাল অবিমিশ্রভাবে ছিল।

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন
তুই প্রভাতের আলো সমবয়সী।

তারপরে—

নির্নিমেষে তোমায় হেরে
তোর রহস্য বুঝিনেরে—
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে?

এই প্রশ্ন শুধু তাহার মাতার নহে, আমাদেরও বটে। বিজ্ঞান ইহার সঠিক উত্তর দিতে পারে নাই, কবিও সে চেষ্টা করেন নাই। এই রহস্যের রসে তাঁহার কবি-চিত্তে কতকগুলি প্রশ্ন, সন্দেহ, বিস্ময়, বাৎসল্য ভাবের একটি তরঙ্গ জাগিয়াছে, কবিতায় তাহারই প্রকাশ। এই কবিতাটি সম্বন্ধে দুই-একজন বিজ্ঞ সমালোচক বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন মাতা ও শিশুতে এমন দার্শনিক আলোচনা তাঁহারা কখনো শোনেন নাই। শোনেন যে নাই তাহার অনেক কারণের মধ্যে একটি এমন দার্শনিক আলোচনা মাতা ও শিশুতে কখনো হয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি শিশু ও তাহার মাতা স্বভাষী ও একই জগতের অধিবাসী। তাহাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয় তাহার অধিকাংশই মানুষের আদিম ভাষায়—যখন মানব জাতিটাই শিশু ছিল। বিজ্ঞ সমালোচক যদি তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের আশায় আড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকিতেন, তবু কিছু বুঝিতে পারিতেন না। সে ভাষায় খানিকটা হাসিকান্না, খানিকটা আদরচুম্বন, নিতান্তই বিনাকারণে; খানিকটা বা একান্ত অপ্রয়োজনে, শিশুর মুখে তাকাইয়া বসিয়া থাকা; খানিকটা বা আধো আধো অস্ফুট ভাষণ প্রতিভাষণ; কোন ভাষাতত্ত্ব যাহার চৌকাঠ অতিক্রম করিতে পারে না; সে ভাষার

অধিকাংশ শব্দই অভিধানের গণ্ডির বাহিরে। এই ব্যাপারটাকে কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া মানব-ভাষায় ও ছন্দে অনুবাদ করিলে এই জাতীয় একটা কবিতা আকারে দানাবাঁধা সম্ভব যাহার মূল সুরটি—

এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।
নির্নিমেষে তোমায় হেরে,
তোর রহস্য বুঝিনেরে,
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে ?

একজন আবার ইহাতে বাৎসল্য রসের অভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু শিশু বিষয়ের কবিতা হইলেই বাৎসল্য রসের সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে এমন কথা কে বলিল! এই রহস্য নানাভাবে কবি-চিত্তকে আন্দোলিত করিয়াছে, এই রহস্য যে এত গভীর তাহার কারণ খোকা আমাদের জগতের বাসিন্দা নয়—তাহার জগৎকে রূপকথার জগৎ বলা যাইতে পারে। পরিণত মানুষের পক্ষে খোকার মনস্তত্ত্ব বোঝা সহজ নয়; কবিরা খানিকটা পারেন, তাঁহারা শিশুর স্বভাব সরলতার সহিত পরিণত বয়সের চিন্তাশীলতাকে একত্র পাইয়া থাকেন। প্রথমে এই রূপকথার দেশের মনস্তত্ত্বটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। এই দেশের প্রধান লক্ষণ এখানে বাস্তব ও কল্পনার সীমা সুনির্দ্দিষ্ট নয়। পরিণত বয়সের সাংসারিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহাদিগকে বিশিষ্টভাবে স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা হইয়াছে। একটি আর একের কাছে ঘেঁসে না। কিন্তু রূপকথার দেশে ইহারা যেন এক পাঠশালার সহপাঠী। একজন ধনীর পুত্র, অপর গরীবের। কিন্তু শৈশবের স্বাভাবিক সরলতায় সে প্রভেদ সম্বন্ধে তাহারা নিতান্ত অচেতনভাবে পরস্পরে মেলামেশা করে। তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না পাঠশালার বাহিরে যে সংসার আছে, সেখানে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে, সেখানে আর শৈশবের এ সখ্য বজায় রাখিবার উপায় নাই। খোকা এই নিয়মে মানুষ, কাজেই সে কখনো সত্যকে স্বপ্ন করিয়া তুলিতেছে, স্বপ্নকে সত্য বলিয়া ভাবিতেছে। সে দেশের অদ্ভুত নিয়মটা জানি না বলিয়াই আমরা বলিয়া থাকি ছেলেমানুষি। এই রূপকথার দেশের ভৌগোলিক সংস্থান কোথায় তাহা জানা যায় না, তবে খুব সম্ভব, যে সীমান্তে প্রকৃতির রাজ্য ও মানুষের রাজ্য মিলিত হইয়াছে, তাহার কাছেই হইবে; কিংবা কবির ভৌগোলিক তত্ত্ব অনুসারেই ইহা জগৎমাতার ও জগৎপিতার রাজ্যের সীমান্ত-

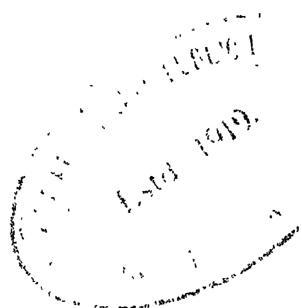
প্রদেশে। খোকা এই জগৎমাতার রাজ্যের ও বয়স্ক মানুষ জগৎপিতার রাজ্যের অধিবাসী।

খোকা থাকে জগৎমায়ের
অন্তঃপুরে
* * *
সত্যবুড়ো নানা রঙের
মুখোস পরে
শিশুর সনে শিশুর মত
গল্প করে।
চরাচরের সকল কর্ম্ম
করে হেলা
মা যে আসেন খোকার সঙ্গে
করতে খেলা।
খোকার জন্য করেন সৃষ্টি
যা ইচ্ছে তাই—
কোন নিয়ম কোন বাধা
বিপত্তি নাই।
* * *
খোকার তরে গল্প রচে
বর্ষা শরৎ—
খেলার গৃহ হয়ে ওঠে
বিশ্বজগৎ।

এই তো সেই দেশের বিবরণ। সেখানে জগৎমাতা খোকাকে খুসী করিবার জন্য এককে আর করিয়া তুলিতেছেন—হয়তো তাহারও একটা নিয়ম আছে, কিন্তু সে আমাদের দেশের নিয়ম নয়; কারণ—

আমরা থাকি জগৎপিতার
বিদ্যালয়ে
* * *
নিয়ম থাকে বাগিয়ে লয়ে
রসারসি।

সুখ দুঃখ এমনি বুকে
চেপে রহে
যেন তারা কিছুমাত্র
গল্প নহে।
যেমন আছে তেমনি থাকে
যে যাহা তাই
আর যে কিছু হবে, এমন
ক্ষমতা নাই।
বিশ্বগুরুমশায় থাকেন
কঠিন হয়ে,



দুই জগতে যখন এত প্রভেদ—শিশু ও বয়স্কের মধ্যে যে রহস্যের একটা দূরত্ব থাকিবে আশ্চর্য্য কি! শিশুর কাছে বাস্তব ও কল্পনার সীমা স্পষ্ট নহে বলিয়াই তাহার পক্ষে যাহা ইচ্ছা তাহা হওয়া অসম্ভব নহে; এবং বয়স্ক মানুষের মত পশুপক্ষী, তরুলতা ও মানুষের মধ্যে সীমান্তকে নিশ্চল মনে না করাই সম্ভব। শিশু বুঝিতে পারে না

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুরছানা

তবে কেন তার মা তাহাকে পাতে মুখ দিতে নিষেধ করিতেন, কিংবা

যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে,

কেনই বা তার মা তাহাকে শিকল কাটার দোষে গালি দিতেন! খোকার পক্ষে কুকুরছানা বা টিয়ে হওয়া যেমন সম্ভব, হঠাৎ চাঁপাগাছে চাঁপাফুল হইয়া ফুটিয়া ওঠাও বিচিত্র নয়—এই ভেদজ্ঞান খোকার নাই বলিয়াই তাহার পক্ষে "কানাই মাষ্টার" সাজিয়া বিড়ালছানাকে পোড়ো মনে করিতে আপত্তি নাই। কিংবা আষাঢ় মাসের পুষ্পরাশিকে পাঠশালা-পলাতক ছাত্রের দল মনে করিতে বাধা দেখি না। এই একাত্মকতার বলে চুড়ি-আলার সাথে চুড়ি-আলা সাজিতে, বাগানের মালীর সঙ্গে মাটি কোপাইতে কিংবা—

লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে

স্তিমিত গ্যাসের আলোকে পাহারা-অলা হইয়া গলির মোড়ে পাহারা দিতে কোনই বাধা নাই। শুধু যে প্রাণি-জগতে খোকা বাধা-বন্ধহীন হইয়া সঞ্চরণ করে তাহা নয়, দেশ ও কালের জগতেও তাহার না আছে কোন সীমা, না আছে কোন বাধা। দেশ ও কালের প্রচলিত সংস্কার হইতে সে এতটা মুক্ত যে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না--

রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
দুপুর বেলা রাত হবে না কেন?

দেশ ও কালের প্রভেদ নাই বলিয়াই নিজেকে মুহূর্ত্তে দাদার অপেক্ষা বড় ও চুম্বননত মাতৃমুখকে চাঁদের সমান মনে করাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের নাই। এই যেমন জীবজগৎ ও বস্তুজগৎ, তেমনি আর একটি জগৎ মানবের মানসিক দিগন্তের মধ্যে চিরদিন বিরাজ করিতেছে—কল্পনার জগং—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহাকে রূপকথার জগৎ বলিতে পারি; বয়স্ক মানুষ ইহাকে কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি করিলেও ইহা হইতে খানিকটা স্বতন্ত্র কিন্তু শিশু একান্ত সহজ স্বাধিকারে ইহার আদিম অধিবাসী; কাজেই এই জগৎ-সম্বন্ধেও সে স্বাভাবিক একাত্মতা অনুভব করে।

শিশু এই রূপকথার জগতের অধিবাসী বলিয়াই এ দেশের লোকের সঙ্গে সগোত্রত্ব অনুভব করে। প্রত্যক্ষ জগৎ-সম্বন্ধে বরঞ্চ তাহার মনে দ্বিধা ও অবিশ্বাস আছে, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ এই কল্পনার জগতের বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমরা বয়স্ক মানুষেরা কোন কিছুর অস্তি-নাস্তি-সম্বন্ধে বড়ই রক্ষণশীল; প্রমাণের কাঁটা বাছিয়া আমাদের পথে চলিতে হয়। কাজেই প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া বসি এ রূপকথার দেশ কোথায়? স্বীকার করিতেই হইবে রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটী ইহার সন্ধান জানে না। কিন্তু শিশুচিত্তের সম্বন্ধে যাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন ইহা কাছেও বটে দূরেও বটে, সর্ব্বত্রই, সুতরাং কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নয়। এমন যে অদ্ভুত রাজ্য কেমন করিয়া তাহার খবর পাওয়া যায়! কবি বলেন—

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে—
আমি যদি পারি বাসা নিতে—
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার—
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।

এই দৃষ্টি লাভ করিলে কি দেখিব—

যারা আমাদের কাছে
নীরব গম্ভীর আছে
আশার অতীত যারা সবে,
খোকারে তাহারা এসে
ধরা দিতে চায় হেসে
কত রঙে কত কলরবে॥
* * * * *
খোকার মনের ঠিক মাঝখান ঘেঁসে
যে-পথ গিয়েছে সৃষ্টি শেষে—

সেই পথ বাহিয়া যাত্রা করিলে, আমরা "খোকাদের কল্পলোক মাঝে" উপস্থিত হইব। এই রূপকথার রাজ্যের বাড়ী কোথায় অনেকেই জানে না, কিন্তু শিশুচিত্ত-বিহারী কবি জানেন।

"ছাদের পাশে তুলসীগাছের টব আছে যেইখানে।" সেখানে সাতমহলা কোঠায় তেপান্তরের পরপারবর্তিনী রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে ঘুমাইতে থাকেন। জীবনস্মৃতি-পাঠে জানিতে পারি শৈশবে বাড়ির ছাদের নিভৃত স্থানটি কবির নিকটে বিরাট্ রহস্যপূর্ণ ছিল।

এইতো দেখিলাম ছাদের কোণে সেই রূপকথার অপরূপ রাজ্য। এ বার দেখা যাক সে রাজ্য আর কোথাও আছে কিনা? দূরে? সে রাজ্য দূরেও বটে, দূরেই বেশী। কেন না অপরূপ সে দেশ, এমন কিছু প্রত্যক্ষের সঙ্গে যাহার বেশী মিল নাই, কাজেই অপ্রত্যক্ষে তাহার বাসা।

সেই জন্য কবি এই দেশের ছবি বারংবার দূরত্বের রসে ভিজাইয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। আরও কারণ আছে তাহা আত্মস্মৃতিমূলক। কবি, শৈশবে ঈশ্বর চাকরের অঙ্কিত গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেন। সেই গণ্ডীর বাহিরেও বৃহত্তর গণ্ডী ছিল দক্ষিণের বারান্দাটা, বড় জোর ছাদ খানা। কল্পনাপ্রবণ শিশু দূরত্বের স্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভাবনায় তাহার অভাব পূরণ করিয়া লইত। এইরূপে দূরত্বের প্রতি, অনির্দ্দেশ্য রহস্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ কবি-জীবনের মূল সুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশু-বিষয়ী এই কবিতাগুলিতে তাহারই আভাস। নিজ শৈশবের দূরত্বের দিগন্তশায়ী রূপকথার রাজ্য স্মরণ করিয়া শিশুর রহস্যলোক কল্পনা করিয়াছেন।

শিশু মধুমাঝির নৌকাখানাকে মুহূর্ত্তে ময়ূরপঙ্খীতে পরিণত করিয়া নূতন রাজার রাজ্যে চলিয়া যাইবে। বেশী দূরে সে রাজ্য নয়, কেবল মাত্র সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে! সময়ও যে খুব বেশী আবশ্যক তাহাও নয়—তাহার মা যখন দুপুর বেলা পুকুর-ঘাটে গা ধুইতে নামিবেন সে তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া তিরপুর্ণির ঘাট ধর-ধর করিয়া লইবে এবং সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া গল্প শুনিবার জন্য আব্দার করিতে ভুলিবে না। সে মায়ের দুঃখ বোঝে কিন্তু বাণিজ্য করিতে না গিয়াও উপায় নাই। কাজেই ফিরিয়া আসিয়া যে সব আশ্চর্য্য দ্রব্যসম্ভারের লোভ মাকে দেখাইতেছে—তাহাতে মাতার মনও লুব্ধ হইয়া ওঠে এবং খোকা ভাবী বাণিজ্যের লাভের আশায় উদারতার আতিশয্যে উপহারের তালিকায়—পিতাঠাকুর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও ভুলিয়া যায় নাই।

তাহার পক্ষে যেমন দূর দেশে যাওয়া সহজ তেমনি দূর কালের যে সে লোক হওয়া বিচিত্র নয়। সে ঘাটের মাঝি হইয়া খেয়াপারাপার করা লাভের ব্যবসায় ভাবে এবং রামচন্দ্রের মত বনবাসে যাইতেও নারাজ নহে।

সে বিদ্যুৎ-বিকশিত আষাঢ়-সন্ধ্যায় অন্ধকার ভেদ করিয়া তেপান্তরের পথচারী রাজপুত্রের সঙ্গে ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং গোষ্ঠ-মার্জ্জনারত দুয়োরাণীর দুরবস্থা স্মরণে অশ্রুমোচন করে, আবার কখনো বা

রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি না হয়, আহা!

ভাবিয়া নির্জ্জন মাঠের মধ্যে নিঃসহ অবস্থায় দুর্জ্জয় দস্যুদলকে পরাজিত করিয়া স্নেহমুগ্ধ মাতাকে রক্ষা করিয়া অপূর্ব্ব একটা কাহিনী সৃষ্টি করে।

এতক্ষণ খোকাকে আমরা খোকার কল্পনা-অনুযায়ী দেখিয়াছি। সেখানে সে বীরপুরুষ, সে যেন এ সংসারের নয়, আর এক লোকের অধিবাসী। কিন্তু তাহার আর একটি রূপ আছে, মায়ের চোখের খোকা, মাতৃকোলে যাহার আবাস। এখানে সে নিতান্ত অবুঝ, দুষ্ট, অসহায়, ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। সে রূপলোকের অধিবাসীর মত স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত নয়, মাতৃনির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা স্নেহের প্রধান উপাদান। বড় হইলে পুত্র যে পূর্ব্বের ন্যায় মাতার একান্ত স্নেহের থাকে না, তাহার অর্থ এই যে অনেকটা পরিমাণে স্বয়ংসহায় হইয়া মাতাকে ছোটখাট অনেক স্নেহের অনাবশ্যক কর্ত্তব্য হইতে ছুটি দেয়। এমন অনেক বয়স্ক শিশু আছে, যাহারা স্বাভাবিক অক্ষমতার জন্য এই দৃষ্টি দিতে পারে না, মাতৃস্নেহের উপরে তাহাদের একটা বিশেষ দাবী। শিশুর এই যে অসহায় ভাব, শিশু-জীবনের মূল রহস্যের ইহাও একটি উপাদান। এক দিকে সে

এত অসহায়, এত দুর্ব্বল, আর এক দিকে তাহার এত প্রতাপ কি করিয়া? মাতা পাড়ার শাসন সহ্য করিতে পারে না, কারণ—

শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যে গো।

খোকা খেলিতে গিয়া কাপড় ছেঁড়ে ও কালি-ঝুলি মাখে, কিন্তু ছিন্নমেঘের প্রাতঃসূর্য্য কিংবা মসী-বিলিপ্ত পূর্ণিমাচন্দ্র কি সে জন্য আরও অধিক চারুতা লাভ করে না? খোকা ও তাহার মাতার মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন একটা বোঝাপড়া আছে, কেবল দুইটি বিষয়ে খোকার সংশয়। পিতার চিঠির পরিবর্ত্তে মাতা কেন যে খোকার মোটা মোটা অক্ষরের চিঠি পাইলে তৃপ্ত হন না সে বুঝিতে পারে না। আর বুঝিতে পারে না, পিতা যে ভাল কাগজগুলি মসীলিপ্ত করিয়া ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া তোলেন, সেগুলি দিয়া ছোট ছোট নৌকা তৈরি করিলে মাতা কেন অযথা ব্যস্ত হইয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন।

এ পর্য্যন্ত আমরা শিশুকে শিশুর দৃষ্টিতে, পিতামাতার দৃষ্টিতে, কবির দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে যে দৃষ্টির দ্রষ্টা তাহাতে খণ্ডতা অসম্পূর্ণতা ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া পরম পরিপূর্ণ-ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বিশ্ববোধ বা সর্ব্বানুভূতি তাঁহার কবি-দৃষ্টির বিশেষত্ব। এ পর্য্যন্ত শিশুকে সে ভাবে দেখা হয় নাই। সে বিশেষভাবে পিতামাতার আদরের ধন; তাহার সৌন্দর্য্য, জীবনের রহস্য কবিকে অনুভাবিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য, এই রহস্য, বিশ্বসৌন্দর্য্য ও রহস্যের সহিত কোন গভীর বন্ধনে যুক্ত কি না তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

খোকা নামে কবিতার প্রথম শ্লোকে কবি বলিয়াছেন—খোকার চোখের ঘুম রূপকথার গাঁয়ের পারুল কুঁড়ির সুধাকোষ হইতে আবির্ভূত হয়। ইহাতে আমরা পূর্ব্বকথিত সেই রূপকথার দেশেই রহিয়া গেলাম। দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানিতে পাই শরৎ-প্রভাতের লঘু মেঘস্তরে শিশু শশীর কিরণ-সম্পাতে খোকার হাসিটি জন্মলাভ করিয়াছিল। এখানে আমরা রূপকথার দেশ ছাড়িয়া একেবারে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু আরও অগ্রসর হওয়া

আবশ্যক। তৃতীয় শ্লোক বলিতেছে—খোকার গায়ের কচি কোমলতা কোথায় ছিল জানো—

মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তার পরাণ ছেয়ে
মাধুরী রূপে মুরছি ছিল,

এবারে আমরা বহিঃপ্রকৃতিকেও অতিক্রম করিয়া মানব-প্রকৃতির নিবিড়তর রহস্যের দ্বারে উপনীত। কিন্তু তবু তৃপ্তি কই? বহিঃপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি যে স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। চতুর্থ শ্লোকে ইহার বিধান আছে: খোকাকে ঘিরিয়া যে আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয় তাহা কোথা হইতে আসে!

ফাগুনে নব মলয়শ্বাসে
শ্রাবণে নব নীপের বাসে,
আশিনে নব ধান্য দলে,
আষাঢ়ে নব নীরে

এই ফাল্গুনের দক্ষিণ বায়ু, শ্রাবণের কদম্ব-সুরভি, আশ্বিনের সবুজ ধানের ক্ষেত, এবং আষাঢ়ের নববর্ষার বারি-সমাগম, ইহা কেবল প্রকৃতির তথ্যমাত্র নয়, বহুদিন হইতে মানুষের সব দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত মিলিত হইয়া ইহাদের মধ্যে বহিঃপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটিয়াছে। আশ্বিনের ধান্যদলে প্রত্যক্ষভাবে মানুষের হাতের পরিচয় রহিয়াছে। এতক্ষণে দেখিলাম খোকার মধ্যে বহিঃপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মিলনের তীর্থ। কিন্তু পঞ্চম শ্লোক আমাদিগকে আরো দূরে, একেবারে পূর্ণতায় লইয়া গিয়াছে। এই সদ্যোজাত শিশুটির ভার কে গ্রহণ করিবে?

হিরণময়-কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন দোলা,
তপন শশী তারার কোলে
দেবেন এরে রাখি।

এখানে আমরা বহিঃপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির চরম আশ্রয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এ প্রকাণ্ড বিশ্ব শিশু-সন্তানের পালনের জন্য যাঁহার একটি দোলা মাত্র, স্বয়ং তিনিই এই শিশুটির ভার গ্রহণ করিবেন। এই ক্ষুদ্র শিশুটির জীবন উপলক্ষ্য করিয়া কবি মানব, বিশ্ব ও বিশ্বনাথকে আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত করিয়া একদৃষ্টিতে অখণ্ডভাবে

দেখিয়াছেন। আর একটি কবিতা দেখা যাক—খেলা! ইহাতে দেখিব এই ক্ষুদ্র অসহায় শিশুটিকে অবলম্বন করিয়া মাতা ও জগৎ মাতা, ক্ষুদ্র সংসার ও বৃহৎ বিশ্ব কেমন সহজে সমন্বিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম শ্লোকে কবি ক্ষুদ্র শিশুটির নৃত্যের বর্ণনা করিতেছেন। দ্বিতীয়টিতে মাতা দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সহাস্যমুখে তাহা দেখিতেছেন। তৃতীয় শ্লোকে, মাতা ভাবিতেছেন, কি দিয়া ওই ললিত মুঠি দুটি ভরিয়া দেওয়া যায়! আকাশ হইতে পৃথিবীটাকে ছিনাইয়া লইয়া খোকার হাতে তুলিয়া দেওয়া অসম্ভব নয়। চতুর্থ শ্লোকে আমরা সংসারের ক্ষুদ্র আঙ্গিনা অতিক্রম করিয়া বিপুলতার পটভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছি।

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা।

কিন্তু এখানেও কবি থামিতে পারেন নাই; পঞ্চম শ্লোকে বিপুলতর আশ্রয়ে যাত্রা না করিয়া, বিপুলকে ক্ষুদ্র আশ্রয়ে আনিয়া ফেলিয়া ছোট-বড়র ভেদ ঘুচাইয়া দিয়াছেন।

মায়ের প্রাণে তোমার লাগি
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,

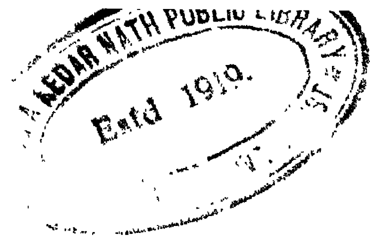
মাতা ও জগৎ-মাতা একত্র থাকিয়া ক্ষুদ্র শিশুটিকে লালন করিয়া তুলিতেছেন।

এই বৃহৎ বিশ্বব্যাপার হইতে আমাদের ঘরের শিশুটি যে স্বতন্ত্র নয়, তাহার সৌন্দর্য্য ও বিশ্বসৌন্দর্য্য যে একসূত্রে গ্রথিত তত্ত্ব হিসাবে ইহা উপলব্ধি করা সহজ নয়; প্রমাণ করা আরো কঠিন। কিন্তু একবার বাৎসল্য-রসে বিগলিত হইতে পারিলে এই দুরূহ দার্শনিক জটিলতা মুহূর্ত্তে অত্যন্ত স্বাভাবিক সত্য বলিয়া মনে হয়। আকাশে এত রঙ কেন, বাতাসে এত গান কেন, রসনায় এত স্বাদের বৈচিত্র্য কেন, হৃদয়েই বা প্রেমের অমৃত কেন—সমস্তই সহজে আয়ত্ত হইয়া যায়—যখনি আমরা শিশুর হাতে রঙিন খেলনা দিই, কিংবা তাহাকে গান গাহিয়া যখনি নাচাইতে থাকি। ইহা কিরূপে সম্ভব! নিঃসন্দেহ এই শিশুটির সহিত বিশ্বলোকের যোগ আছে নতুবা

এক স্থানের আন্দোলনে অন্যত্র সাড়া পাওয়া যাইত না। ইহা শুধু কবির দৃষ্টি নহে, কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি। সেই তত্ত্বরসিক দৃষ্টির জাদুকাঠির স্পর্শে ঘরের কোণের শিশুটি বিশ্বলোকের সগোত্র হইয়া উঠিয়াছে; মায়ের কোলের শিশুটি জগৎ মাতার কোলের হইয়া উঠিয়াছে। শিশুকাব্যের অনুপ্রেরণার মূলে পিতৃ-হৃদয়ের সরসতা, ইহার পরিণামে কবিদৃষ্টির পূর্ব্ববর্ণিত সরসতা।

এই প্রসঙ্গ উপসংহার করিবার পূর্ব্বে নদী কবিতাটি লইয়া একটু আলোচনা করিব। ইহা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম। শিশুকাব্যের প্রধানতঃ যে ভাগের আমরা আলোচনা করিলাম, কবিতাটি তাহার শেষে স্থাপিত হইয়া যেন কাব্যের সমস্ত তত্ত্বটিকে আপনার মধ্যে সংহত করিয়া রূপবান্ করিয়া তুলিয়াছে। ইহা একটি নদীর আদ্যন্ত ভ্রমণ-কাহিনী। এই যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত সুদীর্ঘ কবিতাটি স্বচ্ছ সরল প্রবাহের দ্বারা যেন নদীর স্রোতের অনুকরণ করিয়াছে, এবং ইহার অবিরাম গতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ধর্ম্ম-চলতা চমৎকার ধরা পড়িয়াছে। এই কবিতাটি যে সাধারণতঃ রসিকের চোখ এড়াইয়া যায়, তাহার কারণ ইহা শিশু নামক কাব্য-গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে অবিমিশ্র বর্ণনা ব্যতীত কবির মন্তব্য কিছু না থাকাতে পাঠকেরও কিছু চিন্তনীয় থাকিতে পারে, এ সন্দেহ অধিকাংশ লোকের হয় না। কিন্তু ইহার চিরন্তন চলতায় রস-জগতে যে গতিবেগ জাগাইয়া তোলে, ইহার সুদীর্ঘ যাত্রা-পথের বাঁকে বাঁকে যে অভাবনীয়—অভিনব দৃশ্য-সম্পদে চিত্তলোকে যে বিচিত্র চিত্ররস সঞ্চারিত করিয়া দেয় এবং ইহার প্রচণ্ড প্রবাহ যে অনিবার্য্য বলে সমস্ত কল্পনাবৃত্তিকে পরম পরিণতির এক মহাসমুদ্রের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তাহা শ্রেষ্ঠ কবির লেখনীর যোগ্য।

এই কবিতাটিকে তিন ভাবে আলোচনা করা চলে। একটি নদীর বর্ণনা। শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানবজীবনের ভ্রমণ-কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম্মের প্রতীক। এই তিন ভাবে না দেখিলে কবিতাটির সম্যক্ রস উপভোগ করা যাইবে না; এবং ইহা না দেখার ফলে এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাটি শিশু-সমাজে একঘরে হইয়া চয়নিকা জাতীয় গ্রন্থে এতদিন অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া আছে।



খেয়া

খেয়া কাব্যখানি কবির পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে প্রকাশিত। ইহাকে যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে নৈবেদ্যের অনুক্রমণিকা হিসাবে দেখা উচিত। আমরা নৈবেদ্যের প্রসঙ্গে দেখিয়াছি উহা আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে কবির মানসভ্রমণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। খেয়াতে কবি অতীত ভারতবর্ষ হইতে বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালাদেশে, এবং বাঙ্গালাদেশের একটি বিশেষ আন্দোলনের জনতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। খেয়ার সমকালীন গদ্যসাহিত্যে এই কর্ম্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস। কিন্তু খেয়ার কবিতায়, গদ্যের সে উৎসাহ উদ্দীপনা তো নাই-ই—বরঞ্চ একটি বিরাম ও বিদায়ের সুর। সমকালীন গদ্যে পদ্যে এত প্রভেদ—আশ্চর্য্যের বটে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, বরঞ্চ সমস্তই স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতের অবশ্যম্ভাবী সূত্র-হিসাবে কবি বর্ত্তমান ভারতের জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন; সেই দেশ ও কালে ভ্রমণের সময় তিনি এমন কতকগুলি আদর্শ লাভ করিয়াছেন যে, মাপকাঠিতে তিনি বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মচেষ্টাগুলিকে সর্ব্বদাই যাচাই করিয়া লইতে ব্যস্ত। সেই আদর্শের তুলনায় বর্ত্তমান জীবনের সমস্ত চেষ্টা বারংবার ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে লাগিল,—এবং অবশেষে অত্যন্ত নৈরাশ্যের সহিত কবি আবিষ্কার করিলেন, শুধু কর্ম্মজীবন নহে, সমগ্র জীবনটা যে ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা-ই এই আদর্শের তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ। এই ক্ষুদ্রতা এই পরম ভাবদৈন্য কবিকে আঘাত করিতে লাগিল; এবং অবশেষে তাঁহার কবি-ধর্ম্ম নিরাদর্শ কর্ম্মজীবনের দীনতা হইতে ভাবভিত্তি নবতর কর্ম্মজীবনের মধ্যে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ করিবার ইহাই সংক্ষিপ্ত মানসিক ইতিহাস। খেয়াতে এই বিদায়ের সুরই একমাত্র উপজীব্য নহে, নবতর জীবনের আভাসও তাহাতে আছে। সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকার আমাদের চক্ষুর সমস্ত দৃষ্টি ম্লান করিয়া দিয়া বিশ্বছবি মুছিয়া দেয়; কিন্তু কিছু পরেই আবার সেই অন্ধকারের বুকের মধ্যেই নবতর ও বৃহত্তর বিশ্বছবি উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। খেয়ার ভাব-উপজীব্যও অনেকটা এই রকমের। আমরা অত্যন্ত মৃত্যুপ্রবণ জাতি। এই নদী-মাতৃক দেশের নদীগুলি, খেয়ার নৌকা, পারাপারের ঘাট, পরপারের ধূসর-তটরেখা, মাঝি, সন্ধ্যা সমস্তই আমাদের কাছে মৃত্যুর প্রতীক। কাজেই খেয়া নামধেয় একখানি কাব্য যে

মৃত্যুর সহিত আদর্শসূত্রে জড়িত হইবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি। বাংলা দেশের সাধারণ পাঠক-সম্প্রদায় কাব্যখানিকে মৃত্যুর সহিত সংবদ্ধ করিয়া লইয়া কবিকে ভুল বুঝিবার পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য দলচ্যুত করিয়া লইয়া যে কোন একটি কবিতাকে যে কোন একটি বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করা চলে—কারণ কবিতা 'সর্ব্বনাম'। কিন্তু একটি কবিতাকে তাহার অভিব্যক্তি পর্য্যায়ে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেখাই তাহাকে যথার্থভাবে দেখা। এইভাবে দেখিলে খেয়া মৃত্যুর কাব্য নহে; জীবনের কাব্য—নবতর জীবনের এবং নবতর কর্ম্মপ্রবাহের।

প্রথম কবিতাটিতে দেখি পরিপূর্ণ বিদায় ও অবসাদের সুর। দিনের শেষে ঘুমের দেশের ঘোমটাপরা ছায়া তাঁহার মন ভুলাইয়াছে, এবং ওপারের কাজ-ভাঙানো সুর কবির কাণে প্রবেশ করিতেছে। কবির ঘরের আরাম গিয়াছে এবং ওপারের আশ্রয়ও মিলে নাই, এম্‌নিতরো অসহায় অবস্থা। তবু ইহাতে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে: যদিও সন্ধ্যা আসন্ন এবং কবি একান্ত অবসাদগ্রস্ত, কিন্তু অন্ধকারের পরপারের অস্তাচলের তীরের কাছে—পরপারের রেখাটি অস্পষ্টভাবে কবির চোখে পড়িতেছে। এই তীর রেখাটি কি? জীবনের পরপার? মৃত্যু? নূতন জীবনের তটভূমি? কবির নিকটেও তাহা স্পষ্ট নহে, পাঠকে কেমন করিয়া বুঝিবে। কিন্তু কাব্যখানির মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিলেই বুঝিতে পারিব, কবিও বুঝিতে পারিয়াছেন, ওই তীর-রেখা জীবনের পরপারের নহে; মৃত্যু নহে, নবতর জীবনের ক্ষীণ যবনিকামাত্র। ওই অস্পষ্ট পরপারকে অনেকে গীতাঞ্জলির অভিজ্ঞতার তটভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা যথাস্থানে দেখাইব উহা অতিদূর বলাকাপর্ব্বের উপকূল। এই দুই তীর-রেখার মধ্যে গীতাঞ্জলি পর্ব্বটা আধ্যাত্মিক গোধূলির রহস্য-সুদূর একটি দ্বীপ-খণ্ডমাত্র। কবির জীবনের সহিত তাহা দৃঢ় সংবদ্ধ বটে, কিন্তু এপার ওপারের কাব্য হইতে সেটা খানিকটা স্বতন্ত্র। প্রথম কবিতাটিতে কবির মুখ ভবিষ্যতের, দ্বিতীয়টিতে অতীতের দিকে। সংসারে কাজের জন্য যেটুকু জল প্রয়োজন, সেটুকু তাঁহার কলসীতে পূর্ণ হইয়াছে।

আমার চুকেছে দিবসের কাজ
শেষ হয়ে গেছে জল ভরা আজ

এখন—

দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।

যাহাদের এখনো সে কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই, তাহারা—

চলেছে দীঘির ধারে

বনের ছায়ায় তাহাদের কঙ্কণের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহার কৃত-কর্ত্তব্য এই সন্ধ্যাটি কেমন করিয়া কাটিবে? তিনি অতীত জীবনের কাহিনীটা আলোচনা করিয়া কালহরণ করিতে চাহিতেছেন, যে জীবনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ চুকিয়া গিয়াছে, অথচ স্মৃতি চুকিয়া যায় নাই, সেই জীবনের প্রতি টান অত্যন্ত করুণ-ভাবে ইহাতে বাজিয়া উঠিতেছে! খেয়ার প্রারম্ভে দেখি কবি অন্ধকার রাত্রির বিরাট্ একখানা যবনিকার সম্মুখে দণ্ডায়মান, ক্রমে সেই অন্ধকারের পটভূমিতে জ্যোতির্লোক প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে এক সময়ে সেই তমোযবনিকা সম্পূর্ণ অপসারিত হইয়া নূতন জীবনালোক প্রকাশ হইয়া পড়িল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে ইহাই খেয়ার মর্ম্ম। রাত্রির এই অন্ধকার যে এমনভাবে নূতন জীবনের দ্যোতনায় অবশ্যম্ভাবী, ইহা প্রথম কবিতা দুইটিতে স্পষ্ট ভাবে কথিত না হইলেও অন্যত্র হইয়াছে।

"হে বিরামবিভাবরীর ঈশ্বরি মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রৎ, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্র-দীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। ঐ দেখিতেছি, তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতি রূপে একত্র সমবেত হইয়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোট ছোট চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকৃত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল বৃহৎ রূপে দেখা দেয়। ইহা দেখিয়া এ রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যের আস্ফালন, আমার ক্ষুদ্র দুঃখের আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত আবৃত করিলাম, তুমি আমাকে গ্রহণ কর, রক্ষা কর।" [দিন ও রাত্রি; ধর্ম্ম; ১৮-১৯]

সংসারে সমস্ত সত্যের কষ্টিপাথর মৃত্যু ও রাত্রির কালো পাথর দুইখানা। মৃত্যুর পরে যাহা টিকিয়া থাকে তাহাই সত্য। দিনের বেলায় ছোট বড় সমস্তর একদর; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারটায় যা চোখে পড়ে তাহাই সত্য। কবি নিজের জীবনকে, নিজের কর্ম্মপদ্ধতিকে, দেশের আন্দোলনকে এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতেই অনেক তুচ্ছতা, দীনতা ধরা পড়িল; এবং সমস্ত প্রচেষ্টার ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়া দেশের একটা অংশের নিকট বিদায় লইলেন। খেয়ায় অনেকগুলি কবিতা এই

বিদায়ের প্রার্থনা। 'নিরুদ্যম' কবিতাটিতে এই অবসাদ ও বিদায়ের সুর আরো স্পষ্ট। কবি বলিতেছেন,—

আমি জলের ধারে শুলেম এসে
শ্যামল তৃণাসনে।

আর তাঁহার দলের সকলে—

আমার দলের সবাই আমার পাশে
চেয়ে গেল হেসে।

সেই সব যাত্রীদের তিনি ধন্য মনে করেন, কিন্তু সে দলে যোগ দিতে নারাজ। তাঁহার আদিম কবি-ধর্ম্ম জাগ্রৎ হইয়া সহজ সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যে কবি-চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পথের ধারে যখন তাঁহার ঘুম ভাঙিল,

চেয়ে দেখি, কখন্ এসে
দাড়িয়ে আছ শিয়র দেশে

যে নবজীবনের সত্যের কথা বলিতেছিলাম, তাহার আভাস এই কবিতাটিতে আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

অনেকদূর পর্য্যন্ত তিনি কাজের লোকের সঙ্গে কাজের লোক হইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কবিধর্ম্ম জাগিয়া উঠিতেই—রত্ন-খোঁজা, রাজ্য-ভাঙা গড়া, মতের লাগি দেশ-বিদেশে লড়া, সমস্ত মিথ্যা হইয়া গেল।

আজ তিনি 'অনেক' ও 'অকস্মাতের' আশা ত্যাগ করিয়াছেন, এবং 'একটি' ও 'সহজের' আশায় আছেন। যে নবীন জীবন বা সত্যের কথা বলিতেছিলাম, এই দুইটি শব্দের সহিত তাহা অচ্ছেদ্য, কিংবা এই দুইটি শব্দকে তাহার বিশেষণ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

দীঘি কবিতাটি একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সোনার তরীতে একটি ভাবকে রূপ দেওয়া হইয়াছে; কতক অন্তরের, কতক বাহিরের, তাহা হৃদয়-যমুনা। এখানে একটি বস্তু ভাবরূপে পরিণত। ইহা রাত্রি ও মৃত্যুর সোদর। কবি যেমন রাত্রির অন্ধকারে, মৃত্যুর রহস্যে নিজেকে পরিষিক্ত করিয়া লইয়াছেন, তেমনি দিনের কাজের অবসানে এই দীঘির 'মরণ-ভরা বুকের' আলিঙ্গনে নিজেকে স্নাত করিয়া লইতে চাহেন। সন্ধ্যাবেলায় স্বভাবতঃই দিনের কাজের সার্থকতা-সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কবির অন্তর্লোকেও যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, তাহাতে এমন একটা

প্রশ্ন অস্বাভাবিক নয়। তাই বেলা অবসানের সঙ্গে কবির চিত্তেও সংশয় জাগিয়া উঠিল। স্পষ্টভাবে কোন মীমাংসা তাঁহার মনে নাই কিন্তু—

মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবি মাঠের মধ্যে গিয়ে
সারাদিনের অকাজে আজ
কেউ কি মোরে দেয়নি ধরা?
আমার কি মন শূন্য, যখন
হ'ল বধুর কলস-ভরা?

অর্দ্ধচেতনভাবে একটা সান্ত্বনা, আশার মত কবির মনে আছে। এই সন্দেহের উত্তর, এই সংশয়ের সান্ত্বনা, এই অর্দ্ধ আশার সাফল্য পরবর্ত্তী কবিতা-পর্য্যায়ে আছে। এই কাব্যের শেষ কবিতাটি আবার খেয়া। হাট-ভাঙা যাত্রীরা দলে দলে ওপারে যাইতেছে, এই আনাগোনার টানে কবির চিত্তও উন্মুখ। খেয়ার নেয়ে নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে; কবি—

কী যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি যে তাই চেয়ে।

এই ইঙ্গিতটি আশা করিয়া পরপারের জন্য প্রস্তুত। বর্ত্তমান পর্য্যায়ের অধিকাংশ কবিতা সন্ধ্যালোকের। ক্রমে দেখিতে পাইব রাত্রি গভীরতর হইতেই এই সংশয় কাটিয়া গিয়া, নূতনতর ও আশ্চর্য্যতর সৃষ্টির ভূমিকা কবির চিত্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; এবং আরও পরে বহু প্রত্যাশিত অরুণালোক উদ্ঘাটিত হইল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অধিকাংশ কবিতা গভীর রাত্রির বেদনায় ভারাক্রান্ত।

৩

জগতে দুঃখ আছে ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায় কই! তবে উপায় কি? দুঃখকে আনন্দের ভাষাতে অনুবাদ করাতেই মানুষের মুক্তি। খেয়ার এই পর্য্যায়ের কবিতাগুলি জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতার মর্ম্মকোষ হইতে আনন্দের উজ্জ্বল রেশম-সূত্রের মত বাহির হইয়াছে। কবি নির্ভীকভাবে, রূঢ়-বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়া ধীরভাবে আত্মজ তত্ত্ব দৃষ্টির দ্বারা দুঃখের তথ্যকে কাব্যের সত্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমসাময়িক রচনায় এই ভাবান্তর টিধরা দিয়াছে।

"মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্ব্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব।" [দুঃখ ; ধর্ম্ম ; ১০৩]

না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? দুঃখই জগতের মানদণ্ড, সকল পদার্থের মূল্য দুঃখের মুদ্রাতেই দেয়। এই দুঃখ কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত জীবনে বিশ্বকর্ম্মার মত গঠনকার্য্যে লাগিয়া আছে; দুঃখ শিল্পী, আনন্দ শিল্প-সৃষ্টি। কিন্তু সে আবার কি কথা—দুঃখের সহিত আনন্দকে কি রকমে যোগ করিয়া দেওয়া চলে।

"জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্য সহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতং।" [দুঃখ ; ধর্ম্ম ; ৯৯]

বর্ত্তমান পর্য্যায়ের অনেকগুলি কবিতাতেই এই সুর; আশঙ্কার মধ্যে আশা, ভীষণতার মধ্যে মাধুর্য্য, রুদ্রের মধ্যে প্রসন্ন, দুঃখের মধ্যে আনন্দ আবিষ্করণের চেষ্টা—সংক্ষেপে দুঃখকে আনন্দের ভাষায় অনুবাদের একান্ত প্রয়াস।

'আগমন' কবিতাটিতে এই দুঃখের দেবতার অকস্মাৎ আগমনের আভাস। যেমন দুঃখের রাজা তেমনি তাঁহার আগমনের কাল নিশীথ এবং দুর্য্যোগ—তেমনি তাঁহার অপ্রস্তুত অভ্যর্থনার অভিনন্দন। কবির গদ্যসাহিত্যে এই ভাবটি রুদ্র-সরলতায় প্রকাশ পাইয়াছে।

"হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্দ্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্র-গর্জ্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মত কাঁপিয়া উঠে, তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি, হে দুঃখের ধন তোমাকে চাহি না, এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি; সে দিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রৎ হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।" [দুঃখ ; ধর্ম্ম ; ১০১]

এই ভাবটিই কাব্যে—

দুখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে ধরিব হে।

এই দুঃখের দেবতার কাছে কোন ক্ষুদ্র আরাম চাহিয়া লাভ নাই; আমরা ভাবি তাঁহার কণ্ঠের সান্ধ্য কুসুমের মালাটি চাহিয়া লইব, কিন্তু সাহস হয় না, প্রভাতে লুব্ধের মত শয্যা প্রান্তে মালার আশায় গিয়া দেখি

এতো মালা নয় গো, এ সে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন
বজ্র হেন ভারি—

ইহাকে গ্রহণ করা কঠিন, ত্যাগ করা কঠিনতর, কাজেই গ্রহণ করিতে হয়। এই তরবারি-গ্রহণের প্রথম অংশটা দুঃখে ভয়ঙ্কর কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে জীবনের নানা জাল খণ্ডিত হইয়া জীবনের পথ অপ্রত্যাশিত ভাবে সরল হইয়া পড়ে। এই সরলতার ভাবটি মনে রাখিতে হইবে, পরবর্ত্তী সব কবিতায়—কবির জীবন এই সরলতার অভিসারে চরম তীর্থযাত্রী শ্রাবণ-রাত্রির দারুণ দুর্য্যোগের চিহ্নমাত্র যেমন প্রভাত কালে থাকে না, এ সরলতা সেই রকম। [দ্রষ্টব্য—প্রভাতে]

প্রথমতঃ এই দুঃখের দেবতার জন্য আসন প্রস্তুত রাখি না, তারপরে আমাদের রিক্ত অভ্যর্থনার মধ্যেও কত ত্রুটি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি আমাদের উপর বিরক্ত হন না—সস্নেহ সহিষ্ণুতায় ভ্রম-প্রমাদসহ আমাদিগকে গ্রহণ করেন। এই দ্বৈধ সম্বন্ধটি কবি নূতন বর ও বধূর সম্পর্কের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। বালিকা বধূর নিকট নব-বিবাহিত স্বামী সম্ভ্রমের; এই অপরিচিত যুবকটিকে সে রহস্যবিস্ময়পূর্ণ দূরত্বে রাখিয়া ভয়ে ভয়ে চলে, তাই বলিয়া বর কি তাহার উপরে বিরক্ত হইতে পারে! সে ধীরে ধীরে সহিষ্ণুতায় ও আদরে, স্নেহে ও ক্ষমায় তাহার মন জয় করিয়া লইতে থাকে। কিন্তু বিপদের দিনে উভয়ের মধ্যে সে দূরত্ব, সে ভেদ আর থাকে না, পরস্পর বাহুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া ক্রম-বিলীয়মান দূরত্বকে এক মুহূর্ত্তে দূর করিয়া পরম পরিচিত হইয়া উঠে। সেই দুঃখের পরিচয়েই বুঝিতে পারা যায়—

রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জ্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন মধু—

জগতের তীব্র তড়িৎ-হাসির অট্টরবে রূপকথার রাজ্যের স্বপ্নে মুগ্ধ নববধূ জীবনের বাস্তবতার মধ্যে জাগিয়া উঠে।

এই দেবতার পরিচয়টিকে নানা ভাবে, নানা স্বাদে, নানা অবস্থায় কবি যাচাই করিয়া লইয়াছেন। ঝড়ের মৃদঙ্গে তাঁহার রথধ্বনি, ভাঙা অতিথ্‌শালায় তাঁহার-ই স্মৃতি, স্তিমিতজোয়ার অর্দ্ধরাত্রে তাঁহারই প্রতীক্ষা, এবং খণ্ড চাঁদের ক্ষীণ আলোর আভাসে তেপান্তরের পার হইতে তাঁহারই অশ্বক্ষুরের প্রতিধ্বনি। এই মনোভাব কবির পক্ষে এতই সহজ হইয়া গিয়াছে, ইহা কবির মন ছাপাইয়া চারিদিকের প্রকৃতির মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছে। আমলকী কদম্বের বন আসন্ন বর্ষার কৃষ্ণমেঘের আভাসে উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে; অতল দীঘি কাল-বৈশাখীর দূরাগত নিঃশ্বাসের তালে তালে তরঙ্গে তরঙ্গে রোমাঞ্চিত হইতেছে আর স্বয়ং কবির সমস্ত অস্তিত্ব ভাবিয়া পায় না—

জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া
কে আসিছে কালো মেঘে?

জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষীণতা হইতে পূর্ণতার দিকে যাত্রাকে কবি নদী বাহিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ার মত বলিয়াছেন; বৃহৎ সমুদ্র এখানে দুঃখ দেবতার প্রতীক; উভয়েই বৃহৎ, বিচিত্র, অজ্ঞাত এবং রহস্যপূর্ণ।

৪

গভীর রাত্রি ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে—নিজের অজ্ঞাতসারে আলোর সিংহদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। রাত্রিতে যাহা ভীষণ, জটিল ও রহস্যময় মনে হইতেছিল, প্রাতঃসূর্য্যালোকে তাহা মুহূর্ত্তে পরম পরিচিত ও সহজ বলিয়া ধরা পড়িল। নৈসর্গিক জগতের এই সত্য মানসিক জগতে প্রতিভাত হইল। সহজ বিশ্বের মধ্যে কবির চিত্ত মুক্তিলাভ করিল; রাত্রি তাহার সমস্ত জটিল অন্ধকারকে অকস্মাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া

দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

প্রভাতের এই বিকাশ ফুলের ফোটার মতই সহজ, তেমনি সহজে তার সুধাকোষের সুগন্ধ সে ছড়াইয়া দিল। অন্তর্জগতেও ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলিবার চেষ্টা

অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক পানে তুলে দে।

আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠরে ফুটে,
চোখের পরে আলসভরে
রাখিসনে আর আঁচল টানি।

চোখের উপরকার এই আঁচলখানা সরিয়া যাইতেই প্রাতঃসূর্য্যের অরুণালোক হৃদয়ে জ্যোতির টীকা আঁকিয়া দিল। প্রভাতের অকস্মাৎ অভিজ্ঞতার এই নবলব্ধ সত্য সন্ধ্যার পানে বহিয়া লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা করিব। কিন্তু যত সহজে ইহা বলা চলিল, তত সহজে ইহা বহন করিবার নয়,—কারণ



তোমার বীণার সাথে আমি
সুর দিয়ে যে যাব
তারে তারে খুঁজে বেড়াই
সে-সুর কোথায় পাব।

যেমন সহজ ভোরের-জাগা, স্রোতের আনাগোনা, পাতার শিশির, তেমন আপনি-ফোটা অর্ঘ-ছোটা সুর সাধনার দ্বারা লাভ করা বড়ই কঠিন। নিজের বীণার সুর চারিদিকের সঙ্গীতের সঙ্গে মেলে না,

জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে,

বস্তুতঃ এই সহজের সাধনাই খেয়া কাব্যের উপজীব্য : এই সহজ রসের স্বাভাবিক পরিণাম "সব পেয়েছির দেশের" দিকে। বিধাতার কাজে ও নিজের কাজের মধ্যে আমরা ভুল করিয়া বসি, অবশেষে নিজের কাজের জালে জড়িত হইয়া বন্দী হইয়া পড়ি। 'বন্দী' কবিতাটি দেখা যাক। বন্দীর বিরাট্ শক্তি ও বিপুল বল মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে; কিন্তু তবুও সে কৃপার পাত্র। কারণ শক্তি ও ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও সে যথার্থ লক্ষ্যকে ধরিতে পারে নাই; বিধাতার ইচ্ছার সহিত তাহার ইচ্ছাকে সঙ্গত করিয়া লয় নাই; অন্ধ প্রবৃত্তির পরিণাম তাহাকে বদ্ধ করিয়াছে।

শৃঙ্খলখানা আমাদের নিজের, শৃঙ্খলিত করিবার কর্ত্তা স্বয়ং বিধাতা। আপনার ইচ্ছার সত্য পরিণাম না জানায়, তাহার বল, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য কিছুই তাহাকে বাঁচাইতে পারে নাই। একটা উদাহরণ লওয়া যাক—

"য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্ব লাভের ইচ্ছাকে, সার্থকতা লাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে—এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে

প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপ কেবলি মাটি চাহিতেছে—সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে—এমন লোলুপভাবে এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ—পথ নহে ইহাই মৃত্যু।" [প্রার্থনা ; ধর্ম্ম ; ৬১]

কেন এমন হইল না—

"আমাদের ছোট বড় সকল ইচ্ছাকেই—মানবের এই বড় ইচ্ছা, এই মর্ম্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে কোন ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে খর্ব্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।" [প্রার্থনা ; ধর্ম্ম ; ৬০]

য়ুরোপ ইহা করিতে অবহেলা করিয়াছে, তাহার বল বীর্য্য ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও সে নিজের গড়া শৃঙ্খলে বন্দী।

এই শৃঙ্খল নিজেকে কেবল বদ্ধ করে তাহা নয়, বন্দীর হাত যেখানে পড়ে, যাহার উপরে পড়ে, সে সব মুষড়িয়া যায়। প্রাণের মন্ত্র সে পায় নাই, মারণ মন্ত্র মাত্র শিখিয়াছে, এই মন্ত্র প্রাণহরণ করে, আহরণ করিতে জানে না। জগতে যেখানে সহজের বিকাশ, সেখানে এই লোভী নিতান্ত অকৃতার্থ।

তোরা কেউ পারবিনে গো
পারবিনে ফুল ফোটাতে।
* * * *
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত করিস্ বোঁটাতে
* * * *
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।

কেন না যে সহজের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেই সহজ রসিক জগতের সঙ্গে একতাল। কিন্তু এই অসন্তোষের কারণ বোধ হয় সৃষ্টির রহস্যের মধ্যেও আছে। এই অসন্তোষের মূলে মানুষের ইচ্ছা ; কিন্তু ইচ্ছাকে উৎপাটিত করিয়া ফেলা চলে না, তবে উপায় কি ?

"ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্বইচ্ছার সহিত একসুরে বাঁধাই আমাদের সকল শিক্ষার চরম লক্ষ্য।" [ততঃ কিম্; ধর্ম্ম; ১৪৪]

জীবনে ইহা সাধনার বিষয়; সে সাধনা সহজসাধ্য নহে—তবুও ইহাই জীবনের লক্ষ্য।

৫

খণ্ড ইচ্ছাকে পরম ইচ্ছার পথে চালিত করাই সাধনা, তাহার পরিণাম-ই সন্তোষ। ইহাই শান্তি, ইহাই মুক্তি, ইহাই কবির 'সব পেয়েছির দেশ।' ইহার কোনটাই নেতিবাচক নহে, কারণ সন্তোষ ঐশ্বর্য্য, দারিদ্র্য নহে; সন্তোষ অভাব নহে, অভাবের অভাব। এক কথায় ইহা মানসিক জগতের পরম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, যাহাতে গতি স্থিতি, শক্তি শান্তি, অভাব ঐশ্বর্য্য, শাশ্বতভাবে বিধৃত হইয়া আছে। ইহাই সমগ্র কাব্যখানির পরিণাম। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া কবির চিত্ত অভিযান করিয়াছে। যে-অন্ধকারে সমস্ত বিশ্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কবি সেখানে থাকেন নাই, কারণ তাহা নেতিবাচক একটা জগৎ, আর কবির লক্ষ্য 'সব পেয়েছির দেশ', যেখানে সমস্ত কিছু 'অস্তি'। কবি সন্ধ্যার অন্ধকারে পরপারের যে ক্ষীণ দেশ দেখিয়াছিলেন, প্রাতঃ-সূর্য্যালোকিত সেই দেশে আসিয়া দেখিলেন, তাহা তো ঘোমটা-পরা দেশ নয়, কাজ-ভাঙানো সুরের দেশ নয়, এ আর একটা বিপুলতর, নূতনতর, সরলতর জগৎ, ইহা 'সব পেয়েছির দেশ'।

'সব পেয়েছির দেশ' কবিতাটিতে সহজ-সরলতা ছন্দে ও ভাষায় ধরা দিয়াছে—ইহা যেন বাংলা পল্লীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছড়াগুলির সগোত্র। বর্ত্তমান কাব্যে যে সরল-সহজতার জন্যে কবি চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই আয়াস-সাধ্য লঘুতা অত্যন্ত অনায়াসে অধিগত, অন্ততঃ আয়াসের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি 'সব পেয়েছির দেশ' নেতিবাচকতাপূর্ণ স্থান নয়। কিছু-না থাকার একটি শান্তি আছে, যেমন মৃতদেহে; আবার পরিপূর্ণ উপলব্ধির একটি শক্তি আছে, যেমন সমাহিত যোগি-চিত্তে। 'সব পেয়েছির দেশে' যে শান্তি ও সরলতা তাহা সমাহিত যোগি-চিত্তের, তাহা 'সব ছেড়েছির' নহে—'সব পেয়েছির দেশ'; অথবা সব ছেড়েছি যথার্থভাবে সে-ই বলিতে পারে, যে সব কিছু পাইয়াছে। সব পেয়েছির দেশের এই সরলতা আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া লইতে হয় না; তাহা চারিদিকে বিরাজমান, কেবল মনকে শান্ত সংযত করিলেই এই অনাবিল শাশ্বত শান্ত রাজ্যের সঙ্গীত কাণে প্রবেশ করে।

"যাহা অন্তরে বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতেই পরামর্শ দেয়, কারণ তাহাই সত্য—তাহাই

নিত্য। * * আমরা যে অমৃতলোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের প্রার্থনা—চিত্ত-সরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা।" [ধর্ম্মের সরল আদর্শ; ধর্ম্ম ; ৪০]

ভারতবর্ষের চিত্তের সহিত এই সব পেয়েছির দেশের নিবিড় যোগ আছে; অন্য দেশে জীবনটা সংগ্রাম, না আছে তাহার অর্থ, না আছে তাহার অন্ত; ভারতবর্ষে জীবনটা লীলা; লীলার শেষ আছে কাজেই লীলা-সমাধানের পূর্ব্বে তাহাকে পূর্ণতার স্বাদ লাভ করিয়া বিদায় লইতে হয়। সব পেয়েছির দেশ এই পূর্ণতার স্বাদ; তাহা জীবন-সঙ্গীতের 'সম্'। এই স্বাদ জীবনে অযাচিত অপ্রত্যাশিতভাবে মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু বিপদ্ যে

এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখ্তে না পায় কী আছে এই
সব-পেয়েছির দেশে।

একরাত্রির পান্থরা শুধু যে ইহা দেখিতে পায় না, তাহা নহে, ভুল ভাবে দেখে; এবং সেই ভুল দেখার ইতিহাস সংসারে প্রচার করিয়া এ দেশকে সকলের চোখে বিভীষিকাময় করিয়া তোলে। ভূ-পরিক্রামকগণ যেমন ছাতা-ছড়ি-ব্যাগ হাতে দুই হাজার মাইল দৈর্ঘ্যটাকে উল্কার মত অতিক্রম করিয়া গিয়া আড়াই হাজার পাতা একখানা পুস্তকে ভ্রমণ-কাহিনী লিখিয়া থাকে, 'সব পেয়েছির দেশের' ইতিহাস তেমন ভাবে লিখিবার নয়। সে কাহিনী লিখিতে হইলে—সেখানকার অধিবাসী হইতে হইবে।

ওরে কবি এইখানে তোর
কুটীরখানি তোল্।

বহির্জগতের চাঞ্চল্য মন হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া নিজেকে বলিতে হইবে—

পা ছড়িয়ে বস্‌রে হেথায়
সারা দিনের শেষে
তারায় ভরা আকাশ তলে
সব-পেয়েছির দেশে।

৬

এতক্ষণ আমরা খেয়ার কাব্য-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে তত্ত্ব কিছু ধরা পড়িলেও কাব্য ফাঁকী দিয়া গিয়াছে। এই আলোচনায় অনেকগুলি কবিতা বাদ দিয়াছি তন্মধ্যে কয়েকটি উঁচু দরের কবিতা।

'মেঘ' কবিতাটি দেখুন—ইহাতে কল্পনার লীলা; কল্পনার উচ্চতম বিকাশ যে দিব্য সৃষ্টিশক্তিতে, তাহা ইহাতে নাই। কবি সম্পূর্ণভাবে ইহার মধ্যে আপনাকে দেন নাই। তিনি সলীল মন্থর বাতাসের মত মেঘরাশিকে যদৃচ্ছাক্রমে ওলট পালট ও ইতস্ততঃ করিয়া সাজাইয়াছেন; সন্ধ্যাকাশের বর্ণচ্ছটার মত বহু বর্ণে এবং বহুতর বর্ণের আভাসে তাহাদিগকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং শেষে একটু মৃদু গম্ভীর ধ্বনিতে শাসাইয়া গিয়াছেন—

বজ্রটা তো নিতান্ত নয় তামাসা।

ফল কথা মেঘ এখানে মেঘই রহিয়া গিয়াছে; কবির কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া আপনার মেঘত্বের অপেক্ষা বড় কোনো অস্তিত্ব লাভ করে নাই। এবারে আর একটি কবিতা দেখা যাক; এটি বর্ষা-প্রভাত'-কল্পনার লীলাতেই ইহার সুরু—

ওগো এমন সোনার মায়াখানি
কে যে গড়েছে
মেঘ টুটে আজ প্রভাত-আলো
ফুটে পড়েছে।

মেঘ ও প্রভাতের আলো কবি-চিত্তের স্পর্শ পাইয়াছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু তবু তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে এখনো অতিক্রম করিয়া যায় নাই।

প্রথম শ্লোকটিতে কবি নিজেকে আংশিক ভাবে দিয়াছেন মাত্র। দ্বিতীয় শ্লোকে দেখি প্রভাতের আলো শুধু আলো নয়, তাহা যেন বিদেশিনীর অঞ্জলি হইতে উচ্ছ্বসিত স্বর্ণ-মুষ্টি। সে স্বর্ণমুষ্টিতে শুধু তাঁহার ঐশ্বর্য্য নয়—সহৃদয়তা আছে; সে তাঁহার দান। কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নয়। সোণার অপেক্ষা মূল্যবান্ কিছু হওয়া চাই। তৃতীয় শ্লোকে প্রাতঃ সূর্য্যালোক আলোও নয়, সোণাও নয়, একেবারে পারিজাত পুষ্প বনের মধুচক্রের মধু। সে মধু মানুষের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া অজস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু মন তো ইহাতেও তৃপ্তি মানে না। প্রভাতের আলো ধাপে ধাপে সুন্দর হইতে সুন্দরতর, নিবিড়তর রহস্যময় হইয়া উঠিল, কিন্তু সেই

সৌন্দর্য্যের অধিশ্বরীকে না জানিলে সার্থকতা নাই। চতুর্থ শ্লোকে তাই লক্ষ্মী আসন পাতিবেন শুনিয়া—

দিগ্‌বিদিকে টুটে
আলোর পদ্ম উঠ্‌ল ফুটে,

তিনটি শ্লোকে প্রভাতের আলোককে কবি যে পরম সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন, চতুর্থ শ্লোকে তাহার উপরে লক্ষ্মীকে স্থাপন করিয়া তাঁহার কোনো বর্ণনা না করিয়াও তাহার কি অবর্ণনীয় মূর্ত্তি বিকশিত করিয়া দিলেন। পঞ্চম শ্লোকে আরো বিস্ময় ছিল। লক্ষ্মী তো এখনো আলোর শতদলে উপবেশন করেন নাই, তবে কি কোনো অনৈসর্গিক মূর্ত্তির আভাস না দেখিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে!

ওকি সুর-পুরীর পর্দ্দা খানি
নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা-মূলে?

বর্ষাধৌত প্রাতঃসূর্য্যোদ্ভাসিত নীলাম্বরের কমনীয় আভা হইতে এ কোথায় আসিয়া পড়িলাম! অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বয়ং ইন্দ্রাণীর দিব্য মূর্ত্তি দেখিয়া ফেলিলাম। এ যে কল্পনার সৃষ্টি! কল্পনার লীলায় আরম্ভ করিয়া ধাপে ধাপে এ সৃষ্টির স্বর্গে কবি উঠিলেন কেমন করিয়া! কবি সম্পূর্ণভাবে এখানে আপনাকে দিয়াছেন। সেই প্রাতঃ-সূর্য্যালোকিত মুহূর্ত্তের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আপন হৃদয় হইতে নিঃশেষে তাহাকে নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া শেষ শ্লোকটিতে তাহাকে রূপ দিয়াছেন। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্য্যের তারতম্যে কাব্য ভালো ও মন্দ হয়। আর দুইটি কবিতা আলোচনা করা যাক। অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য্য ও বৈচিত্র্য অধিকতর ভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে, এ দুইটি আগের দুইটির অপেক্ষা কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ। 'শুভক্ষণ' ও 'অনাবশ্যক'। 'মেঘ' ও 'বর্ষাপ্রভাতে' কবি অভিজ্ঞতাকে প্রকৃতির মধ্যে রূপবান্‌ করিয়া তুলিয়াছেন; কিন্তু এখানে সমগ্র অভিজ্ঞতা মানব-প্রকৃতির মধ্যে সুসংহত হইয়া বেদনায় ও রহস্যে টন্‌ টন্‌ করিতেছে। 'মেঘ' আমাদের খেয়াল রসকে ও 'বর্ষা-প্রভাত' আমাদের কল্পনাকে আঘাত করে; কিন্তু রাজার দুলালের রথচক্রে সংসারানভিজ্ঞা যে কিশোরীর বক্ষের দানটি ও সেই সঙ্গে মুগ্ধ হৃদয়ের সমস্ত আশা ভরসা নিষ্পেষিত হইয়া গেল,—আর যে হতভাগোর চক্ষে কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে অকারণ দীপোৎসবে নিজ গৃহের নির্জ্জন অন্ধকার দীপ্যমান হইয়া উঠিল, তাহাদের করুণ চিত্র আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে

কম্পিত করিয়া তোলে। এ কেমন করিয়া হইল! কবি-হৃদয়ের অনুপ্রেরণার আদিম মুহূর্তের কম্পন প্রথম দুইটি কবিতা অপেক্ষা এ দুইটিতে গভীরতর, এবং উহা অনবদ্য ভাষা ও ছন্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে সংক্রামিত হইয়া গিয়াছে, পথের মধ্যে কিছু নষ্ট হইয়া যায় নাই। কিন্তু এ কথা তো সমস্ত সার্থক কবিতা সম্বন্ধেই খাটে। আরও কিছু আছে। শেষ কবিতা দুইটির মূল ভাবান্দোলনের আবর্তে জীবনের আরও কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে টানিয়া আনিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণন বেগে একত্র সমাবিষ্ট করিয়া আপনার সহিত একাত্ম করিয়া তুলিয়াছে। সেই অনভিজ্ঞা কিশোরীর বেদনা আমাদের নিকটে প্রত্যক্ষ কিন্তু নেপথ্যে যে মাতৃহৃদয়টি রহিয়াছে তাহার স্নেহক্ষুব্ধ নৈরাশ্য আমরা শুধু কল্পনাতেই অনুভব করিতে পারি; এবং এই আশা ও নৈরাশ্যে দোলা মথিত হৃদয়ের ভিতর দিয়া বেদনার এক বিদ্যুৎ ঝলকে তাহার জীবনের অন্যান্য অন্ধকার অংশের অনেকটা আমাদের চোখে পড়িয়া যায়। সে যে শুধু আছে তাহা নয়, সে একটা দেশ কালকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। শেষেরটুকু পাঠকের উপরি-পাওনা কিন্তু এই অতিরিক্তের পটভূমিই তাহার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। 'অনাবশ্যক' কবিতাটিতে হতভাগ্য পুরুষটি দীপশিখার সৌভাগ্য লাভ করিল না। ঘরের দুঃসহ অন্ধকার পাথরের মত তাহার মনের উপর চাপিয়া আছে, আর সে দেখিতেছে, দিনের পর দিন অত্যন্ত অকারণে, যে দীপটি তাহার জীবনকে উজ্জ্বল ও রমণীয় করিয়া তুলিতে পারিত, তাহা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, আকাশ-প্রদীপে উৎসৃষ্ট হইতেছে, এবং দীপালীতে লক্ষ দীপের সহিত জ্বলিয়া অবশেষে নিভিয়া যাইতেছে। এ দিকের কথা তো এই, কিন্তু আর একদিকে সেই মেয়েটি! অবশ্য নারী-হৃদয়ের একনিষ্ঠা তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার মনের মধ্যেও দ্বিধার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। বাহিরে অন্ধকার গভীরতর হইতেছে, উভয়ের মনেও অন্ধকার গভীরতর হইতেছে, একজনের নৈরাশ্যের, অপরের দ্বিধার। প্রথম দিন দেখা 'গোধূলিতে', দ্বিতীয় দিন 'ভরা সাঝে', শেষে একেবারে অমাবস্যার 'আঁধার দুই পহরে'। প্রথমে মেয়েটির মনে প্রদীপ উৎসর্গের সার্থকতার সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ছিল না। একবার মাত্র

> ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
>
> সে কহিল

কিন্তু দ্বিতীয় দিন আর অত সহজে যে উত্তর দিতে পারিল না সে

> ক্ষণেক তরে রৈল চেয়ে ভুলে

আর শেষ দিনে

ক্ষণেক মোরে দেখ্‌লে চেয়ে তবে,

বালিকা-হৃদয়ের এই যে দ্বন্দ্ব, সংস্কার ও আবেগের মধ্যে, অপরদিকে হতভাগ্য পুরুষটির দীপশিখা মুগ্ধ চিত্ত, বাহিরের অন্ধকার ও অন্তরের নৈরাশ্য, সমস্ত একটিমাত্র ক্ষীণ দীপশিখায় আভাসে উজ্জ্বল হইয়া পাঠকের চিত্তকে বেদনাময় রহস্যে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। এতগুলি বিচিত্র অভিজ্ঞতা এ দুইটি কবিতাতে সংহত হইয়া ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্থকতা সাধন করিয়াছে।



উৎসর্গ

উৎসর্গ দীর্ঘনিঃশ্বাসের কাব্য। যাহা চাই, অথচ পাওয়া গেল না, যাহা কাম্য অথচ করতলগত হইল না, যাহা সাধনার কিন্তু সাধ্য নহে, এ দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহারই জন্য; কবির মুখ কখনো অতীতের দিকে, কখনো বা ভবিষ্যতে, বর্ত্তমানে কদাচিৎ; অতীতের আশ্বাস ও ভবিষ্যতের আশা-ই এই কাব্যের প্রধান উপজীব্য।

এ কাব্যখানি রচনার একটুখানি ইতিহাস আছে। প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় মোহিতকুমার সেন কবির সমগ্র কাব্যের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। তাহাতে কাব্যকে বিষয়বস্তু অনুসারে দশ খণ্ডে ভাগ করেন। কবি প্রত্যেক খণ্ডের ভূমিকাস্বরূপ তুই একটি করিয়া কবিতা লিখিয়া দেন। ভূমিকা লিখিবার প্রবৃত্তিতে ইহার উদ্ভব। কাজেই এই ভূমিকার মূলরস যে দীর্ঘনিঃশ্বাস, তাহাকে কবির সমগ্র কাব্যের মূলরসের আভাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। [illegible]

মানুষের জীবন রবীন্দ্রনাথের সাধনার বিষয়, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাহা সাধ্য নহে। এই তুর্গম রহস্যের মধ্যে কবি নানাভাবে, নানাদিক্ হইতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে প্রবেশ-চেষ্টার ইতিহাস বিচিত্র, বস্তুতঃ সেই চেষ্টার ইতিহাস-ই কবির কাব্য। কখনো বর্ত্তমানের সিংহদ্বার দিয়া, কখনো ইতিহাসের পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া জীর্ণপ্রায় প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া, আবার কখনো বা ভগবৎ-প্রেমের ভাবনার আকাশপথে। আত্মজীবনের জীবনদেবতার উপলব্ধিতে মানুষের জীবনে প্রবেশের প্রয়াস, বিশ্বদেবতার সার্ব্বজনীন অনুভূতিতেও সেই একই কথা। নারীর জীবন, শিশুর জীবন, প্রকৃতির জীবন, সকল প্রয়াসেই তাঁহার সেই তুর্গমতম রহস্যলোকে প্রবেশের তুশ্চেষ্টা। কিন্তু চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে কখনো বা কোথাও সার্থক হয় নাই। কবি-ধর্ম্মের দিক্ দিয়া তাঁহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল, মানুষ হিসাবে, বিংশ শতাব্দীর মানুষ হিসাবে তাঁহার "মনে সুখ তুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ ভালবাসা প্রবল।" কবির কাছে মানুষের পরাজয় ঘটিয়াছে, যাহা হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। যে জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ ঘটিল না, তাহা সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষালোকরূপে কবিকে চিরদিন উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। জীবনকে তিনি যে জাগতিক রীতি অনুসারে যথা-যথ না দেখিয়া সৌন্দর্য্যে আদর্শায়িত করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার রহস্য এই প্রবেশের ব্যর্থতায়।

তারপরে জীবনের বিকাশের সঙ্গে বুঝিতে পারিলেন, এই দুর্গম দুর্গে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ-অধিকার তাঁহার নাই, তখনো তিনি ইহার উপর বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ হইলেন না, বোধ হয় অপ্রাপ্য বলিয়া তাঁহার অনুরাগ আরো বাড়িল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন—

—হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশী বাজাবার দিয়াছ যে ভার
তোমার সিংহ দুয়ারে—

তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে তিনি মানুষের সিংহদ্বারের কবি। যাঁহারা অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে পারিল তাঁহারা সৌভাগ্যবান্, কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য এই যে তিনি মানুষের বিপুল জীবনের বিরাট্ সিংহদ্বারে বসিয়া তাহার বিচিত্র জীবনগাথা গাহিতে পারিয়াছেন। সে গানে মুগ্ধ হইয়া কত জন অন্দরমহলে প্রবেশের পথ পাইল, দুরাগত কত হতভাগ্য পুনরায় জীবনের কেন্দ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিন্তু যাঁহার সে গান, ভিতরে তাঁহার স্থান নাই। ইহাই কবির সমগ্র কাব্যের সত্যরূপ, উৎসর্গের স্বরূপ ইহাই।

কবি এ কাব্যে দেবতার যে রূপটির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী কাব্যের স্বরূপ হইতে ভিন্ন। ইহা ভক্তের নিকট স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপ নহে, ইহা প্রদোষালোকের দেবতা। প্রদোষলোক রহস্যময়, তাহার একদিকে দিবসের প্রখর আলো, অন্যদিকে রাত্রির নিবিড় অন্ধকার। মাঝখানে এমন একটা সময়, যখন জগৎ দেখা-না-দেখার প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য অপরূপত্ব লাভ করে। এ দেবতার খানিকটা চেনা যায়, খানিকটা অচেনা, খানিকটা বোঝা যায়, খানিকটা অবোধ্য, খানিকটা দেখা যায়, বাকীটা অদৃশ্য। ইহার মধ্যে চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার বিরোধ আছে, অর্থাৎ যেটুকু পাওয়া গেল, তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া যেটুকু পাওয়া গেল না, তাহার জন্য ব্যাকুলতার দীর্ঘনিঃশ্বাস জাগে। উৎসর্গের প্রধান উপজীব্যই তো এই ব্যাকুলতা।

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী,

তুমি এসো এসো গভীর গোপনে,
এসো গো নিবিড় নীরব চরণে,
বসনে প্রদীপ নিবারি,
এস গো গোপনে।

এ যে-জগৎ ইহার খানিকটা সংসারে, বাকীটা স্বপনে, বোধ হয় বেশীটাই স্বপনে। এই সংসার ও স্বপনের মধ্যে বিরোধে জাগ্রৎ যে-ব্যাকুলতা, এ দেবতা সেই ব্যাকুলতার, অতৃপ্তির। এমন দেবতাকে প্রকাশ্য দিবালোকে আমন্ত্রণ করা চলে না।

রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি
পথ ভরিয়াছে আলোকে,
প্রখর আলোকে।

*　*　*　*　*

এসো প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
এসো না পথের আলোকে,
প্রখর আলোকে।

প্রদোষান্ধকারের দেবতা, অতৃপ্তি ও ব্যাকুলতার দেবতা, যাহা সাধ্য নহে তাহাকে সাধনা করেন যে কবি তাঁহার দেবতা, এ দেবতার আবির্ভাবের ইহাই যথার্থ পটভূমি। শুধু তাহাই নয়, এই প্রদোষান্ধকারের রহস্যেই যেন কবির তৃপ্তি, আরাধ্য দেবতাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করার অপেক্ষা অস্পষ্টভাবে অনুভব করায় তাঁহার বেশী আনন্দ।

শুধু কবির নয়, এ দেবতাও যেন রহস্যের ছলনায় আনন্দ পান।

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি বুঝি গো তব
ছলনা
যে কথা তুমি বলিতে চাও
সে কথা তুমি বল না।

এই প্রদোষ-লোকের দেবতা শুধু যে আপনাকে অৰ্দ্ধেক প্রকাশ করেন, তাহা নয়,

নানা ভাবে আপনাকে প্রকাশ করেন, কথনো তিনি হাসির দেবতা, কখনো অশ্রুর। এই ভাবটি পঞ্চম সংখ্যক কবিতায় আরো বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু এই দীর্ঘনিঃশ্বাসের দেবতাকে লইয়া মুস্কিল বাধে যে, মানুষের কাছে তাঁহাকে বোধগম্য করা কঠিন। যাঁহার খানিকটা সংসারে বাকীটা স্বপনে, আবার সেই খানিকের কিছু হাসি, কিছু অশ্রু, কবি যাহাকে বুঝিতে পারেন না, দীর্ঘনিঃশ্বাস যাঁহার স্তবের একমাত্র মন্ত্র, তাঁহাকে কেমন করিয়া লোকের কাছে প্রকাশ করা চলে! তাহারা স্পষ্ট ভাষণ চায়, বিচিত্রতা তাহাদের কাছে অসহ্য। ফলে লোকে অবিশ্বাস করে, এবং কবি অপ্রস্তুত হন।

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে;
মোর আঁকাপটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়,
'কেগো সে' শুধায় তব পরিচয়,
'কেগো সে?'
তখন কি কই নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, 'কী জানি, কী জানি।'

লোকের কাছে তাঁহাকে প্রকাশ করা চলে না বলিয়া তাঁহাকে চিনি না, এমন কথা কি করিয়া বলা যায়!

জ্যোৎস্না নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোম্‌টা খসিতে.

ইহাকে ধরিবার জন্য কবির গানের সাধনা—

তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি?
কাজ নাই, তুমি যা খুসি তা করো,
ধরা নাই দাও, মোর মন হরো,
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি।

এই রহস্যের রসে কবির এতই রতি যে দেবতাকে চিনিবার জন্য তেমন আগ্রহ নাই, কারণ সমগ্র পরিচয়ে হয়তো রসাভাস জন্মিতে পারে। যেমন মানব-জীবনকে তেমনি দেবতাকে, সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আদর্শায়িত করিয়া দেখিয়াই কবির তৃপ্তি, এক কথায় অতৃপ্তিতে, ব্যাকুলতাতেই যেন তাঁহার তৃপ্তি।

২

এবার দেখা যাক, কবি নিজেকে কি ভাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কবির দেবতা আলোছায়ার দেবতা, লুকোচুরি তাঁহার স্বধর্ম্ম। কবির মধ্যে একটা অংশ কবি, বাকীটা মানুষ। এই দুইয়ে বিরোধ আছে, এই বিরোধের জন্যেই কাব্যখানি রসজটিল হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের ধর্ম্মে ও কবির ধর্ম্মে বিরোধ বাজে, যখন মানুষ হারে, তখনি কাব্যের শ্রেষ্ঠতা, যখন কবির স্বভাব মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও রুচির নিকট পরাজয় মানে, তখন কাব্যের দুর্দ্দশা। আমরা অনেক সময় এ দুইটাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারি না বলিয়া গোল বাধাই।

কবির দেবতার মত কবিও দুই অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে মানুষ অংশটা দেখিতে বড়, কিন্তু অস্পষ্ট লুকোচুরি-ধর্ম্মী কবি অংশটাই আসল। এ দুইটার মধ্যে বিচ্ছেদ, একটা আর একটাকে পাইবার জন্য; একে অন্যের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু লোকে দুইটাকে তাল পাকাইয়া এক করিয়া লয়। সেই জন্য কবির সাবধান বাণী—

> বাহির হইতে দেখোনা এমন করে',
> আমায় দেখোনা বাহিরে।
> আমায় পাবেনা আমার দুখে ও সুখে,
> আমার বেদনা খুঁজোনা আমার বুকে,
> আমায় দেখিতে পাবেনা আমার মুখে,
> কবিরে যেথায় খুঁজিছ সেথা সে নাহি রে।

তবে কবিকে কোথায় খুঁজিতে হইবে? ইহার উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি, মানুষের কবিকে মানুষের লোকালয়ে সন্ধান কর। 'আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে' ইত্যাদি।

যদি তাহাই হয়, তবে এই শ্লোকের যথার্থতা কি ?

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
মেঘ-গর্জ্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
নীরব মন্দ্রে নিশীথ-আকাশে রাজে
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া—

ইহার মধ্যে কবিকে অনুসন্ধান করিতে বলিতেছেন কেন ? এই যে প্রকৃতির বর্ণনা, ইহাও তো মানুষকে বাদ দিয়া নয় ; মানবকে বাদ দিয়া প্রকৃতির কোনো অর্থ নাই, মানুষের চিত্তেই ইহার সার্থকতা, কিংবা বাহিরের বিশ্বে বস্তু নাই, মানুষের চিত্তসরোবরে স্নান করিলেই তাহার জন্ম। অতএব বিশ্বও মানুষের সম্পর্কেই আছে ; কাজেই মানুষের কবিকে মানুষের বিশ্বের মধ্যে পাওয়া কঠিন নহে।

তৃতীয় শ্লোকে কবি প্রকৃতির একটি বর্ণনা দিয়া নিজেকে তাহার সহিত একাত্ম করিয়া ফেলিয়াছেন। চতুর্থ শ্লোকে তিনি আরো অগ্রসর। উপমার ছলনায় মানুষ প্রকৃতির একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।

নর-অরণ্যে মর্ম্মর তান তুলি
যৌবন-বনে উড়াই কুসুম-ধূলি,
চিত্ত-গুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি,
*　　*　　*　　*　　*
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।

নর-অরণ্য, যৌবন-বন, চিত্ত-গুহা এবং হৃদয়-চূড়ায় এগুলি কেবল উপমার খাতিরে নহে। মানুষকে প্রকৃতির নানা দৃশ্যে কবি ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। কেন ? মানুষের কবি যতক্ষণ না মানবকে সর্ব্বব্যাপী করিয়া দেখিতে পাইতেছেন, যতক্ষণ না 'সব লাল হইয়া যাইতেছে', প্রকৃতি অবধি মানবায়িত হইয়া উঠিতেছে, ততক্ষণ সম্পূর্ণতা কোথায় ?

সে সাধনা কি ? পূর্ব্বে আমরা তাহা বলিয়াছি, আবার শোনা যাক,

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।

স্পষ্ট কবুল জবাব। ইহার পরেও যাহারা কবিকে প্রকৃতির কবি বা ব্রহ্মের কবি বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এই তো কবির স্বরূপ; কবি স্বয়ং সে সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন নহেন, লোকে তো ভুল করিবেই।

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।

ইহা নিকষিত স্বর্ণ। আর খাদ কোথায়?

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।

ইহা সেই স্বর্ণের খাদ।

তাহা হইলে দেখা গেল, কবির দেবতার মত কবিরও দুইটি সত্তা; তাঁহার প্রকাশ্য অংশের চেয়ে নেপথ্যগত অংশটাই সত্যতর; এবং একটা আর একটাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল।

এখন দেখা যাক, কাবর দেবতা ও কবির সত্তার মত কবির জগৎটা কি রকম? সেটার মধ্যে কোনো ব্যাকুলতার দ্বিধা আছে কি না?

সপ্তদশ সংখ্যক কবিতাটি প্রসিদ্ধ।

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।

ইহাই কবির জগৎ; দ্বিধা ইহার ধর্ম্ম; দুই ভাগে মিলাইয়া ইহা সম্পূর্ণ; কোনো জগৎকে ছোট বা বড় বলা চলে না; আবার কোনোটাকে ছাড়িয়া দিলেও অচল হয়।

ধূপ ও গন্ধ; সুর ও ছন্দ; ভাব ও রূপ; অসীম ও সীমা; বন্ধ ও মুক্তি; এমনই বিচিত্র ও স্বতোবিরুদ্ধ এই জগৎ। স্বতোবিরোধ আছে সত্য কিন্তু একটা

হইতে আর একটায় যাতায়াতের পথ সে জন্য রুদ্ধ নয়, বরঞ্চ—ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা চলিতেছে। এই দ্বিধা ও স্বতোবিরুদ্ধতায় এক ভাগের জন্য আর এক ভাগের ব্যাকুলতা; ব্যাকুলতাই এই বিচিত্র জগতের প্রধান রস; এই জগতের অধিবাসী কবি ব্যাকুল-রসের পরম রসিক।

এমন যে আশ্চর্য্য জগৎ তাহাকে বুঝিয়া ওঠা দুরূহ; অন্ততঃ তাহাকে বুঝিতে হইলে একটু স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

ইহাকে বুঝিতে হইলে বর্ত্তমানের রঙ্গমঞ্চ হইতে একটু দূরে দাঁড়ানো আবশ্যক, নহিলে ইহার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি অসম্ভব।

আলোকে আসিয়া এরা লীলা ক'রে যায়
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।
ভাবে মনে বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
অর্থ কিছুই এর নাহি রে।

বর্ত্তমান হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিলে ইহাকে নিরর্থক মনে হইবে।

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কী করিস্ নাট-বেদীতে?
বুঝিতে চাহিস্ যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।

* * * * *

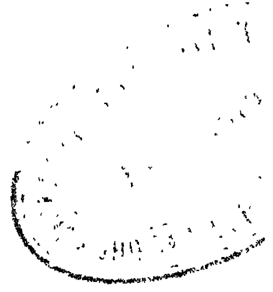
সকল রহস্য তুই
চাস যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস্ নাট-বেদীতে।

এ যে শুধু বর্ত্তমানের রঙ্গমঞ্চ হইতে সরিয়া দাঁড়ানো তাহা নহে, অভিনেতার জীবনের সব দাবী ছাড়িয়া দাঁড়ানোর এ পরামর্শ; এমন করিয়া বিবিক্তভাবে দাঁড়াইলে তবেই এ বিচিত্র জগৎকে বোঝা সহজ।

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।

এই দূরে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা মনে না রাখিলে এ কাব্য বোঝা কঠিন। এ কাব্যে বস্তু-বিষয় হয় অতীতের, নয় ভবিষ্যতের পটভূমির অন্তর্গত। এবং এই উভয় জগতের মাঝে যে সেতু, তাহা অত্যন্ত সুকুমার একান্ত আকাশধর্মী, অত্যুগ্র উৎসাহী পাঠকের পদভার সহ্য করিতে অক্ষম, যে হেতু তাহা দীর্ঘনিঃশ্বাসের; বর্ত্তমানের রূঢ় তরঙ্গাঘাতে ব্যাকুলতার এই ক্ষীণ সূত্রটুকু নিয়ত কম্পমান।

এবারে দুইটি কবিতা লইয়া আলোচনা করা যাক। দুইটিই ইতিহাস অর্থাৎ অতীত সম্বন্ধে।



কথা কও, কথা কও,
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও?
*　*　*　*
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও, কথা কও।

ইহা রীতিমত অতীতের সাধনা। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, মানুষের কবি মানুষকে ছাড়িয়া অতীতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। না, এ বানপ্রস্থ নয়। ইহা মানুষকে অতীতের পটভূমিতে রাখিয়া দর্শন মাত্র; বস্তুতঃ ইহা মানুষেরই সাধনা, মানুষের কবি যদি তাঁহার সাধনার বিষয়কে কেবল বর্ত্তমানের পটে আঁকিতেন, তাহাকে ছোট করিয়া ফেলিতেন, বস্তুতঃ ইহা অতীত হইলেও ইহার সহিত নাড়ীর যোগ আছে,

তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝখানে,

শুধু তাহাই নহে, অতীতের সেই মন্ত্র ইহার জানা আছে, যাহাতে সে অতীতের সহিত বর্ত্তমানকে মিলাইয়া লইতে পারে—

তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।

এ অতীত জীবনের পক্ষে নিরর্থক নয়, কারণ ইহা গোপনে বর্ত্তমানকে রচনা

করিতেছে; তবে কেন ইহাকে দূরে রাখিয়া দেখিবার প্রয়াস! নহিলে যে এ অদ্ভুত জগৎকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া ওঠা যায় না!

এই গেল অতীতের ঐতিহাসিক মূর্ত্তি, কবি যাহাকে বলিয়াছেন হে মুনি-অতীত! অতীতের আর একটি মূর্ত্তি কবি আঁকিয়াছেন—সে আমাদের হৃদয়ের গেহিনী। ইনি কি করিতেছেন—না, মানুষ যে সব তুচ্ছ সুখ দুঃখ ভুলিয়া যায়, ইনি তাহা সমাদরে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া আপন ভাণ্ডারে তুলিয়া রাখেন। কবি ইহারই গোটাকত সংগ্রহ করিয়া 'কথা ও কাহিনী'র কাহিনী অংশে পাঠককে দিয়াছেন। ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা সামান্যতঃ বলা হইল, স্বদেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহা কিরূপে বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে দেখা যাক।

যোড়শ সংখ্যক কবিতাটি স্বদেশের কল্পনা মূর্ত্তি; যে কল্পনা অতীতে ও ভবিষ্যতে পরিব্যাপ্ত বর্ত্তমানের কোনো চিহ্ন ইহাতে নাই।

প্রথম শ্লোকে বিশ্ব-দেবকে সনাতন স্বদেশের সহিত মিলাইয়া দর্শন। তারপরে ভারতবর্ষের নীল আকাশ, হিমালয়, জাহ্নবী এবং সাগরের রূপে স্বদেশের নানা মূর্ত্তি মাধুরী পরিদর্শন। কিন্তু ইহাদের কি বর্ত্তমান বলা চলে না? না। আকাশ জাহ্নবী, সাগর, হিমাদ্রি ইহারা কেবল বর্ত্তমানের নয়, ভারতবর্ষের পক্ষে, ভাব ভারতবর্ষের পক্ষে ইহারা যেমন বর্ত্তমানের, তেমনি অতীতের ও ভবিষ্যতের, সংক্ষেপে ইহারা ভারতবর্ষের সনাতন ব্যঞ্জনা। কাজেই এগুলির উল্লেখে দোস হয় নাই।

দ্বিতীয় শ্লোক স্পষ্টতঃ ভারতের অতীতকালীন রূপ।

> অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব,
> তব গান মোর স্বদেশে।

তৃতীয় শ্লোকে কবি সুদূর ভবিষ্যতে চলিয়া গিয়াছেন।

> নয়ন মুদিয়া ভাবী কালপানে
> চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
> তব মঙ্গলবিজয়শঙ্খ
> বাজিছে আমার স্বদেশে।

মাঝখানে বর্ত্তমান কালটা প্রকাণ্ড একটা ফাঁক। ফাঁকটা কিন্তু শূন্য নয়, অতীত হইতে ভবিষ্যতের কোঠায় যাইবার সময় পাঠক অনুভব করিতে পারে, কবির গভীর দেশাত্মবোধোদ্বোধিত তপ্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বর্ত্তমানের এই আকাশটাতে যেন সতত বিলাপ করিয়া ফিরিতেছে। হিমালয়ের উপর ছয়টি কবিতা আছে—তাহাতে

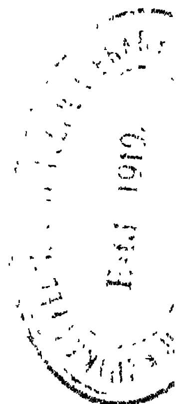
কবি ভারতবর্ষকে নানাভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—কারণ, ভারতবর্ষের সনাতন পটভূমি হিমাদ্রি, কিন্তু কোথাও বর্ত্তমান ভারতের সামান্য উল্লেখমাত্র নাই। একটি কবিতা আচার্য্য জগদীশ চন্দ্রের প্রতি, তাহাতেও প্রধানতঃ ভারতের প্রাচীন মূর্ত্তি—মাঝে একবার কেবল বর্ত্তমানের তুচ্ছতাকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে।

এতক্ষণ যে কবিতাগুলির আলোচনা করিলাম তন্মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই, তবু ইহারা উৎসর্গের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ নয়। এ বারে যে সব কবিতা আলোচনা করিতে যাইতেছি তাহাতে কি তত্ত্বের হিসাবে, কি কাব্যহিসাবে, এই কাব্যের চরম বিকাশ।

এগুলিকে প্রবাস-বেদনার কবিতা বলা যাইতে পারে।

এই প্রবাসের ব্যথা দুই রকমে অনুভব করা যায়। এক দিকে আদিম পৃথিবীর সহিত বিচ্ছেদ, চিরজনমের ভিটায়, আজ আর ফিরিবার কোনো উপায় নাই; উপায় যদি না থাকিল তাহার স্মৃতিও না থাকিলে কোনো বালাই ছিল না। এক দিকে. সেখানে প্রত্যাবর্ত্তনের অসম্ভাব্যতা, অন্য দিকে স্মৃতির তীব্র ব্যাকুলতা; এ দুইয়ে মিলিয়া কবিকে একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। আবার আর এক রকমের বিচ্ছেদ—সে বিচ্ছেদ কবির অন্তরেই। নিজের মধ্যে আর একটা দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য সত্তা আছে, যে সতত চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে যাহার সহিত মিলনের কোনো উপায় নাই। দুই জনের মধ্যে যা সাক্ষাৎ—কেবল স্মৃতির বাতায়ন পথে, এক জনের জন্য অপরের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। এই দুই প্রকারের বেদনাকেই প্রবাসীর ব্যাকুলতা বলিতে পারি।

> সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
> সেই ঘর মরি খুঁজিয়া;
> দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
> সেই দেশ লব যুঝিয়া।



আবার

> তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
> লুটায় আমার সামনে—
> সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
> কেন যে, কব তা কেমনে?

মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।

কিন্তু আজ আর সেখানে ফিরিবার উপায় নাই।

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
চির জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে,
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে?

এই তো গেল বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছেদ, কিন্তু এ ব্যাকুলতার মূলে শুধু এই বিচ্ছেদই নয়; প্রাচীন ইতিহাসের ধারা অর্থাৎ যে সকল মানব আজ আর উপস্থিত নাই, তাহাদের জন্যও একটা অদ্ভুত বিরহ অনুভূত হইতে থাকে। একদিকে বিচিত্র প্রকৃতি, আর একদিকে মানব প্রকৃতি, উভয়েই স্মৃতির দ্বারা কবি-চিত্তকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী;
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি,
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।

প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া।

আর যে ভালবাসার পাত্র তাহার সঙ্গে পরিচয় শুধু আজিকার মাত্র নয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে এ পরিচয়ের রেশ টানিয়া আসিয়াছি। সেই জন্যই প্রিয়পাত্র এমন অদ্ভুত, অব্যাখ্যাত স্মৃতির ব্যঞ্জনায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিতে থাকে।

তবু এ ব্যাকুলতাকে, এ বেদনাকে খানিকটা বুঝা যায়, ইহার ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু আর এক রকম ব্যাকুলতা বেদনায় অর্দ্ধচৈতন্য হৃদয়কে উন্মনা করিয়া দেয়, না যায় সম্পূর্ণরূপে তাহাকে বুঝা, না আছে তাহার স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা। কিসের জন্য তাহা।

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম,
কস্তুরী মৃগসম।

কিসের জন্য এ ব্যাকুলতা। বাস্তব কিছু কি?

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।

তবে কি ব্যাকুলতার লক্ষ্য, বাস্তব কিছু নয়, কেবল মনের একটা বিকার, মরীচিকা। লক্ষ্যটা যেমনি হ'ক, ব্যাকুলতা সম্বন্ধে সন্দেহ কি! কেবল এইটুকু স্পষ্ট করিয়া বলা চলে—

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

তবে এ দ্বন্দ্ব কেবল বাসনার চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে। ইহার মূলে বাস্তব কিছু থাকিলে একদিন-না-একদিন চাওয়া-পাওয়ার সামঞ্জস্য ঘটিত; কিন্তু এ কেবল বাসনার দ্বন্দ্ব। এই বাসনার দ্বন্দ্বই ৮ সংখ্যক সুদূর কবিতাটিতে।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।

সুদূরের কি অন্ত আছে, না তাহার কোনো বাস্তব সীমা আছে? চিরদিন তাহা সমানভাবে সুদূর, যত অগ্রসর হও এ ব্যাকুলতার তৃপ্তি কোথাও নাই। ইহা

বাস্তব নহে বলিয়াই কবি ইহাকে সুদূর ছাড়া আর কিছু বলিতে পারেন নাই। ৯ সংখ্যক কবিতাটি—

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হ'য়ে—

ইহাতেও সেই একই কথা। কুঁড়ি জানে না—

কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়!

কুঁড়ির বাসন্তিক ব্যাকুলতার জবাব কবি দিয়াছেন, কিন্তু আজ ব্যাকুলতা ব্যতীত অন্য কোনো সান্ত্বনা তাহার নাই।

এই ব্যাকুলতার ভাবটিকে আর একরকমে কবি ১০ ও ১১ সংখ্যক কবিতাদ্বয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্যাকুলতা কবির অন্তর্নিহিত নারীর মনোভাব। তাহাকে কত যত্নে, কত আদরে তৃপ্তিদানের ইচ্ছা কবির। তাহাকে আপন করিবার ইচ্ছা কবির, কিন্তু যে বিরহিণী—

তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই,
কহে বিরহিণী নারী।

প্রচুর ঐশ্বর্য্যসম্ভার যখন তাহার পায়ে উপস্থিত করা যায়—

এ সবে আমার কোনো সুখ নাই
কহে বিরহিণী নারী।

অসংখ্য ভক্তের হৃদয় যখন তাহারি পদপ্রান্তে, তখনো—

হৃদয় কুড়ায়ে কোনো সুখ নাই
কহে বিরহিণী নারী।

তাহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু অজানা, না অপ্রাপ্য! যাহাকে তাহার আকাঙ্ক্ষা বস্তুতঃ সে অপ্রাপ্য! অপ্রাপ্য বলিয়াই তাহা এত মনোহর, যদি কখনো বিরহিণী সেই অজানাকে পায়, তখনি বুঝিতে পারিবে, ইহাতেও তাহার তৃপ্তি নাই।

১১ সংখ্যক কবিতার চিঠিতে এই অজানার আভাস। সে চিঠির পাণ্ডিত্যিক ব্যাখ্যায় নারীর আগ্রহ নাই, কারণ তাহাতে অজানা জানা হইয়া পড়ে। অজানার চিঠি আপন অন্তরের ও প্রকৃতির ইঙ্গিতে সে পড়িতে উৎসুক, কারণ তাহাতে

সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার উপায় না থাকায়, অজানার পরিচয় অর্দ্ধ জানা হইয়া থাকিবে; এই অর্দ্ধ-জানাতেই অর্দ্ধ-পাওয়াতেই তাহার তৃপ্তি।

এই কয়টি কবিতায়, উৎসর্গ কাব্যের যাহা প্রধান রস-উপজীব্য, সেই ব্যাকুলতা, অতৃপ্তি, চাওয়া-পাওয়ার অসামঞ্জস্য সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রহস্যের উদ্ঘাটনের অপেক্ষা অনুধাবনে বেশী আনন্দ, কারণ উদ্ঘাটনের গৌরব তাত্ত্বিকের, আর অনুধাবনের 'পলকে নূতন হোয়' ব্যঞ্জনায় যে-আনন্দ, তাহা কবির।

এবারে গোটাকতক প্রেমের কবিতার আলোচনা করা যাক। এগুলি প্রেমের মিলন-স্মৃতির কবিতা অর্থাৎ ইহার রস স্মৃতি-সুখের রস। বর্ত্তমানের সহিত ইহার যোগ খুব কম, অতীত ইহার পটভূমি। এই হিসাবে এগুলিও উৎসর্গের মূল রসের অন্তর্গত।

১০ সংখ্যক কবিতাটি। ইহার প্রথম শ্লোকে প্রেমের অচঞ্চল [illegible], দ্বিতীয় শ্লোকে প্রেমের পটভূমির ও বাস্তবতার অনিত্যতা। নিগুণ প্রেম আদর্শমাত্র, কোনো বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের সহিত তাহা যুক্ত নহে—কাজেই তাহার পরিবর্ত্তন নাই।

কিন্তু সেই প্রেম যখন প্রেমিকের চিত্তে আশ্রয় পায়, বিশেষ দেশ-কালের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তখন তাহা নদী স্রোতঃশায়ী ফেনপুঞ্জের মত চঞ্চল।

যে কয়টি কবিতা আমাদের আলোচ্য, তাহার রস প্রেমের চঞ্চলতায়, অনিত্যতায়, অর্থাৎ তাহার পটভূমি অতীতকাল, [illegible] প্রধান রস।

৩৬ সংখ্যক কবিতাটিকে মেঘোদয়ে নামকরণ করিতে পারি। নবীন মেঘোদয়ে কবির চিত্তে একটি অপূর্ব্ব প্রেম-ব্যাকুলতার আবেশ। এই ব্যাকুলতার লক্ষ্যকে কবি আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানের আবহাওয়ায় এই আবেশ স্ফূর্তি পায় নাই। তাই দ্বিতীয় শ্লোকে দেখি—

আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে
বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে
জানি না কোন দূর সমুদ্রের পারে।

কিন্তু এই সুদূর যে অতীতকাল তাহা কে বলিল? কবি নিজেই বলিয়াছেন, তৃতীয় শ্লোকে—

ঐখানেতে মিলে তোমার সনে,
বেঁধেছিলাম বহুকালের ঘর,
সেথায় ঝড়ের নৃত্য মাঝে
ঢেউয়ের সুরে আজো বাজে
যুগান্তরের মিলন-গীতিস্বর।

আবার চতুর্থ শ্লোকে—

আজকে যেন দিশে দিশে
ঝড়ের সাথে যাচ্ছে মিশে
কত জন্মের ভালবাসাবাসি।
তোমায় আমায় যতদিনের মেলা,
লোক-লোকান্তে যতকালের খেলা
এক মুহূর্ত্তে আজ কর সার্থক।

যাহা অতীতের তাহা বর্ত্তমানে আনিয়া ভোগ করিবার চেষ্টা। ইহা একটা আশা মাত্র! যদি ইহা সম্ভব হয়, এই ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ইহার সম্বল!

৩৮ সংখ্যক কবিতায় এই ভাবটি বিস্তার ও অপূর্ব্বতা লাভ করিয়াছে। কবি নিজের অসম্ভবের রসে রসিক মনকে বলিতেছেন :—

আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্ছে তোমার পাখা উড়ে
তোমার সাথে চলতে আমি নারি।
তুমি যাদের চিনি বলে' টান্‌ছ বুকে নিচ্ছ কোলে
আমি তাদের চিন্‌তে নাহি পারি।

তাহার পরের শ্লোকে দেখি—

খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।

ইহা শুধু এই কবিতার পক্ষে নয়, সমস্ত কাব্যখানির পক্ষে সত্য। যুগান্তরের সেতু পার হইয়া অসম্ভবের ঘরে মর্চে-পড়া পুরোনো কুলুপ খুলিয়া কবি যে অপরূপ চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছেন তাহার কতক আভাস এই কবিতাটিতে।

৩৯ সংখ্যক কবিতাটিতে অতীতের কথা এমন স্পষ্ট ভাবে নাই তবে যে প্রেমের আভাস ইহাতে, তাহা

বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু সুরের

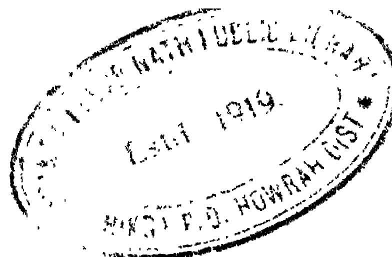
দেশ ও কালের অপূর্ব্বতায় এ প্রেম ব্যাকুলতার মতই শোনাইতেছে।

৩৭ সংখ্যক কবিতায় অবশ্য প্রেমের চেয়ে বিশিষ্ট প্রেমিকের প্রাধান্য। কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতেই কবিতাটির প্রাণ, 'আমি যারে ভালবাসি' সে অনুপস্থিত

অথচ যে-সব দুঃখের সহিত সে নিত্য সংযুক্ত ছিল, তাহারা পড়িয়া আছে, এ দুইয়ের দ্বন্দ্বে এই কবিতার ব্যাকুলতার সৃষ্টি।

প্রেমের এই অপরিশোধ্য ব্যাকুলতা সবচেয়ে বেশী ফুটিয়াছে শুক্ল-সন্ধ্যা কবিতায়, (২৩)। যে-প্রেমিক চেতনার বহির্ভাগে থাকিয়া মাঝে মাঝে শুভলগ্নে এক-আধটি ইঙ্গিত-মাত্র-দ্বারা আমাদিগকে উন্মনা করিয়া দেয়, লিপিমুখী নলের রাজহংসের মত যে আভাস একান্ত মূকভাবে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অসহায় ভাবে ফিরিয়া যায়, হয়তো সম্পূর্ণরূপে তাহার সহিত মিলন সম্ভব নয়, তবু অপরিশোধ্য ঋণের চৈতন্যে যে ব্যথিত করিয়া তোলে, সেই ব্যাকুলতায় কবিতাটি অনবদ্য। এমন আশ্চর্য্য কবিতাটি কোনো চয়নিকায় স্থান পায় না কেন বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

উৎসর্গের বিশেষ ভাবটি প্রকাশ করে যে-সব কবিতা তাহাদের আলোচনা শেষ করিলাম। বাকি কবিতাগুলির সহিত এই ভাবের কোনো নিকট সম্বন্ধ নাই।



বলাকা

বলাকা ১৩২৩ সালে প্রকাশিত। কিন্তু ইহার কবিতাগুলি দুই বৎসর ধরিয়া লিখিত হইতেছিল। প্রথম চৌত্রিশটি ১৩২১-এ এবং শেষের ১১টি ১৩২২-এর কার্ত্তিক হইতে পরবর্ত্তী বৈশাখের মধ্যে রচিত। এই পঁয়তাল্লিশটি কবিতার দশটি সমশ্লোকে ও একটি সনেট আকারে লিখিত। বাকি চৌত্রিশটি বিষমশ্লোকে রচিত; এই শ্লোক-পদ্ধতি বাংলা সাহিত্যে বলাকার ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

১

বলাকা আলোচনার পূর্ব্বে কবি-জীবনের একটি ঘটনা মনে রাখা দরকার। এই কাব্য লিখিবার পূর্ব্বে কবি দীর্ঘকাল, প্রায় সতেরো মাস, বিদেশে—ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও কবি বিলাতে গিয়াছেন। তাহার মূল্য নগণ্য। সে-সব ভ্রমণ বাহিরের দিক্ হইতেও যেমন স্বল্পকাল স্থায়ী, কবির কাব্যেও তাহার প্রভাব তেমনি স্বল্প। কিন্তু এ বারে তিনি বিদেশে গিয়া তথাকার বিপুল জীবন-যাত্রার কিছু আভাস পাইয়াছিলেন। মানুষের তিনি কবি; মানবতার যে ধারাটা আমাদের দেশে প্রবাহিত, যাঁহার কূলে তিনি মানুষ, তাহা ক্ষীণস্রোত, প্রাণের বেগ তাহাতে অতি মন্থর; একদিন যাহা মহানদ ছিল, ইহা তাহার শুষ্কাবশেষ মাত্র। এই মানবতার প্রবলতম ধারাটা আজ ইউরামেরিকায় বহিতেছে; সেই বিরাট্ বেগবান্ স্রোত কবি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলেন, তাহার প্রচণ্ড প্রবাহ তাঁহার শিরা-উপশিরাকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। বলাকা যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে মানুষের এই বিরাট্ জীবন-প্রবাহটাকে পাঠকের চিত্তের পটভূমিতে রাখা আবশ্যক। কারণ এই ভাবটা স্বয়ং কবির কল্পনায় সর্ব্বদা অলক্ষ্যে কাজ করিতেছে।

আরো একটা ঘটনা; তাহাও বাহিরের কিন্তু তাহারো ভিতরের মূল্য বোঝা দরকার। কবি নোবেল পুরস্কার লাভ করিলেন। এত দিন তিনি মরানদীর তীরে বসিয়া যাহা লিখিতে ছিলেন, তাহার প্রতিধ্বনি যখন ওই বিরাট্ প্রবাহের তরঙ্গে বাজিয়া উঠিল, তখন কবি বুঝিতে পারিলেন, তিনি ঐ নদীর স্বভাবী। এই দুই নদী একই মহানদীর দুইটি শাখা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই মরানদীর

কবির উপরে ওই ভরানদীর আত্মীয়তার দাবী আছে। মানবজীবনকে দেখা এবং সমগ্রভাবে দেখা কবির সাধনা। কিন্তু সেই সমগ্রতা যে কত বিরাট্ এবং দাবী যে কত প্রচণ্ড তাহা বুঝিতে কবির বাকি রহিল না। এবং সেই দাবী যে আবার তাঁহার কাছে, ইহাও বিস্ময়ের। ওই মানবপ্রবাহ যেমন বিরাট্, তাহার দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশাও তেমনি অসংখ্য—ইহাও কবি লক্ষ্য করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে গীতাঞ্জলির সময় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ আমাদের দেশের জীবনযাত্রা কবির কাব্য-বস্তু ছিল। ইহার সুখ দুঃখ, আশা আশঙ্কা, অতীত ভবিষ্যৎ পরিমাপ করিয়া তিনি একটা ঐক্য-বোধের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জীবনপ্রবাহের প্রচণ্ড আঘাতে এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ-প্রাণ ঐক্য-বোধ শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাও বলাকার একটা লক্ষণীয় বিষয়।

সে ঐক্য-বোধ শিথিল হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। কারণ ইহার আবশ্যক ছিল। যে-মানবজীবনকে ভিত্তি করিয়া কবি সামঞ্জস্যের স্বর্গ গড়িয়াছিলেন, সে-মানবজীবন অসম্পূর্ণ ছিল. এ বারে সম্পূর্ণ মানবজীবনের তিনি সাক্ষাৎ পাইলেন, কিন্তু তাহার উপর ভিত্তি করিবা সামঞ্জস্যের তোরণ নির্ম্মাণ তেমন সহজ নহে, সেই জন্য পূর্ব্বের কাব্যের ন্যায়, ঐক্য-বোধ ও সামঞ্জস্য বলাকার প্রধান রস নহে। এবং দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দশার পরপারেও যে নূতন উষার স্বর্ণদ্বার আছে ইহা কবির বিশ্বাস। সে স্বর্ণদ্বার আজ না খুলুক—একদিন যে তাহা খুলিবেই—তাহাতেই তাঁহার পরম আশ্বাস। এই আশা-আশঙ্কা মিশ্রিত আশ্বাস বলাকার একটা প্রধান রস। খেয়া-নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির মত তত্ত্ব-হিসাবে ইহা অত্যন্ত অভ্রান্ত ঐক্যমূলক নহে বলিয়াই পাঠককে ইহা আনন্দ দেয়। খেয়া-নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলির পরে যে এই কাব্য বাঙালা পাঠককে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল,—ইহাও তাহার একটা কারণ।

২

প্রথম পর্য্যায়ে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ও ৩৭, ৪৫ ৪৬ সংখ্যক এই আটটি কবিতা ফেলা যাইতে পারে। এ কবিতাগুলির মূলে ইউরোপীয় বৃহৎ জীবনের সংঘাত। সে সংঘাত তখন মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাভাসরূপে কবির চিত্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং কবি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—আমরা তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলাম।

"এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। পরে ৪।৫টি রামগড়ে থাকৃতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা

চল্‌ছিল—এবং সে সময় পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এণ্ড্রুজ-সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পরে একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এই জন্যই একে বলাকা বলা হয়েছে। হংস শ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা করে' একটি অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।"

[শান্তিনিকেতন পত্র. ১৩২৯, জ্যৈষ্ঠ]

১ম সংখ্যক কবিতা

"এই কবিতার মূলগত ভাবটি এই : যৌবনের যে একটি প্রবলতা সে সমস্তকে ভেঙে পরখ করে' দেখ্‌তে চায়। শাস্ত্রবাক্য, আপ্তবাক্য এসব তার জন্য নয়। প্রবীনতা চায় যে কোনো মতে পরের অভিজ্ঞতার বলে বিঘ্ন ব্যথাকে এড়িয়ে থাক্‌বে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তারা আবার তাদের প্রবীণতার বোঝা চাপিয়ে দেবে। বাঁধাবুলি না মেনে প্রত্যক্ষের দ্বারা সব কিছু অনুভব করার মধ্যে বেদনা আছে কারণ তাতে পরের অভিজ্ঞতার কর্ণধারত্ব নেই এবং বাঁধাপথের নির্ব্বিঘ্নতাও নেই—কিন্তু এইতো যৌবনের ধর্ম্ম।"—[শা. প., ১৩২৯ জৈ্যষ্ঠ]

প্রথম কবিতাটি বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। এক দিকে আমাদের দেশের জীবনপ্রবাহের মরানদী অপর দিকে পাশ্চাত্ত্য জীবনের ভরানদী এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে কবিতাটির সৃষ্টি। তৃতীয় শ্লোকের –

বাহির পানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার জলে উঠ্‌ছে প্রবল ঢেউ। [১ সংখ্যক]

মনে রাখা আবশ্যক, ইহা সেই প্রবল জীবনপ্রবাহের দৃশ্য।

২য় সংখ্যক কবিতা

"ইয়োরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎ-বার্ত্তা এই কবিতা লেখার অনেক পরে আসে। এণ্ড্রুজসাহেব বলেন যে, তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল। আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে আমরা মানবের বৃহৎ যুগ-সন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু দুঃখ

বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সে জন্য হৃদয়ের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল। আবার যেন একটা নূতন অভিযান আরম্ভ হবে। হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে—সর্ব্বনাশের জন্য—অর্ঘ্য রচনা করতে হবে। 'সর্ব্বনেশে' একটি রূপক বা symbol নয়। অন্তরে বা বাহিরে যদি সর্ব্বনেশে আসে তবে তার কেমনতর অভ্যর্থনা হবে? গ্রহণ না পলায়ন? এটাই চিন্তনীয় ছিল। দুঃখ-কালেই অন্তরের ও সমাজের প্রচ্ছন্ন সম্পদ্ দেখা দেয়। দুঃখের দিন ছাড়া অপ্রত্যক্ষ অন্তরসম্পদ্ আপনাকে প্রকাশ করে না। গত যুদ্ধকালে কত অখ্যাতনামা দীনহীনজন নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছে, এবং নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করেছে।" [শা. প., ১৩২৯

৩য় সংখ্যক কবিতা

"এই কবিতায় আমার আগের দুটি কবিতার ধারাটিই চলে এসেছে। বলাকার প্রথম কবিতাতে এই ভাবটিই ছিল—যৌবনের জয়ধ্বনির কথা, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পূর্ব্ব যুগের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলে মুক্তি লাভ করে' নূতন করে' জীবনকে গড়ে তোলার কথা। প্রতি যুগের যুবাদের উপর এই ভারটি রয়েছে, তারাই প্রলয়ের ভিতর দিয়ে চিরন্তন সত্যের নূতন পরিচয়কে লাভ করবে। এবারকার যে নবযুগের কথা বলা হয়েছে, এ যুগ সকল মানুষকে নিয়ে। মানুষকে যে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করে রাখে সেই অন্ধকার রাত্রি অবসানপ্রায় আর নবযুগের প্রভাত আসন্ন একথা আমার মনে হয়েছিল, সেই ভাবের আবেগে এই কবিতাগুলি লেখা।

"দেশের যে গণ্ডীর ভিতরে আশ্রয়লাভ করে আমরা তাকে ঘর মনে করেছিলাম, সেই সীমা-রেখা ত্যাগ করে যারা ঘর-ছাড়া হয়েছে তারাই ভবিষ্যতের মহাযুগের যাত্রী; সম্মুখের বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করে তাদের অগ্রসর হ'তে হবে।" [শা. প., ১৩২৯]

৪র্থ সংখ্যক কবিতা

"মানুষকে মিলিত করবার, নবযুগকে আহ্বান করবার পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধূলায় পড়ে রয়েছে। একে গ্রহণ করবার মধ্যে অনেক দুঃখ আছে। ব্যক্তিগত যে ভাবটা এই কবিতার মধ্যে আছে তাকে ছাড়িয়ে যে ভাবটা আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি তা এই:—একটা সময় এসেছিল, যখন বেদনার আঘাতে মনে হয়েছিল, - জীবনের কাজতো সারা হয়ে গেছে, এখন পূজা-অর্চ্চনার দ্বারা শান্তি পাবার সময় এসেছে, এখন অন্য কোন কাজের দাবী নাই। সে সময়ে এই পূজাকেই তখনকার একমাত্র কর্ত্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে একটা দাবী এল, হঠাৎ মনে হল মানুষকে আহ্বান

করবার শঙ্খ ত বাজাতে হবে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোট গণ্ডী থেকে বড় রাস্তায় ত ডাকতে হবে। এই কবিতা যে সময়কার লেখা তখনও যুদ্ধ সুরু হ'তে দু'মাস বাকী আছে। তার পর শঙ্খ বেজে উঠেছে ;—ঔদ্ধত্যে হ'ক, ভয়ে হ'ক তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার-স্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটা সার্ব্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব এখনো আরম্ভ হয়নি। আরো ভাঙবে, সঙ্কীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখন পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে, তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে-কাল সর্ব্বজাতির লোকের। আমি কিছুদিন থেকে এই কথাই ভাবছিলাম যে আমাদের এই যুগ সমস্ত মানবের পক্ষে এক মহাযুগ, পৃথিবীতে এমন সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসেনি। একটা ভাবী কাল আসছে যা মানুষকে আগে থাক্‌তে ভিতরে ভিতরে ঘা দিচ্ছে। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময় এই চিন্তা আমার মনে বর্ত্তমান ছিল। বলাকায় আমার এই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজা স্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের যে দিক্ অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।"

[শা. প., ১৩২৯]

৫ম সংখ্যক কবিতা

"এই কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে লেখা। যে সময়ে যুদ্ধ সুরু হয়েছিল তার চিন্তা আমার মনে কাজ করছিল। তাকে আমার চিত্ত এইভাবে দেখেছে—যুদ্ধের সমুদ্র পার হয়ে নাবিক আসছেন, ঝড়ে তাঁর নৌকার পাল তুলে দিয়ে তিনি প্রমত্ত সাগর বেয়ে এই দুর্দ্দিনে কেন আসছেন? কোন্ বড় সম্পদ্ নিয়ে এবং কার জন্য তিনি আসছেন তা কি এবং নাবিক কোন্ ঘাটে উত্তীর্ণ হবেন?

"২য় শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরের আভাস আছে। সেই আভাসটি এই যে কোন একটি গৌরবহীনা পূজারিণী এক জায়গায় অজানা অঙ্গনে পূজার দীপ জ্বালিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে; যুদ্ধের সাগর পার হয়ে নাবিক সেই পূজা গ্রহণ করবার জন্য এই প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ছেড়েছেন। কত না জানি মণি-মাণিক্যের বোঝা নিয়ে তিনি নৌকা বেয়ে আসছেন। বুঝি কোন বড় রাজধানীতে তিনি সম্পদ্ নিয়ে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু নাবিকের হাতে যে দেখি একটিমাত্র

রজনীগন্ধার মঞ্জরী। তিনি যাকে খুঁজছেন তাকে তো তবে মণি মাণিক্য দেবেন না। তিনি অজ্ঞাত অঙ্গনে এক বিরহিণী অগৌরবার কাছে সেই মঞ্জরী নিয়ে আসছেন। এরই জন্য এত কাণ্ড?

"গত মহাযুদ্ধে একদল লোক অপেক্ষা করে বসেছিল যে যুদ্ধাবসানে তারা শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আর একদল লোক পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য চেয়েছিল। তারা অখ্যাতনামা তপস্বী। পৃথিবীর এই বিষম কাণ্ড-কারখানার মধ্যে তারা সমস্ত ইতিহাসের গভীর চরম সার্থকতাকে উপলব্ধি করেছে। বিশ্বে যারা পরাজিত, অপমানিত, তারা মনুষ্যত্বের চরম দানের পথ চেয়েই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সমস্ত জগতে ইতিহাসের গতি তাদের মঙ্গলের আদর্শের বিপরীত পথে চলেছে কিন্তু তবুও তারা প্রদীপ যদি না নেবায়, তপস্যায় যদি শ্রান্ত না হয়, অপেক্ষা যদি করে থাকে তবে তখন সেই নাবিক এসে তাদের ঘাটে তরী লাগাবেন আর তাদের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেবেন।" [শা. প, ১৩২৯]

৩৭ সংখ্যক কবিতা

ইহা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। পুরাতন যুগের সমস্ত দুঃখ ক্ষোভ ইহাতে যেন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়া বেদনার চরম মুহূর্ত্তে ফাটিয়া পড়িয়াছে। এমন বুকফাটা হাহাকারের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অল্পই আছে। বর্ষশেষ ও শিবাজী-উৎসব ইহার সহিত তুলনীয়। কিন্তু আমার ধারণা ওদুটির অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বের দুটিতে অত্যন্ত সচেতনভাবে একটি তত্ত্বে গিয়া পৌঁছিবার প্রয়াস কবির মনে আছে: কিন্তু এ কবিতাটিতে 'লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোলের' সহিত মিশ্রিত মৃতপ্রায় যুগের সমুদ্রের কলরোল ব্যতীত আর কিছুই কানে আসে না।

দূর হতে শুনিস্ কি মৃত্যুর গর্জ্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল!
বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্চ্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন,

পুরাতনের দেশে যেন প্রলয় জাগিয়া উঠিয়াছে! আবার—

ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না ত কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—

পুরাতন পরিচিত সমুদ্রের এ কী কালী মূর্ত্তি। এই প্রলয়সমুদ্র ভেদ করিয়া

তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।

কিন্তু কোথায় যে নূতন উপকূল তাহা কেহ জানে না—কেবল বাহির হইয়া পড়িবার একান্ত আদেশ। যাহারা অতি প্রিয় তাহাদের অশ্রু এ যাত্রাকে আরো দুস্তর করিয়া তোলে।

যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রিদল
উঠেচে আদেশ,
বন্দরের কাল হল শেষ!

অকস্মাৎ এ প্রলয় কাহার পাপে!

ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত!
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদারিয়া—
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

কাহার দোষ সে বিচার আজ নিরর্থক, প্রলয়ের দায়িত্ব সকলেরই। অতএব সে বিচার আজ থাক।

শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ দুঃখের অন্তে কোন সুনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বলোকে পৌঁছিবার প্রয়াস কবির নাই। ইহা নাই বলিয়াই কবিতাটি একান্তভাবে পাঠকের বিশ্বাসলোকে স্থান পায়। প্রত্যেক সমস্যার পশ্চাতে যে প্রত্যক্ষ সমাধান আছে, এ বিশ্বাস বিংশ শতাব্দীর নয়। বলাকার পূর্ব্বে কবি হয়তো এমন একটা সমাধানে পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এখানে তাহা নাই; মনোরম সমাধানের অপেক্ষা নিষ্ঠুর সত্য অনেক শ্রেষ্ঠ। কোন তত্ত্ব নাই বটে, কিন্তু আশা আছে। সে আশা অত্যন্ত স্বাভাবিক—এই প্রলয়ের অন্ত আছে, এই সমুদ্রের কূল আছে, এই সূচীভেদ্য অন্ধকারের পারেও নূতন উষার স্বর্ণদ্বার আছে।

তা যদি না থাকিবে তবে এত দুঃখ এত প্রাণদান,

বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা? [৩৭ সংখ্যক]

এই অপরিহার্য্য আশাতেই যুগান্তরের সমস্ত মৃত্যুবেদনার অগ্রিম সার্থকতা। এই রকম একটা অস্পষ্ট আশাতেই মানুষের পরম আশ্রয়। এই কবিতায় পুরাতন যুগের বিসর্জ্জনের গান। কিন্তু কবি শুধু বিসর্জ্জনের সঙ্গীত গাহেন নাই; আবাহনও করিয়াছেন। নূতন বর্ষের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত এই কবিতাটিতে নবযুগের প্রতীক স্বরূপ নববর্ষকে পরম-বিশ্বাসে অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। পুরাতন যুগে বহু পাপ সঞ্চিত, কিন্তু তাই বলিয়া নবযুগও আরামের নহে।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
এসেছে নিষ্ঠুর—
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর
হোক রে মদের পাত্র চূর।

৩৭ সংখ্যকে নবযুগের উপকূল আভাসে মাত্র চোখে পড়িয়াছে; এখানেও নবযুগ সম্পূর্ণরূপে অজানা; কিন্তু তবু তাহার প্রতি নির্ভীক নির্ভর।

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধর তার পাণি;—
জ্বলিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী। [৪৬ সংখ্যক]

ইহা কোন সুপরিস্ফুট, সুপ্রত্যক্ষ তত্ত্বলোক নহে। আগের কবিতাটির মত ইহাতে বুকফাটা ক্রন্দন নাই; কাব্যাংশে ইহা আগেরটির অপেক্ষা নিকৃষ্ট—দুটিতে মিলিয়া ইহারা পূর্ণ।

৩

এবারে যে চারটি কবিতা আলোচনা কবিতে যাইতেছি, ইহারাও বসন্তের বা যৌবনের কবিতা; কিন্তু ইহাদের সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। আগের কবিতাগুলি মানব-জীবনের যৌবনের কথা, এগুলিতে ব্যক্তিগত জীবনের যৌবন। মানবজীবনের ধারা অনাদ্যন্ত, তার যৌবনও অফুরন্ত, তার সুর আশার এবং উৎসাহের। ব্যক্তিগত যৌবনের সীমা আছে, বিগত যৌবনের স্মৃতি প্রাণে যে ঝঙ্কার তোলে তাহা করুণার।

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস;

আকস্মিক এই বসন্তের মধ্যে একটি নিগূঢ় দ্বন্দ্বরস আছে। বাহিরে পাতা-ঝরা পৌষের বনভূমি, অন্তরে কবির বিগত-যৌবন জীবন; বাহিরে বসন্তের মাতাল বাতাস, অন্তরে ভুলে-যাওয়া যৌবনের সঙ্গীতের ইঙ্গিত! সেই সঙ্গীতের ইঙ্গিতে কি বার্তা?

লিখেচে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।

* * * *

লিখেচে সে—
এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে'
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার।

* * * *

শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার—
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার। [১৩ সংখ্যক]

ইহা পার্থিব যৌবন নহে—সেই যৌবনের আদর্শায়িত মূর্ত্তি। ঘটনায় যাহা একদিন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে. ভাবনায় তাকে রূপদানের প্রয়াস। এ রূপ আদর্শ রূপ। যে আনন্দ এ জীবনে আর পাইবার নহে, তাহাকে চিরকালের কোঠায় স্থাপন করিয়া আশার সৃষ্টি। কিন্তু এ আশার মধ্যে উল্লাসের অপেক্ষা করুণার ভাগ অনেক বেশী।

এই করুণার ভাবটি সম্পূর্ণ অবিমিশ্রভাবে নীচের কবিতাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আগের কবিতাটিতে যৌবনকে আদর্শায়িত করিবার চেষ্টা ছিল, কিন্তু এখানে তেমন কোন প্রয়াস নাই—শুধু সুখের স্মৃতিকে একটি করুণ চিত্রে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা। যে বসন্ত একদিন বর্ণে গন্ধে সঙ্গীতে কবির চিত্তকে মুখর করিয়া রাখিত—

সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জ্জনে ;
অনিমেষে—
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্চ্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে। [২৫ সংখ্যক]

ইহা চিত্র মাত্র, অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ চঞ্চল তাহাকে অচঞ্চল রেখার কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখা। এ যেন সেই প্রিয়জনের প্রতিকৃতি, একদিন যে প্রাণের সজীবতায় গৃহখানি চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল। এ যৌবন আর কিছুই করে না, কেবল যেখানে শ্যামশ্রী নীলিমায় মিশিয়াছে সেই অতি দূর অতীত জীবনের দিগন্তের দিকে করুণ নেত্রের অব্যক্ত ইঙ্গিত হানিয়া বসিয়া থাকে। এমন করুণায় পূর্ণ সংহত অনবদ্য একশ্লোক কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও অল্পই আছে।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের সহিত বসন্তের এই প্রথম পদাতিকগুলির দ্বন্দ্ব বড় করুণ। ইহারা ফাল্গুনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া অকস্মাৎ আসে এবং অজস্র ঝরিয়া যায়, তবু ইহাদের ভয় ভাবনা নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের যৌবনকে এমন অকাতরে খরচ করিয়া ফেলা যায় না। তার তহবিল সীমাবদ্ধ।

রাত না হ'তে পথের শেষে পৌছবি কোন্ মর্তে ?
যা ছিল তোর কেঁদে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে। [২১ সংখ্যক]

নিজের জীবনের শক্তির অপ্রাচুর্য্যের সহিত তুলনা করিয়া কবির মনে যেন একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষ্যার ভাবের উদয় হইয়াছে, ব্যক্তিগত জীবনের সহিত ইহার অমিল হইলেও মানবজীবনের যৌবনের ইহারা প্রতীক এই 'পাগল চাঁপা এবং উন্মত্ত বকুল'। মানবজীবনের প্রবাহ অনন্ত, আর ইহারাও অফুরান।

২৬ সংখ্যক কবিতাটির প্রথম শ্লোকে বর্ত্তমান জীবনের বিগত যৌবনের বেদনা আর দ্বিতীয় শ্লোকে আগামী জীবনে পুনরায় সেই যৌবনকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কবিতার বিষয়-বস্তু বাহ্যতঃ এক হইলেও বস্তুতঃ ভিন্ন। প্রথম পর্য্যায়ে কবি 'সুখ দুঃখ বিরহ মিলন পূর্ণ' অসম্পূর্ণ মানবজীবনের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তাঁহার মনে 'সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল', সেই প্রবলতার বেগ তাঁহাকে ভবিষ্যতের দিকে, জীবন হইতে জীবনান্তরের দিকে এবং অতীতে লইয়া গিয়াছে। প্রথম পর্য্যায়ে কবির লক্ষ্য মানবসমাজ, তাই নিজে সেখানে উহ্য; দ্বিতীয়ে নিজের জীবন লক্ষ্য, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান কাল নহে, নিরুদ্দিষ্ট অতীত ও ভবিষ্যৎ, যাহা বিগত যৌবনের সূর্য্যাস্ত-আভার সৌন্দর্য্যে অপরূপ।

৪

এখন যে কবিতাগুলি আলোচনা করিতে যাইতেছি তাহাদিগকে 'বলাকার' কেন্দ্র-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ৩৬ সংখ্যক কবিতাটি বলাকার উপরে লিখিত এবং

এই কবিতাটির নাম-অনুসারে কাব্যখানির নাম বলাকা। এ কবিতাটির রচনার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা কবির মুখ হইতে শোনা যাক।

"এই কবিতা শ্রীনগরে থাকতে লিখি, তখন আমি সেখানে ঝিলম নদীতে বোটে থাকতুম। একদিন সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে ঝিলমের জলে অন্ধকার নেমে আসছে। আমি ছাদে বসে আছি। ওপারে অন্ধকার জমাট হয়ে আসছে, নদীর স্রোত কালো হ'য়ে গেছে, চারিদিকে কোনো শব্দ নেই, এমন সময়ে বুনো হাঁসের দল হঠাৎ মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। পদ্মাবক্ষে বাসকালে আকাশে হাঁসের ঝাপট অনেকবার অট্টহাস্যের মত হাহা ক'রে চমক লাগিয়ে দিয়ে গেছে।

"বলাকা বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার মর্ম্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হ'য়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং বলাকা বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীই নানা আকারে ব্যক্ত হ'য়েছে।" [শা. প., ১৩৩০]

এই ত গেল ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার কথা। কবিতাটি-সম্বন্ধে কবি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সাহায্য লওয়া যাক।

"প্রকৃতিতে দেখলুম যে পর্ব্বত অরণ্য স্তব্ধ হ'য়ে নেই, তারা চলেছে। তেমনি মানুষের যত আকাঙ্ক্ষা-কামনা-ভাবনা তারাও লোকালয়ের তীরে তীরে এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীতে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি কবিতাতেও এই ভাব ছিল। কোন্ অনাদি অতীতে মানুষের চিত্তনীড়ে এই ভাবনা কামনার জন্ম হয়েছে। কিন্তু তারা সেই আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ভাবী কালের বাসা কোথায় জানি না, কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে মানুষের চেষ্টা বাণী ইচ্ছা চিন্তা কর্ম্মস্রোত দলে দলে আকাশ পূর্ণ করে চলেছে। মানুষের এই যে অপূর্ণ অশ্রুতবাণী অতীত হতে যাত্রা করে চলেছে, আমি শুনলুম তারা যেন বলাকার পাখার শব্দে জাগ্রৎ হ'য়ে উঠেছে।

"আমার অন্তরের ভিতরেও প্রবেশ করে দেখলুম যে আমার মনের বাসাছাড়া পাখী আলো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অবিশ্রাম চলেছে—যা কিছু গতিশীল, যা কিছু উড়ে চলেছে তাদের সহযাত্রী হ'য়ে, অসংখ্য পাখীদের সঙ্গে সঙ্গে। এরা কোন্ দিকে চলেছে জানি না, কিন্তু আমি বসে বসে নিখিলের এই পাখার ঝাপট শুনছি।

সমস্ত আকাশ পাখার এই বাণীতে ভরে গেছে—'এখানে নয়, এখানে নয়, এ বাসায় থেমে থাকবার নয়, আরেক জায়গায় যেতে হবে।' আমার বলাকা চারিদিকে নিখিলের এই বাণী শুনতে পাচ্ছে।" [শা. প., ১৩৩০]

তত্ত্বাংশের কথা ছাড়িয়া দিলেও কাব্যাংশে এ কবিতাটি উৎকৃষ্ট—সকলেই ইহাকে রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করেন। বস্তুতঃ ইহা প্রায় অনবদ্য, কেবল শেষের শ্লোকটি যেন একটু হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে, মনে হয়, কবি তাঁহার নবলব্ধ অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে ধীরে সুস্থে আকার দিতে ভীত হইয়াছেন পাছে তাহার রঙ ফিকা হইয়া যায়।

প্রথম শ্লোকে ঘনায়মান অন্ধকারে হিমালয়ের বর্ণনা। ইহাতে তিনটি উপমা আছে, তিনটিই সত্যের অনভিভাবিত এক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। বিশেষ, তিমিরাচ্ছন্ন দেওদার বনের উপমাটি অদ্ভুত সত্যরূপে কল্পনাকে অধিকার করে।

দ্বিতীয় শ্লোকে হংস-বলাকার অকস্মাৎ অলৌকিক পক্ষ-সঞ্চালনের শব্দ। 'শব্দের বিদ্যুৎছটা' বলিয়া এই অপ্রত্যাশিত শব্দের আকস্মিকতা ও তীব্রগতিকে নূতন জীবন দান করা হইয়াছে।

তৃতীয় শ্লোকের প্রথম তিনটি ছত্রে হিমালয়-সম্বন্ধে আমাদের পৌরাণিক যাবতীয় ধারণাকে ঠাসিয়া ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ শ্লোকে ওই পাখার শব্দে উন্মনা হিমালয়ের অবস্থা। এ পর্য্যন্ত কেবল বাহ্যব্যাপারের বর্ণনা, কবি স্বয়ং ইহার মধ্যে নাই।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে কবির আত্মরস। ঢেউ যেমন একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, পাখার উতলা ভাবও তেমনি ক্রম-বিস্তার্য্যমাণ; বহির্বিশ্বকে ছাড়াইয়া তাহা কবিকে আক্রমণ করিল; তখন বিশ্বের গতি-চেষ্টাকে কবি উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু ইহাও বাহিরের। ক্রমে মানুষের অন্তর্লোকের মানস-যাত্রার অসহ্য আকুতি এবং চরম মুহূর্ত্তে নিজের আত্মার অজ্ঞাত-যাত্রার ক্রন্দন।

এ কবিতাটির মূলে একটি ক্ষণস্থায়ী অলৌকিক অভিজ্ঞতা এবং সেই আলোতে বিশ্বের নূতন রূপ দর্শন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে বিশ্বের নূতন সৃষ্টি। ইহার বিপরীত প্রণালী দেখিতে পাইব 'চঞ্চলা' কবিতায়। তাহাতে নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা আছে। বিশ্বকে একটি বিশেষ তত্ত্বরূপে, একটি চিন্তাপ্রণালীরূপে দেখিবার প্রয়াস, এবং নিজেকে সেই বৃহৎ বিশ্বব্যাপারের অঙ্গাঙ্গিভাবে দর্শন।

'চঞ্চলা' কবিতায় সমগ্র বস্তুবিশ্বকে একটি চঞ্চল সদা প্রবহমাণ নদী বলিয়া মনে করা হইয়াছে।

হে বিরাট্ নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।

কিন্তু নদীর উপমা প্রকৃতপক্ষে অচল, কারণ নদীর আদি আছে, অন্ত আছে, উদ্দেশ্যরূপী সমুদ্র আছে; এবং তার নির্দ্দিষ্ট কূল আছে। এই কাল বিশ্বপ্রবাহের আদি নাই, অন্ত নাই, উদ্দেশ্য নাই, কোনো [illegible] নাই— [illegible] জন্যই তার চলা। কবিতাটির নাম পূর্ব্বে নদী ছিল, কিন্তু নামের অসার্থকতা বুঝিয়া ইহার চঞ্চলা নামকরণ হইয়াছে। এই নির্গুণ প্রবাহকে আমাদের বস্তুস্পর্শী কল্পনা ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে না। নদীর গতিটাকে যদি কোনো কৌশলে নদীর বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া কল্পনা করা যায় তবেই কতকটা ইহার রূপ বোঝা যাইতে পারে।

কিন্তু এই অবাস্তব চঞ্চলতা হইতে বস্তুর উদ্ভব কেমন করিয়া হইল? দার্শনিকেরা ইহার সদুত্তর দিতে পারেন না। তাঁহারা এই অবাস্তব ব্যাপারকে বুঝাইতে বাস্তব উপমা গ্রহণ করেন; না করিলেও নিরুপায়। নদীর চঞ্চল স্রোত চলিয়া যাইবার সময়ে যে পলিমাটি পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া যায় এই অবাস্তব গতি-বিশ্ব হইতে বস্তুর উদ্ভবও অনেকটা [illegible] বস্তু-বিশ্বটাকেই [illegible] একমাত্র বলিয়া গ্রহণ করে, আর আসল [illegible] মনোযোগ এড়াইয়া ফাঁকি দিয়া যায়। যাঁহারা পদ্মার তীব্র স্রোত লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, সে স্রোতকে প্রত্যক্ষ দেখিবার উপায় নাই। তীব্র গতিশীল ফেনপুঞ্জ বা নৌকাদ্বারা উহার প্রচণ্ড গতিকে বোঝা যায়। অনভিজ্ঞের কাছে স্রোতের অপেক্ষা ফেনপুঞ্জ সত্যতর, কারণ তাহা প্রত্যক্ষতর। এই গতিমাত্ররূপ বিশ্ব, তেমনি আমাদের দৃষ্টিকে এড়াইয়া যায়, কেবল আমরা দেখিতে পাই—

ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্বুদের মত।

রবীন্দ্রনাথের এই তত্ত্বে ও বের্গসঁর কাল-বিশ্ব তত্ত্বে অনেকটা ঐক্য আছে, কিন্তু এ দুটি সর্ব্বতোভাবে এক নহে। অবশ্য এ কবিতাটিতে তেমন অনৈক্য ধরা পড়িবে না, ১৬ সংখ্যক কবিতা আলোচনার সময়ে আমরা উভয়ের প্রভেদ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কবি এই বিশ্বপ্রবাহকে প্রথমে নদী বলিয়াছেন, তারপরে ভৈরবী এবং বৈরাগিণী। ভৈরবী এবং বৈরাগিণী-দ্বারা ইহার নিরুদ্দিষ্ট ঘরছাড়া এবং আসক্তিহীনতার ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন। এই তিনটি শব্দে ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্ত্তমানের তিনটি অবস্থাকে সূচনা করে; ভবিষ্যৎ নিরুদ্দিষ্ট, অতীতে ঘরছাড়া হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানের কোন আসক্তি এই ভৈরবী ও বৈরাগিণীর নাই।

কিন্তু—

উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা, ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;—
* * * *
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;

ভৈরবী এবং বৈরাগিণীর সঙ্গে মণিহারের এবং বিদ্যুৎপ্রভ কর্ণাভরণের অসঙ্গতি অত্যন্ত স্পষ্ট।

গতি যাহার ধর্ম্ম, সে যদি কোনো মুহূর্ত্তে স্বধর্ম্মচ্যুত হয়, তবে সে বস্তুবিশ্বের দ্বারা অবরুদ্ধ-শ্বাস হইয়া উঠিবে। প্রকৃতপক্ষে, গতির পটভূমিতেই এখানে বস্তুর আবির্ভাব, সেই গতি যদি অন্তর্হিত হয়, তবে বস্তু আপন অসামঞ্জস্যের দ্বারা বিশ্বের শান্তি নষ্ট করে।

কবি ইহাকে নটী এবং চঞ্চল অপ্সরী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই নৃত্যধর্ম্মী অপ্সরীর গতিপ্রবাহ অব্যাহত থাকিয়া বিশ্বে নূতন প্রাণের স্থান করিয়া দিতেছে। এই পর্য্যন্ত কবিতাটির একটা ভাগ।

দ্বিতীয় ভাগে কবির আত্মলোকের অভিজ্ঞতা। এই বিশ্বপ্রবাহের স্রোতে প্লবমান কবির আত্মার চঞ্চলতার অভিজ্ঞতা। এই চঞ্চলতাকে আমরা সব সময়ে অনুভব করিতে পারি না। ধী-শক্তি-দ্বারা আমরা বস্তু-বিশ্বকে বুঝিতে পারি বটে, বিজ্ঞান এখানে আমাদের কর্ণধার।

কিন্তু এই বস্তু-বিশ্ব মুখ্য নহে। গতি-বিশ্বকে বুঝিবার পক্ষে ধী-শক্তি নিতান্ত নাবালক, শুধু তাহাই নহে, ধী-শক্তি ও গতি-বিশ্ব দুই বিভিন্ন সুরে বাঁধা, একটির

দ্বারা অন্যটির রহস্যোদ্‌ঘাটন অসম্ভব। ধী আমাদের মানসিক অস্তিত্বের একাংশ মাত্র; সমগ্র অস্তিত্ব যদি এই বিশ্বপ্রবাহের সহিত কোনোরূপে মিশাইয়া দিতে পারি, তবেই ইহার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি সম্ভব। ইহা কবি ও যোগীর ক্ষেত্র, বিজ্ঞানের নহে। অতিলৌকিক অনুপ্রেরণায় জীবনে এমন মুহূর্ত্ত দু'একবার মাত্র আসে।

কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে এমনি একটি অলৌকিক অনুপ্রেরণা কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বিশ্ব-চাঞ্চল্যের পদধ্বনি নিজের মর্ম্মে শুনিয়া সমগ্রের সহিত নিজের একাত্মকতার কথা, অতীতের অভিজ্ঞতার কথা এবং ভবিষ্যতের প্রবল আকর্ষণের কথা কবির মনে তত্ত্বরূপে নয়, সত্যরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কার-মুখরা এই ভুবন মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা। [চঞ্চলা]

এই তিনটি ছত্রে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার যে অদ্ভুত ছন্দঃস্পন্দ ধরা পড়িয়াছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যেও তাহা একান্ত বিরল।

এই কবিতাতেও আগের ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। তবে তাহা চঞ্চলার মত সম্পূর্ণতা ও কাব্যসার্থকতা প্রাপ্ত হয় নাই—সেই জন্য ইহার মূল্য সেই পরিমাণে কম।

[১৮ সংখ্যক]

এই কবিতাটিতে কবির গতি-তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ; 'চঞ্চলা'তে কেবল গতিকেই দেখিয়াছি; তাহা একাংশ মাত্র; সে জায়গায় বের্গসঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐক্য। ঐ কবিতায় গতি-তত্ত্বের অপরার্দ্ধ: এখানে বের্গসঁর সঙ্গে কবির অনৈক্য। [১৬ সংখ্যক]

"কবির মতে চরম সত্য গতির মধ্যে পাওয়া যায় না। এইখানে কবির সহিত বের্গসঁর প্রভেদ। বের্গসঁ সত্যে গতি ছাড়া আর কিছুই পান না, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সত্যের আর একটি মূর্ত্তি দেন, যাহা গতির পশ্চাতে; এবং গতির ঊর্দ্ধে।

"কবি বলেন গতি বাসনার মত: ইহা অতৃপ্ত। গতিকে চরম বলিলে, বলিতে হয় যে, বাসনা কেবল বাসনাই থাকিবে, তাহা তৃপ্তিতে কখনো পৌঁছিবে না। কিন্তু সংসারে ঠিক ইহার উল্টা দেখি। বাসনা তাহার তৃপ্তির জন্য লালায়িত, কামনা তাহার কাম্যবস্তুর দিকে নিরন্তর ধাবিত।

"অরূপ যতক্ষণ না রূপ পায়, ততক্ষণ ইহার সত্তা ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না। বাসনা যখন কেবল বাসনা থাকে, ততক্ষণ ইহার সত্যে ইহা উপনীত হয় না। গতিবাদীরা ইহা ভুলিয়া যান। তাঁহারা পূর্ণ সত্যের রূপ দেখিতে চাহেন না।

কেবল তাহার একটা দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা সত্যের কেবল কঠোর মূর্ত্তিই দেখিতে পান, ইহার ভিতরে যে শান্তি, যে তৃপ্তি আছে তাহা তাঁহাদের একেবারেই বোধগম্য হয় না।" [জয়ন্তী উৎসব ; ধর্ম্মতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ ; শ্রীশিশির কুমার মৈত্র]

কবির এই গতি-স্থিতি তত্ত্বটি জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ; এই সার্ব্বভৌমিকতাই ইহার সত্যতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

অরূপ ভগবান্ অতৃপ্ত ; কিন্তু তিনি সীমায় সংহত হইয়া রূপ পাইবার চেষ্টা করিতেছেন মানুষের সীমাবদ্ধ কল্পনায় ও হৃদয়ে স্থান পাইবার জন্ত তাঁহার ব্যাকুলতার অন্ত নাই। বস্তুতঃ যখন তিনি অসীম, তখন তিনি একা, তখন তিনি নাস্তি বলিলেই হয়। মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তির মধ্যেই তাঁর পূর্ণতা। সীমা অসীমের দর্পণ। [দ্রষ্টব্য ২৯, ৩১, ৩৩]

শিল্পের ক্ষেত্রেও এ তত্ত্ব সমানভাবে সার্থক। শিল্পীর চিত্তে বহির্জগৎ যে আন্দোলন তোলে, যে বাসনার ব্যাকুলতা জাগ্রৎ করিয়া দেয় তাহার বেগ যতই প্রচণ্ড হ'ক, তা নিরর্থক, কেন না, রূপ পাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যান্ত তাহা অসম্পূর্ণ। কিন্তু যখন সেই বাসনার গতিবেগ রূপ লাভ করিল, তখন সেই সৃষ্টি শিল্পীকে অতিক্রম করিয়া যায়। তাহার ব্যক্তিগত তুচ্ছতা হইতে সে মুক্ত হইয়া সে সার্থক শিল্পের অমর জীবন লাভ করে। গতি রূপের মধ্যে, বাসনা তৃপ্তির মধ্যে আশ্রয় খুঁজিয়া পায়। [দ্রষ্টব্য ছবি, তাজমহল, ৯, ১৬]

মানুষের ইতিহাসেও এই সত্য কাজ করিতেছে। নানা জীবনের প্রবাহ, নানা বিরুদ্ধ আইডিয়ার সংঘাত, এবং নানা কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দ্বন্দ্ব, মানুষকে নিরন্তর একটা সামাজিক, রাষ্ট্রিক লক্ষ্যের দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহার গতি সব সময়ে প্রত্যক্ষ নয়, কারণ ব্যাপারটা বৃহৎ এবং জটিল। একটা সভ্যতা যখন তাহার আদর্শে উপনীত হয় তখন তাহার বিনষ্টি। আদর্শের চরিতার্থতা লাভেই সভ্যতার বিনাশ, আদর্শের নিষ্ফলতায় নয়। কারণ যতক্ষণ নিষ্ফলতা আছে, ততক্ষণ তাহাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা আছে ; এই প্রয়াসেই ইতিহাসের রহস্য। মানুষের ইতিহাসে বিচিত্র 'এক্সপেরিমেণ্ট' চলিতেছে ; ইতিহাসের বিধাতা মানুষের এক্সপেরিমেণ্টের সার্থকতা সহ্য করিতে পারেন না ; যেই একটার সার্থকতা ঘটিল, অমনি আবার সেই উপাদানকে তিনি নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজেন ; নূতনতর বাধার সহিত আবার তাহাদের লড়াই করিতে হয়। প্রাচীন ইতিহাসে যে সব জাতি সভ্যতার উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই যে এখন দুর্দ্দশা ইহাই তাহার কারণ। গ্রীস, ভারতবর্ষ, চীন—সকলকেই বিধাতা নূতন ছাঁচে আবার ঢালিয়াছেন—এখন

তাহাদের লড়াইয়ের পালা [দ্রষ্টব্য সবুজের অভিযান, সর্ব্বনেশে, আহ্বান, শঙ্খ, পাড়ি, ৩৭, ৪৫, ৪৬]

৫

এই পর্য্যায়ে তিনটি কবিতা ছবি, শা-জাহান ও ৯ সংখ্যক [তাজমহল]। এক হিসাবে ইহাদের বিষয়-বস্তু এক ও অন্যান্য কবিতা হইতে স্বতন্ত্র। ইহাদের বিষয়-বস্তু আর্টের সামগ্রী। একখানি চিত্র ও তাজমহল; আর্টের সামগ্রীরূপে ইহারা প্রত্যক্ষ জীবন হইতে বিশ্লিষ্ট।

চিত্রখানা স্তব্ধ; বিশ্ব চঞ্চল; গতিশীল বিশ্বের পটভূমিতে নিস্তব্ধ ছবিখানাকে নির্জীব বলিয়া মনে হয়। চঞ্চলতা বিশ্বের ধর্ম্ম কারণ তাহা রূপকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে; তাহা মনের বাসনার মত। যতক্ষণ না সে রূপ লাভ করিতেছে ততক্ষণ তাহার তৃপ্তি নাই, আর্টের সামগ্রী নিস্তব্ধ কারণ বাসনা তাহাতে রূপ পাইয়াছে।

চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি ;—
সেই তো নগরী।
এ তো শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর। [১৬ সংখ্যক]

চিত্তের চেষ্টা যেমন নগরীরূপে সীমায় সংহত হইয়া শান্তভাবে দেখা দেয় তেমনি এই রেখাবদ্ধ চিত্রখানিতে শিল্পীর মনের একটি বাসনা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার অচলতা বিশ্বের চঞ্চলতার সহিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কিন্তু চঞ্চলতা একটা অবস্থা মাত্র তাহা পরিণাম নহে; তাহার পরিণতি পূর্ণতায়—যে পূর্ণতা শান্ত, তৃপ্ত. রূপবান্ ভাবে দেখা দেয়, এখানে সে পূর্ণতা আর্টের সার্থকতা।

কবিতাটির প্রথম অংশে কবি চিত্রখানাকে নিস্তব্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু শেষ অংশে তাঁহার এই উক্তিকে কথঞ্চিৎ অস্বীকার করিয়াছেন—

কী প্রলাপ কহে কবি ?
তুমি ছবি ?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি। [ছবি]

আর্টের এই পূর্ণতা কি জীবন হইতে স্বতন্ত্র না তাহার সহিত বিশ্বের নাড়ির

কোনো যোগ আছে? আছে বই কি! সে যোগ বর্ত্তমান অবস্থার নহে, চরম উদ্দেশ্যের। আর্টের সামগ্রী যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, বিশ্বের সমস্ত পদার্থই তো সেই পূর্ণতার, সেই রূপের সাধনা করিতেছে। এইখানে, বিশ্বের ও আর্টের পরিণামের ঐক্য। বিশ্ব তাহা এখনো লাভ করে নাই বলিয়া চঞ্চল, কিন্তু তাই বলিয়া যে-পরিণামকে সে অনুসন্ধান করিয়া মরিতেছে, আর্টের মধ্যে তাহাকে কি করিয়া সে অস্বীকার করে? এই যোগ আছে বলিয়াই বিশ্ব ও আর্ট, আপাতদৃষ্টিতে শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, আমাদিগকে একটি অন্যুটির আনন্দ দান করে।

তোমার চিকণ
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হ'তে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্ম্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হ'ত স্বপনের। [ছবি]

এ ক'টি ছত্রের তত্ত্বের কথা বাদ দিলেও ছন্দঃস্পন্দের সৌন্দর্য্যের জন্য ইহা অতুলনীয়।

এ কবিতাটির নাম পূর্ব্বে তাজমহল ছিল, পরে শা-জাহান হওয়াতে ইহা যথার্থ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ইহাতে আর্টের পূর্ণতার সহিত জীবনের মহত্তর অপূর্ণতার দ্বন্দ্ব। বস্তু যেমন রূপের সাধনা করিতেছে, জীবনও তেমনি রূপের সাধক। বস্তুর সাধনা সহজ; জীবনের সাধনা দুরূহ। তাজমহলের শিল্পীর মনের অব্যক্ত বাসনা শ্বেতপ্রস্তরে ও মণিমাণিক্যে তাজমহল-রূপে পূর্ণতা লাভ করিল। কিন্তু স্বয়ং শিল্পীর জীবনে যে পূর্ণতার চরম রূপের আকাঙ্ক্ষা তাহা তত সহজে সফল হইবার নহে, তাহার জন্য বহুজীবনের অভিজ্ঞতা-চক্রের প্রয়োজন। সে জন্য তাজমহল সম্পূর্ণ কিন্তু শা-জাহান অপূর্ণ; তাজমহল সম্পূর্ণ বলিয়াই তাহা প্রত্যক্ষরূপে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু শা-জাহান জীবন-রূপের আকাঙ্ক্ষায় তাজমহলকে অতিক্রম করিয়া জীবনান্তরে চলিয়া গিয়াছে। জীবনের এই ক্রিয়া অতীতেও ছিল—

মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া

চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হ'তে প্রাণে। [চঞ্চলা]

ভবিষ্যতেও আছে :—

জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে—
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন। [শা-জাহান]

'ছবি'তে দেখিলাম চঞ্চল বিশ্বের পটভূমিতে আর্টের পূর্ণতার সার্থকতা। 'শা-জাহান' আর্টের পূর্ণতার পটভূমিতে জীবনের বৃহত্তর পূর্ণতার সাধনার চঞ্চলতা। বিশ্বের পূর্ণতা সহজ, আর্টের পূর্ণতা দুরূহ, জীবনের পূর্ণতার কোনো ইয়ত্তা এক জীবনে পাওয়া যায় না।

তত্ত্ব-হিসাবে কবিতাটি বড়; কাব্য-হিসাবে তদধিক। প্রথম শ্লোকের সুদীর্ঘ ছত্রগুলিতে, বৃহৎ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত পদে তাজমহলের গঠন-প্রণালীর দৃঢ়তার আভাস পাওয়া যায়। তাজের নিম্নতম স্তরে বৈশিষ্ট্যহীন ওজন-সর্ব্বস্ব শ্বেতপাথরের স্তর; তদুপরি মণি-মাণিক্যে বিচিত্রবর্ণ কারুকার্য্য; সর্ব্বোপরি নির্ম্মল উজ্জ্বল সরল একটি স্বচ্ছ শুভ্র মর্ম্মরের গোলক। প্রথম শ্লোকের পদবিন্যাসে এই পর্য্যায়টি লক্ষিত হয়।

প্রথম দুটি ছত্র অত্যন্ত সাধারণভাবে আরম্ভ হইয়াছে, গাম্ভীর্য্য ব্যতীত কোনো ঐশ্বর্য্য ইহাদের নাই। তৃতীয় চতুর্থ ছত্রও বৈশিষ্ট্যহীন। তাজমহলের ইহা নিম্নতম স্তর।

তারপরে :—

সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন

ছত্রে সূর্য্যাস্ত-সুলভ নানা বর্ণের আভাসে নানা রঙের পাথরের আভাস, তাজের উপরিতন স্তরের পরিচয় দিতেছে। শুধু তাহাই নহে, সন্ধ্যার ইঙ্গিতে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট একটি জীবন-সন্ধ্যারও ধ্বনি।

ইহার পরে রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের পরিচয়—

হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা—

হইতে বুঝিতে পারি শা-জাহান রাজভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিতে কার্পণ্য করেন নাই। কেন তিনি কার্পণ্য করিবেন? প্রথম ছত্রেই বলা হইয়াছে, "ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান," ভারতবর্ষের সম্রাট্ যে শুধু ভারতের ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, ভারতের মর্ম্মবাণীও আয়ত্ত করিয়াছেন, সে বাণী কি? না—

কালস্রোতে ভেসে যায়, জীবন যৌবন ধন মান।

সর্ব্বোচ্চ সুরে—

এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

স্বচ্ছ শুভ্র একটি মর্ম্মর গোলক, একবিন্দু অশ্রুর মত। ইহাতে আর পাথরের ভার নাই, বর্ণ-বৈচিত্র্য নাই, রত্ন ঐশ্বর্য্য নাই—সরল হ্রস্ব একটি ছত্র।

প্রথম শ্লোকে কবি তাজমহলকে আভাসে পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে শঙ্কিত-মানব-হৃদয়ের বর্ণনা। তৃতীয় শ্লোকে শা-জাহানের শঙ্কিত মানসিক অবস্থা। চতুর্থ ও পঞ্চমে কালকে জয় করিবার জন্য শা-জাহানের ব্যাকুলতা। ষষ্ঠ শ্লোকে সম্রাটের অধুনা-লুপ্ত সাম্রাজ্য-গৌরবের তুচ্ছতার সহিত তাঁহার সৃষ্টির সার্থকতার দ্বন্দ্ব। সপ্তম শ্লোকে খানিকটা পরিমাণে পূর্ব্বতন স্বীকৃতিকে অস্বীকার এবং আর্টের সৃষ্টির পূর্ণতার সহিত আর্টিষ্টের জীবনের মহৎ অপূর্ণতার আভাস—

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্ব্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে। [শা-জাহান]

এ কবিতাটিতে তাজের আর এক রূপ। শাজাহান এবং মমতাজ এখানে প্রধান নয়; তাঁহারা তাঁহাদের সৃষ্টির অন্তরালে পড়িয়াছেন; ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ বিশ্বগত

হইয়া সকলের ধন হইয়া উঠিয়াছে। আর্টের বিশ্বজনীনতা ব্যক্তিগত শোককে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া পৃথিবীর সকলের সান্ত্বনার সম্পদ্ করিয়া তুলিয়াছে। এখানে আর্টের পূর্ণতাকে জীবনের মহৎ অপূর্ণতার অপেক্ষা বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। [৯ সংখ্যক]

৬

এই পর্য্যায়ের কবিতাগুলিকে আবার তিনটি উপ-বিভাগে ভাগ করা চলে। একদিকে জগৎ, আর একদিকে কবি ; দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা, কিন্তু তবু তো ইহাদের মধ্যে যাতায়াতের পথ আছে, একজন আর একটিকে আপন করিয়া লইতেছে। এ কেমন করিয়া সম্ভব ! জগৎ ও মানুষের মিলনের ঘটক—প্রেম। মানুষ জগৎকে ভালবাসিয়া আপন করিয়া লয়। [দ্রষ্টব্য ১৭, ২৪, ২৯]

আবার আর একটি অভিজ্ঞতা। ভগবান্ আছেন, জগৎ আছে। ভগবান্ যদি স্বয়ম্পূর্ণ হন, তবে এ সৃষ্টির অর্থ কি ? যাঁহার অভাব নাই, তিনি বিশাল জগৎ সৃষ্টি করিলেন কেন ? তবে কি তাঁহার অভাব আছে ? না, তিনি পূর্ণ, কিন্তু সেই পূর্ণতাকে তিনি একা কেমন করিয়া অনুভব করেন, তাই তিনি মানুষের সৃষ্টি করিয়া, তাহার সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, প্রেমের মধ্য দিয়া, নিজের জগৎকে অনুভব করেন। মানুষ যেন তাঁহার দর্পণ, যাহাতে তিনি নিজের পূর্ণতাকে, ঐশ্বর্য্যকে, নিজেকে প্রত্যক্ষ করেন। [দ্রষ্টব্য ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩]

এই মধ্যস্থতা করিতে গিয়া কবি অনুভব করিতে পান, যে জগৎকে তিনি প্রেমের দ্বারা আপন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা আর বাহিরের বস্তু নয়। সে যেন তাঁহার অন্তরের সৃষ্টি, তাঁহার মানস সরোবরের পদ্ম। [দ্রষ্টব্য ৩৫]

কবি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতা করিতে গিয়া বুঝিতে পারেন* যে, তাঁহার অন্তর্লোক ও বহির্লোকের মধ্যেও মিল আছে, দুই যেন এক ধাতুতে গড়া, নহিলে একটি হইতে এত সহজে আর একটিতে যাতায়াতের পথ পাওয়া যাইত না। বনের মাধবী ও মনের আনন্দ একই বৃন্তে প্রস্ফুটিত। [দ্রষ্টব্য ১৪]

এ কবিতাটিতে বহিঃ ও অন্তঃর ঐক্য আরো ব্যাপক ও গভীর ভাবে ধরা পড়িয়াছে। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে শুধু ঐক্য নয়, ইহারা এখন এক। [৩৫ সংখ্যক]

কবিতা সংখ্যা ৩৪, ৪০, ৪১ (৪২) * এ তিনটিকে আমরা বর্ত্তমান পর্য্যায়ভুক্ত বলিতে পারি। উক্ত ভাবটিকেই বৃন্ত করিয়া ইহাদের বিকাশ—ইহাদের বিষয়ে বিশেষ নূতন কিছু বলিবার নাই।

* ৪২ সংখ্যক কবিতাটি আসলে ৪১ সংখ্যক হইবে। ৪০এর পরেই ৪২ বসিয়াছে ; কাজেই বলাকাতে মোট কবিতা ৪৫টি—৪৬টি নয়।

৭

১০, ১১, ১২, ৪৩ সংখ্যক কবিতাগুলিতে মানুষের অপেক্ষা ভগবানের কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্য্যায়ের কবিতাগুলি কাব্যরূপের হিসাবে বলাকার অন্তর্গত, অভিজ্ঞতায় ইহারা গীতাঞ্জলি পর্ব্বের। বলাকার অন্যান্য কবিতায় কবির যে প্রবল মানবমুখিতা লক্ষ্য করিয়াছি, এগুলিতে তাহার একান্ত অভাব। ইহারা পাঠককে গীতাঞ্জলির জগতের আভাস দেয়। গীতাঞ্জলির অভিজ্ঞতা যে কবির হৃদয় হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহা যে কবি-হৃদয়ের একটা স্তরে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, এ কবিতাগুলিতে আমরা সেই প্রমাণ পাই।

৮

৩০, ৪৪ সংখ্যক কবিতা দুইটি বলাকার মূল সুরের প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ। নীড়ত্যাগী হাঁসের দল যে অজানার আনন্দে উধাও, সেই অজানার আকর্ষণ এ দুইটি কবিতায়।

৩৮ সংখ্যকও ইহাদের আনুষঙ্গিক। অজানার আকর্ষণে যে নূতনত্বের আনন্দ আছে, চিত্তে কবি যাহা নিয়ত অনুভব করিতেছেন, কবির দেহ তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে। নূতন বসনের বিচিত্র বর্ণে, ছন্দে, তরঙ্গে, ভাঁজে-ভাঁজে দেহ এই আনন্দকে প্রকাশ করে।

৩৯ সংখ্যক কবিতাটি শেক্সপিয়রের ত্রিশতক জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত।

৯

২৩শ সংখ্যক কবিতাটি কি তত্ত্বাংশে কি কাব্যাংশে একটি অনবদ্য সৃষ্টি।

"সৃজনের প্রথম ক্ষণে দুইভাবের নারী অতল অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হয়েছিল। একজন সুন্দরী; তিনি উর্ব্বশী, বিশ্বের কামনা-রাজ্যে আধিপত্য করেন। আর একজন লক্ষ্মী, তিনি কল্যাণী। একজন স্বর্গের অপ্সরী, আর অন্যটি স্বর্গের ঈশ্বরী। একজন হরণ করেন, আর একজন পূরণ করেন।

"একজন তপস্যাকে ভঙ্গ করে দেন। সেই ভাঙনে, যে আলোড়ন জেগে উঠ্‌ছে সে যেন তাঁর উচ্চহাস্য। তিনি সুরাপাত্র নিয়ে দুই হাতে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপের মাদকতাকে আকাশে বাতাসে বিকীর্ণ করে দিয়ে যান।

"তাঁর আগমনে বিশ্ব যেন বসন্তের কিংশুকে গোলাপে ফেটে পড়তে চায়। সমস্তই যেন বাইরের দিকে বিদীর্ণ বিকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যখন হেমন্ত কাল আসে তখন অন্য মূর্ত্তি দেখি। তখন দেখি, তা ফল ফলিয়েছে, আপনাকে

পূর্ণতার ভিতরে সংবৃত করেছে ; তখন বসন্তের আত্মবিস্মৃত অসংযম অন্তরে পরিপাক পেয়ে সফলতায় পরিণত হয়েছে। এক নারী বসন্তের সেই চঞ্চল আবেগকে বাইরের তাপে আন্দোলিত করে দিলেন ; অন্যজন তাকে শিশির-স্নাত করে' অন্তরের মাধুর্য্যে ফলবান্ করে' তুল্লেন। [illegible]

"—হেমন্তকালে যখন ফসল ফল্ল, তখন তার মধ্যে চঞ্চলতা রইল না, সমস্ত স্তব্ধ হল, তার মধ্যে দক্ষিণ বাতাসের মাতামাতি থেমে গেল। হেমন্ত সেই আপনার আত্ত সফলতাটিকে বিশ্বের আশীর্ব্বাদের দিকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরে।

"পুষ্পের মধ্যে প্রাণের প্রকাশের অধৈর্য্য আছে কিন্তু তার এই জীবনের আবেগ তাকে একটি পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে—তাকে মৃত্যুর সীমায় গিয়ে পৌঁছতে হয়—তবেই সে চরম সার্থকতা লাভ করে : ফল পরিপক্ক হয়। জীবন যদি আপনারই সীমা-রেখার মধ্যে পর্য্যাপ্ত হ'ত ; তবে মৃত্যু হঠাৎ এসে তাকে ভয়ানক বিচ্ছেদে নিয়ে যেত এবং মৃত্যু তার একান্ত বিরুদ্ধ হ'ত। কিন্তু মৃত্যুকে যখন একান্ত কল্যাণের দিক্ দিয়ে দেখব তখন বুঝ্ব যে জীবন তার সীমাকে উত্তীর্ণ করে' অমৃতের মধ্যেই প্রবেশ করেছে।

"সীমার মধ্যে এই অনন্তের আভাস সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টির মধ্যে অনির্ব্বচনীয়ের প্রকাশের মত। শিল্পীর রচনার মধ্যে যে সংযমের ব্যঞ্জনা আছে, তার দ্বারা মনে হয় যে সবটা যেন বলা হল না। কিন্তু সেই বলতে গিয়ে থেমে যাওয়ার মধ্যে প্রকাশের অসম্পূর্ণতা বা অপরিস্ফুটতা নেই ; কারণ সেই চিত্র বা কবিতা বলাকে অতিক্রম করে, যা অনির্ব্বচনীয় তাকেই ব্যক্ত করে, এবং সেই সংযমের সঙ্গে তার বাণীর পূর্ণতার বিরোধ নেই। জীবনের নিত্য আন্দোলনের মধ্যে তখনই অসমাপ্তিকে দেখি, যখন মনে হয় মৃত্যু তাকে ভয়ানক নিরর্থকতায় নিয়ে যাচ্ছে। যখন মৃত্যুর মধ্যে জীবনের একান্ত বিচ্ছেদ দেখি তখনই কাড়াকাড়ি, তখনই বিরোধ ঘোচে না। কিন্তু যখন কল্যাণকে লাভ করি তখন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনের পরমার্থতা ও অসীমতা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

"আমাদের জীবনের এই ব্যঞ্জনারই প্রতীক আমরা প্রকৃতির মধ্যে পাই। গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে সেখানে সে আপন চরম অর্থকে লাভ করেছে। এক জায়গায় এসে নিরর্থকতার মরুভূমিতে সে ঠেকে যায় নি—তা হ'লে হয়তো মৃত্যু তার কাছে ভয়াবহ হ'ত। কিন্তু সে যখন সমুদ্রে বিশ্রাম পেল, তখনই তার পূর্ণতার উপলব্ধি হ'ল, তাই তার শেষটা ভয়ানক পরিণাম ব'লে বোধ হয় না। সেই গঙ্গাসাগরের সঙ্গমস্থলই অন্তরের পূজামন্দির। কল্যাণী যিনি, তিনি উদ্ধত বাসনাকে সেই পবিত্র সঙ্গমতীর্থে অনন্তের পূজামন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। একজন

সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে দেন, অন্যজন তাদের সেখানে ফিরিয়ে আনেন—যেখানে শান্তির পূর্ণতা সেখানে লক্ষ্মীর স্থিতি।

"উর্ব্বশী আর লক্ষ্মী এরা মানুষের দুটি প্রবর্ত্তনার, প্রেরণার প্রতিরূপ। সর্ব্বভূতের মূলে এই দুই প্রেরণা আছে। একটি শক্তি; সে ভিতরে যা কিছু প্রচ্ছন্ন আছে তাকে উদ্‌ঘাটিত করে; এবং আর একটি শান্তি, সে অন্তর্নিহিত পরিপক্বতার মধ্যে সফলতার পর্য্যাপ্তি নিয়ে যায়—তার প্রকাশের পূর্ণতা অন্তরের দিকে।

"ভাঙাচোরা যখন চ'লতে থাকে, জীবনে যখন অভিজ্ঞতার ভূমিকম্প হ'তে থাকে, তখন তার মধ্যে যথেষ্ট বেদনা আছে, সেই উদ্দাম শক্তিকে অবজ্ঞা করা যায় না। কিন্তু কেবল যদি এই চঞ্চলাতেই তার সমাপ্তি হ'ত, তবে দুর্গতির আর অন্ত থাক্‌ত না—তাই দেখ্‌তে পাই এর মধ্যে লক্ষ্মীর হাত আছে, তিনি বাঁধন-ছাড়া তানকে সমের দিকে ফিরিয়ে এনে ছন্দ রক্ষা করেন; যে প্রলয়ঙ্করী শক্তি সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে যদি সেই শক্তিই একান্ত হয় তবেই সর্ব্বনাশ ঘটে। কিন্তু সে তো একা নয়; গতি প্রবর্ত্তিত করবার জন্য সে আছে; গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে আরেক শক্তি আছে তাকেই বলি কল্যাণী। এই নিয়ন্ত্রিত গতি নিয়েই তো বিশ্বের সৃষ্টি-সঙ্গীত!

"কালিদাসের কুমারসম্ভব আর শকুন্তলার মধ্যে এই দুটি শক্তির কথা আছে। শিবের তপস্যা যখন ভাঙল তখন অনর্থ-পাত হ'ল, আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। সেই অগ্নি আবার নিব্‌ল কিসে? গৌরীর তপস্যা-দ্বারা।

"শকুন্তলার প্রথমাংশে ঠিক এই ভাবে ট্রাজেডিকে দেখানো হয়েছে। প্রবৃত্তি শকুন্তলাকে উদ্দাম ক'রেছিল। কিন্তু পরে আবার যখন তপস্যার দ্বারা শকুন্তলা কল্যাণী হ'য়ে জননী হ'য়ে শান্তচিত্ত হ'লেন তখন তাঁর ইষ্টলাভ হ'ল।

"কালিদাসের এই দুই কাব্যে মানুষের দুই রকমের প্রবর্ত্তনার কথা উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। গৌরী আর শকুন্তলা নারী ছিলেন এটাই কাব্যের আসল কথা নয়—কিন্তু এঁদের উপলক্ষ্য ক'রে শক্তির দ্বিবিধ মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে সেটাই কালিদাসের আসল দেখাবার জিনিস। গৌরী অনেক দিন শান্তভাবে শিবের সেবা ক'রে আসছিলেন। কিন্তু যে ধাক্কায় তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'লেন সেই ধাক্কা এল যার থেকে তাকে আমরা কল্যাণী বলিনে। তবু সে না এলে শিবকে জাগাবারও উপায় থাকে না। শিব যখন আপনার মধ্যে আপনি নিবিষ্ট তখন তাঁর থাকা না-থাকা সমান। যে-শক্তি চঞ্চল করে, তাকে বর্জ্জন ক'রে যে শান্তি, সে শান্তি মৃত্যু,—তাকে সংযত ক'রে যে শান্তি তাতেই সৃষ্টি, অতএব তাকে বাদ দেওয়া চলে না।

"শকুন্তলা সংসারে অনভিজ্ঞ, তার সরলতার মধ্যে যে শান্তি সে যেন অফলা গাছের ফুলের মত। ভরতকে যে চাই। সেই চাওয়ার মূল ধাক্কাটা শকুন্তলাকে যে দিলে সে তাকে দুঃখই দিলে। কিন্তু এই দুঃখের ভিতর দিয়ে যখন সে জীবনের পরিণতির মধ্যে এসে পৌঁছল তখনি সে সত্যের চক্রপথ প্রদক্ষিণ সাঙ্গ করলে। এই প্রদক্ষিণ যাত্রার প্রথম বিক্ষেপে বেদনা, শেষ পরিসমাপ্তিতে শান্তি।

"গ্যেটে যে চার লাইনে শকুন্তলার সমালোচনা করেছেন আমার মনে হয় সেটা তিনি খুব ভেবে চিন্তেই লিখেছেন। একথা আমি আগেও বলেছি। তিনি যে বলেছেন যে কালিদাস ফুলকে ও ফলকে, স্বর্গকে ও মর্ত্ত্যকে একত্র করেছেন, এর মধ্যে গভীর অর্থ আছে। এটা নিতান্ত কবিত্বের উক্তি নয়। কুঁড়ি থেকে ফোটা ফাউষ্ট প্রথমে নির্জ্জনে বাস করেছিলেন—জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বইয়ের পাতার মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন। সেই কুঁড়ির মধ্যে পাপের আঘাত ছিল না। তিনি বল্লেন এখানেই যদি সব শেষ হল' তবে এই দুর্গতির যথার্থই পরিসমাপ্তি হল' না—এবার হাওয়ায় আছাড় খেয়ে সেই ফিরে পাবার পথকে পেতে হবে। সে যদি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বোঁটা থেকে ঝ'রে পড়ত, তবে তো তাতে ফল ধরত না, তবে তো সে ফিরে পাবার পথ পেত না। শকুন্তলার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল না; জগতের ভালমন্দের বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সে তপোবনে সখীদের সঙ্গে সরল মনে আলবালে জল-সেচনে ও হরিণশিশু-প্রতিপালনে নিরত ছিল। সেই অবস্থায় সে বাইরে থেকে কঠোর আঘাত না পেলে তার জীবনের বিকাশ হ'ত না। যেখানে জীবনের পতন, দুঃখ সেখানে শেষ হ'য়ে গেল, কিন্তু কালিদাস তাকে তো শেষ করতে দেননি। তিনি Problem of Evil নিয়ে পড়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে জগতে কিছুই স্থির হ'য়ে নেই, তাই কুঁড়ির থেকে ফুল, তার থেকে ফল হচ্ছে, কোনো জায়গায় ছেদ নেই।

"কোনো আধুনিক শিল্পী কালিদাসের মত শকুন্তলার দ্বিতীয় অংশটা লিখ্‌তেন না। ট্রাজেডি দিয়েই শেষ করতেন। কিন্তু আসলে অস্তিত্বের চরম সত্য ট্রাজেডি নয়, তাকে কক্ষচ্যুত, তার গতিবেগ বিক্ষিপ্ত করে না, আত্মবিকাশের পথে তাকে নিয়ত উৎসাহিত করে। সেই আত্মবিকাশের লক্ষ্যস্থানে শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্ আছেন বলেই আঘাত-সংঘাতের বেগ একান্ত হ'য়ে বিশ্বকে নষ্ট করে না। গাছ থেকে ফল ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে, সেটা একান্ত ভাবেই ক্ষতি হ'ত যদি কোথাও ফলের প্রত্যাশায় কোনো সার্থকতাই না থাকত।

"দেবাসুরে যখন সমুদ্র মন্থন হ'ল তখন সেখানে গরল পান করবার দেবতা ছিলেন, তাই সে গরল অমৃতকে অভিভূত করে নি।

"আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা কালিদাসের এই বইকে নীতি-উপদেশ-মূলক বলবে।

"কিন্তু যা ধর্ম্মনীতির দিক্ দিয়ে ভালো সে কল্যাণ-নীতির দিক দিয়েও ভালো হবে না এমন তো কোন কথা নেই, শিবের সতী সৌন্দর্য্যেরও সতী। উমা যখন পুষ্পাভরণে সেজে এসেছিলেন, তখন তাঁর সেই সৌন্দর্য্যমদে বিশ্ব মত্ত হ'য়ে উঠেছিল। উমা যখন তাপসিনী সেজে আভরণ পরিত্যাগ করলেন তখন তাঁর সেই সৌন্দর্য্য-সুধায় দেবতা পরিতৃপ্ত হ'লেন। দেখ্‌তে পাই আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য সত্যের কল্যাণ মূর্ত্তিকে যত্নপূর্ব্বক পরিহার ক'রতে চায়, পাছে পাঠকেরা ব'লে বসে এ মূর্ত্তি সত্য নয়। পাঠকদের চেয়ে বড় হ'য়ে উঠে কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর ব'লবার সাহস তার নেই। সত্যকে বিরূপ ক'রে দেখিয়ে তবে সে প্রমাণ করতে চায় যে, সত্যের সে খোসামুদি করে না। সত্যের সুন্দর রূপ প্রকাশ করাকে তারা ইস্কুল মাষ্টারী ব'লে ঘৃণা করে। এ কথা ভুলে যায় নীতি-বিদ্যালয়ের ইস্কুল মাষ্টার কল্যাণকে সত্য এবং সুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে একটা অবিচ্ছিন্ন পদার্থে পরিণত ক'রে তুলেছে—কবি যদি সেই বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে সত্যের পূর্ণতা দেখাতে পারে তা হ'লেই কবির উপযুক্ত কাজ হয়।" (শা প., ভাদ্র, ১৩৩০)

এই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার তুইটি ধারার সম্মিলন ঘটিয়াছে।

"আমি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না, সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।"

উর্ব্বশী সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষার অধিষ্ঠাত্রী; লক্ষ্মী সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ ভালবাসার দেবী।

"আমার মনে হয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন, গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী; আর ভালবাসাটা লৌকিক জাতীয়, সাকারে জড়িত।"

সেই জন্য উর্ব্বশী সুন্দরী, বিশ্বের কামনা-রাজ্যের রাণী, স্বর্গের অপ্সরী, আর লক্ষ্মী, "কল্যাণী, বিশ্বের জননী তাঁরে জানি, স্বর্গের ঈশ্বরী" তিনি।

"একজন অনন্তসুধা প্রার্থনা করছে, আর একজন অনন্তসুধা দান করছে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে সে অভাব-দুঃখ-পীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক। আর যে সৌন্দর্য্য-ব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা।"

সেই জন্য—

একজন তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণ মন হরি',
দু'হাতে ছড়ায় তা'রে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

এবং

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য-সুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন-মৃত্যুর
পবিত্র-সঙ্গম-তীর্থ-তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

"মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে।" শুধু যে আছে, তাহা নহে, একই বৃন্তে এই যুগল বিকাশ। একই আধ্যাত্মিক সমুদ্র-মন্থনে মানুষের অন্তর্লোক হইতে উভয়ের আবির্ভাব।

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র-মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'।



রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই দুই দেবী। একজন তাঁহাকে মানুষের দিকে টানিতেছে, আর একজন সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ লোকের আভাসে তাঁহাকে উন্মনা করিয়া দেয়। বলাকাতেও ইহাদের যুগল আবির্ভাব। একজন মানুষের সুখ-দুঃখের দিকে কবির মুখ ফিরাইয়া দিতেছেন, আর একজন অজানার আকর্ষণে তাঁহাকে উন্মনা করিয়া

তুলিতেছেন। কিন্তু এই কবিতাটিতে যেমন, বলাকার মূল সুরেও তেমনি, একবার ইহাদের যুগলমিলন ঘটিয়াছে। মানুষ ও অজানার আকর্ষণ উভয়ে মিলিয়া মানুষের ভবিষ্যতের অজ্ঞাত লোকের সৃষ্টি করিয়াছে; বলাকাতে কবির প্রধান উদ্দেশ্য সেই মানুষের অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ লোক। সেই ক্ষেত্রে উর্ব্বশী ও লক্ষ্মীর মিলন সম্ভব হইয়াছে।

সোনার তরী হইতে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা ও অসম্পূর্ণ মানব-জীবনকে ভালবাসিবার ইচ্ছা কবির মধ্যে দ্বন্দ্ব করিতেছে। ক্ষণিকা পর্য্যন্ত এই দ্বন্দ্ব চলিয়াছে; কল্পনা, কথা ও কাহিনী, এবং নৈবেদ্যেও এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস; যদিও তাহা প্রধানতঃ মানুষের অতীত কালকে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়াছে।

খেয়া হইতে গীতালি পর্য্যন্ত মানব জীবনের ধারা হইতে সরিয়া আসিয়া কবি নিজের জীবনকে অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের অনুসন্ধানও তাঁহার মানব-জীবনের রহস্য-উদ্ঘাটনের নামান্তর।

বলাকায় আসিয়া প্রাক্-গীতাঞ্জলি পর্ব্বের মানব-জীবনের ধারার পুনরাবির্ভাব। কিন্তু এবার তাহা বলিষ্ঠ হইয়া, বিশাল হইয়া, জগতের সমগ্র মানবের চিন্তা ও কর্ম্মকে পাদপীঠ করিয়া সতেজে সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবন এই বিশাল পটভূমিতে বিলীনপ্রায়।

কিন্তু এই প্রবাহ নিজের বিরাট্ উদারতা পরবর্ত্তী কাব্যে রাখিতে পারে নাই। সে সব কাব্যও প্রধানতঃ মানবের কাব্য, কিন্তু তাহাতে বলাকার বিশাল পটভূমি নাই। বলাকাতে তিনি যেমন সমগ্রভাবে অসম্পূর্ণ মানব-জীবনে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, এমন ইহার আগেও নয়, পরেও নয়। সম্পূর্ণভাবে মানবজীবনে প্রবেশ তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই, কয়জনের ভাগ্যেই বা তাহা ঘটিয়া থাকে? পরবর্ত্তী কাব্যে আবার সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা কবিকে কল্পনার জগতে উতলা করিয়া লইয়া গিয়াছে কিন্তু সে কল্পনালোকের প্রধান আকর্ষণ, অবিসংবাদিত প্রাধান্য মানবের—ভগবানের নহে।

বলাকায় কবির গীতাঞ্জলি-পর্ব্বের আধ্যাত্মিক মোহ কাটিয়া গিয়াছে। কবির স্বধর্ম্মে কবি ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলাকার মানব-রসায়ন পরবর্ত্তী কাব্যেও কাজ করিয়া চলিয়াছে; সে সব কাব্য বলাকার মত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি না হইতে পারে, সোনার তরী ক্ষণিকার মত ঐশ্বর্য্যবান্ না হইতে পারে, ভাল মন্দ তেমন বড় কথা নয়; ইহা কবির স্বধর্ম্মের সৃষ্টি। স্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তনেই কবি-প্রতিভার যথার্থ সার্থকতা।
